অবিরাম লড়াই-২

পরাজিত অহংকার

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

অবিরাম লড়াই-২

পরাজিত অহংকার

অবিরাম লড়াই-২

পরাজিত অহংকার

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

অনুবাদ
নাসীম আরাফাত

সম্পাদনা
মনযূর আহমাদ

আবেহায়াত পাবলিকেশন্স

অবিরাম লড়াই-২

পরাজিত অহংকার

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

অনুবাদ ঃ নাসীম আরাফাত

প্রকাশক ঃ মনযূর আহমাদ

আবেহায়াত পাবলিকেশন্স
১/৫ সাত মসজিদ রোড (২য় তলা)
মোহাম্মদপুর বিআরটিসি বাসস্ট্যান্ড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রথম প্রকাশ ঃ
জুন—২০০৪

কম্পিউটার কম্পোজ
এম. হক কম্পিউটার্স
৪৫, বাংলাবাজার

প্রচ্ছদ ঃ
এস, এম জিলানী রিটু
কালার ক্রিয়েশন

মূল্য ঃ আশি টাকা মাত্র

পরিবেশনায় ঃ

দারুল উলূম লাইব্রেরী
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, মোবাইল ঃ ০১৭২-৫০৭৮৭৭

PARAJITO AHANKAR : By Enayatullah Altamas, Translated by Nasim Arafat, Published by Abehayat Publications, 1/5 Sat Maszid Road, Mohammadpur, Dhaka-1207. First Edition : June 2004. Rrice : Taka 80.00 Only.

পেশে লফ্জ

কিসরা ও কাইসার। রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাট। পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই সুপার পাওয়ার। এদের সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থের কোন হিসাব-নিকাশ নেই, কোন পরিমাণ-পরিমাপ নেই। গোটাবিশ্ব এদের হাতে বন্দী। গোটা পৃথিবী এদের হাতের পুতুল। তাদেরকে চোখ রাঙ্গিয়ে কিছু বলার সাহস কারো নেই। এ দু'শক্তির মাঝে অবস্থিত আরব উপদ্বীপ। দিগন্ত বিস্তৃত মরুর দেশ, লুহাওয়া আর বালুর দেশ। এদেশে সবুজের খুবই অভাব, পানির দারুণ সংকট। তাই যেখানেই কুয়ো আছে বা পাহাড় গাত্র বেয়ে ঝর্ণাধারা নেমে আসে, সেখানে মানুষ বসতি স্থাপন করে, মিলেমিশে থাকে। পানির সংকট দেখা দিলে আবার অন্যত্র চলে যায়।

এরা যাযাবর। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সংগ্রাম করে এরা বেঁচে থাকে। এরা স্বাধীনচেতা। কারো অধীনে এরা থাকতে চায় না। এদের স্থায়ী কোন নিবাস নেই। এদের মাঝে শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা বা রাষ্ট্রব্যবস্থার চিহ্ন নেই। এদের ইতিহাস মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি আর বর্বরতার ইতিহাস। এদের ইতিহাস মদ, জুয়া, নারী আর আত্মম্ভরিতার ইতিহাস।

আল্লাহ্ তায়ালা এদের মাঝেই প্রেরণ করলেন আকায়ে নামদার তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তিনি হলেন এদের রসূল, এদের রাহবার, এদের শিক্ষক। এরপর ইতিহাসের গতি দ্রুত অন্যদিকে চলতে লাগল। মরুর বুকে এক নতুন জাতির উন্মেষ ঘটল। এক নতুন উম্মাহ জন্মলাভ করল। এরা মুসলিম জাতি। এরা আল্লাহ্র সৈনিক। ইসলামের জন্য এদের সুখ-শান্তি। ইসলামের জন্য এদের জীবন-মরণ।

মাত্র এক দশক ঘুরতে না ঘুরতেই মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হল। সুখ-শান্তি আর সমৃদ্ধির হাওয়া বইতে লাগল। মারামারি, কাটাকাটি, বর্বরতা, মদ, জুয়া, নারীভোগ আর আত্মম্ভরিতার অবসান হল। দু'দশকের মাথায় গোটা আরব পদানত হল। ইসলাম এবার একটি শক্তির রূপ ধারণ করল। একটি জীবনব্যবস্থার রূপ ধারণ করল।

আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে এবার ইসলাম রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে লাগল। তারপরই শুরু হল সুপার পাওয়ারদের সাথে যুদ্ধ, খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অগ্নিপূজারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। একই সাথে উভয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন রাসূলের (সা.) উত্তরসূরী সাহাবায়ে কেরাম। শ্বাসরুদ্ধকর সে ইতিহাস। লোমহর্ষক সে কাহিনী। যুদ্ধে যুদ্ধে একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল পারস্য সাম্রাজ্য। ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল এ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। আর রোম সাম্রাজ্য পিছু হঁটতে হঁটতে একেবারে রোম সাগরের তীরে গিয়ে ঠেকল।

ঐতিহাসিকরা সাধারণত ইসলামের বিজয় ইতিহাস এখানে এসেই শেষ করে দেয়। মিশর বিজয়ের অগ্নিঝড়া রক্তে আঁকা দিনগুলোর কথা বাদ পড়ে যায়। যে মিশরের রণপ্রান্তরসমূহে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের যুদ্ধকৌশল, বীরত্ব ও প্রতিভা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। শত-সহস্র বিজয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে মুসলিম বীর মুজাহিদদের শাণিত তরবারী ও তাকবীরের হৃদয় কাঁপানো ধ্বনি-প্রতিধ্বনি।

মাত্র আট-দশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে লাখ লাখ রোমান সৈন্যকে কিভাবে তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন বীর সেনানী হযরত আমর ইবনে আস (রা.)। কিভাবে প্রতিটি রণাঙ্গনে তাদের পরাভূত করলেন আর বীরদর্পে সামনে এগিয়ে গেলেন। এ বিস্ময়কর কাহিনী ও শ্বাসরুদ্ধকর ইতিহাস এ গ্রন্থের পাতায় পাতায় উপন্যাসের বর্ণিল আবরণে পেশ করা হয়েছে।

নির্ভেজাল ইতিহাস-নির্ভর এ সিরিজটি পাঠকের মনে এক দীপ্তময় আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। সবশেষে ব্যর্থতা আর সফলতার তুলাদণ্ড বিদগ্ধ পাঠকের হাতে অর্পণ করে এখানেই ইতি টানলাম। এবার চলুন, আমরা ইতিহাসের সেই উত্তাল দিনগুলোতে হারিয়ে যাই। অনুভব করি পরাজিত অহংকারের।

নাসীম আরাফাত
ঢাকা।

প্রকাশকের আরয

উর্দু ভাষার নন্দিত ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাশ এখন আর এদেশেও অপরিচিত নন। তাঁর উপন্যাসের পাঠক-প্রিয়তা প্রচুর। ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে উপন্যাস লেখায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। ইতিহাস-বিমুখ মুসলিম জাতিকে ইতিহাস জানতে বাধ্য করা তার অঙ্গীকার ছিল কি-না জানি না, তবে কেউ তার বই পড়া শুরু করলে শেষ না করে স্বস্তি পায় না। তাঁর লেখায় পাঠক একই সাথে পায় ইতিহাসের জ্ঞান, আদর্শ ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। তাঁর দক্ষ উপস্থাপনায় বাঙ্গময় হয়ে উঠে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য-ইতিহাস। তরুণপ্রাণ খুঁজে পায় তার কাঙ্ক্ষিত ঠিকানার সন্ধান। এসব কারণে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আলতামাশ। আমরা এবার পাঠকের সকাশে পেশ করছি তার 'বাহ্তা নীল দরিয়া'-এর বাংলা অনুবাদ 'অবিরাম লড়াই'। অন্তত পাঁচটি খণ্ডে শেষ হবে এ উপন্যাস। বর্তমান খণ্ডের নাম 'পরাজিত অহংকার'। ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রথম দিনগুলো থেকে নিয়ে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে হেঁটে এ কাহিনী শেষ হয়েছে মিশর বিজয়ের মধ্য দিয়ে। সংঘাত, লড়াই ও বিজয়ের টান টান উত্তেজনায় ভরা এর প্রতিটি পাতা ও অধ্যায়। প্রদীপ্ত ঈমান ও জাগরণের যথেষ্ট উপকরণ-উপাত্ত রয়েছে এ সিরিজে। সিরিজের প্রথম খণ্ড পাঠকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। আশা করি দ্বিতীয় খণ্ড 'পরাজিত অহংকার' ভালো লাগবে। বইটি সকল বিষয়ে ভাল করার চেষ্টা করা হয়েছে। জানি না কতটুকু সফল হয়েছি। বলে রাখছি, হয়ত অসংখ্যক ভুল ও দুর্বলতা এ বইয়ে রয়ে গেছে। তাই পরবর্তী সংস্করণে এর ছোট-বড় দুর্বলতাগুলো দূর করার ওয়াদা করছি। আল্লাহ্র রহমতের আশায় সাহসে ভর করে পাঠকের হাতে বইটি তুলে দিচ্ছি। সকল পাঠকের কল্যাণ ও শুভ কামনায়।

মনযূর আহ্মাদ
১০.০৬.২০০৪ইং

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আন্তোনীস স্বপ্ন জগতের এক রঙ্গিন পৃথিবী রচনা করে এগিয়ে চলছে। সে তার মনযিল নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। এগিয়ে চলছে। সফলতা আর ব্যর্থতা ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু এখন তার মনে কোন দ্বিধা নেই। কোন সঙ্কা নেই। সে যেন এক নিরাপদ গন্তব্যের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। কোন্ কবিলার কোন্ সর্দারের নিকট আশ্রয় নিবে তাও সে ঠিক করে নিয়েছে।

অন্যদিকে রূতাস দিক লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে ফিরছে। যেন ভবঘুরে। তবে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রোমান সেনাবাহিনীতে ফিরে যাবে না। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মুখোমুখি সে আর গিয়ে দাঁড়াবে না। কিন্তু কি করবে? কোথায় যাবে? কার নিকট আশ্রয় নিবে? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনো সে স্থির করতে পারেনি। একেক বার একেক কথা ভাবে আবার তা মুলতবী রেখে অন্য ভাবনায় ডুবে যায়। প্রায় দিকভ্রান্ত উন্মাদের মত পথ চলছে। চলতে চলতে দিবস সমাপ্তির পর রাত এগিয়ে এল। কোলাহলময় পৃথিবী অন্ধকারে হারিয়ে গেল। রূতাস এক নির্জন স্থানে শুয়ে দিনের ক্লান্তি দূর করার জন্য ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল। পরদিন সকালে আলোর বন্যায় পৃথিবী ঝলমল করে উঠল। আবার শুরু হল রূতাসের যাত্রা।

চলতে চলতে বার বার সে তার পকেট থেকে বের করে স্বর্ণের তৈরী ঈসা (আ.)-এর মূর্তিটি দেখছে। গভীর ভক্তিভরে ছল্‌ছল্ নেত্রে তাকিয়ে রয়েছে। যেন মূর্তিটি তার পথ নির্দেশ করছে। দীর্ঘ চিন্তার পর একটি আশ্রয় স্থান সে মনোনীত করল। সে এক খ্রিস্টান কবিলার মাঝে আশ্রয় নিবে। হিমসে থাকাকালে শারীনা প্রত্যেক দিন তার সাথে এসে সাক্ষাৎ করত। তার নিকট থেকেই সে প্রত্যেক দিনের সংবাদ পেত। শারীনা তাকে শুনিয়েছিল, আরব কবিলাগুলোর যে খ্রিস্টানরা সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে সাহায্য করার জন্য এসেছিল তারা সবাই তিক্ত-রিক্ত ও বিরূপ মনোভাব নিয়ে ফিরে চলে গেছে।

এ কথা ভাবতে ভাবতে সে আবার উদাস হয়ে যায়। আবার দিশেহারা হয়ে যায়। ভাবে, যদি আরব কবিলার খ্রিস্টানরা তাকে আশ্রয় না দেয়। যদি তারা তাকে তাড়িয়ে দেয়। তাহলে সে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিবে!

একবার সিদ্ধান্ত করে ফেলল, না, পথে পথে না ঘুরে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বাহিনীতেই ফিরে যাই। সাথে সাথে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু ক্ষণকাল যেতে না যেতেই সে ভাবনার জগতে হারিয়ে গেল। সে যেন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সম্রাট তাকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছে, রূতাস! তুমি কোথায় গিয়ে পালিয়েছিলে? হিরাক্লিয়াসের ডাগর রক্ত চক্ষু, ক্রোধে লাল চেহারা, রুক্ষ্ম কণ্ঠস্বর যেন ভেসে এল। জল্লাদ! এই নরাধমকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ে যাও। এ বেঈমান গাদ্দারের মৃত্যুদণ্ডই উত্তম পুরস্কার। জল্লাদ যেন তাকে হিড়হিড় করে সম্রাটের সম্মুখ থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

রূতাস চমকে উঠে। না, সম্রাটের কাছে আর যাব না। আবার ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দ্বিপ্রহর গড়িয়ে যাবার পর এক খুবসুরত সবুজ শ্যামল স্থানে পৌঁছল। তার পাশ দিয়ে একটি উচ্ছল নদী কুল কুল রবে বয়ে চলছে। ছায়া নিবিড় কাকলি মুখর স্থান দেখে বিশ্রামের জন্য ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। ঘাসের উপর গা এলিয়ে দিয়ে কোথায় যাবে ভাবছে। এমনি ভাবনার মাঝে সে গভীর ঘুমে হারিয়ে যায়।

অনেক সময় পর তার ঘুম ভাঙে। চারদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আকাশে চাঁদ উঠে এসেছে। ভাবল, বহু ঘুমিয়েছি। রাতটা বেশ ভাল কেটেছে। শীতল আবহাওয়ার ছড়াছড়ি। যাত্রা শুরু করলেই ভাল হবে। সকালের মধ্যেই বহুদূর চলে যাওয়া যাবে। ঘোড়ায় আরোহণ করে সে তার অজানা মনযিলের পথে রওয়া হল। এদিকে আন্তোনীস ও লীজা ইউকেলিসকে তাদের শোয়ার জায়গায় নিয়ে গেল। ইউকেলিসের মন এখন শান্ত। লীজা তাকে আদর-স্নেহে আপ্লুত করে তুলে। তার কাছে সে নিজেকে ছোট্ট শিশুর মত ভাবছে। তিনজনই শুয়ে পড়ল। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তারা একটি ঘোড়ার আগমনের পদধ্বনি শুনতে পেল। দূর থেকে ধ্বনিটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে এগিয়ে আসছে। সাথে সাথে গানের আওয়াজ শোনা গেল। রোমান ভাষায় গানটি রচিত। তারা সতর্ক ও উৎকর্ণ হয়ে উঠল। লীজা ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, কেউ হয়তো আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে!

আন্তোনীস বলল, মনে হচ্ছে একজন অশ্বারোহী আসছে। পশ্চাদ্ধাবন করলে কয়েকজন অশ্বারোহী আসত। মনে হচ্ছে সে কোন মুসাফির অথবা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা কোন রোমান সৈন্য।

আন্তোনীস বলল, লীজা! তুমি এখানেই শুয়ে থাক। আমি আর ইউকেলিস লুকিয়ে যাই। দেখি, লোকটি কে? যদি মন্দ কিছু মনে হয় তাহলে পশ্চাৎদিক থেকে আক্রমণ করে তাকে শেষ করে দিব।

আন্তোনীস ও ইউকেলিস দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল। একটি ছোট্ট ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। অশ্বারোহী সে স্থানটি অতিক্রম করার সময় তার দৃষ্টি শায়িত লীজার উপর পড়ল। সে অশ্বের গতি থামিয়ে দিল এবং আস্তে আস্তে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। ঘোড়াটি পশ্চাতে রেখে লীজার দিকে অগ্রসর হল।

এখনো সে বুঝতে পারেনি যে, শায়িত ছায়ামূর্তিটি একজন নারী। রূতাসের এই দীর্ঘ সফরে এই প্রথম সে মানুষের মুখোমুখি হচ্ছে। নিকটবর্তী হয়ে বুঝতে পারল, শুয়ে থাকা লোকটি নারী। দাঁড়ান অবস্থায়ই সে একটু ঝুঁকল। লীজা উঠে বসল। পরে দাঁড়িয়ে গেল।

রূতাসের চেহারা ভয়ে ফ্যাকাসে ও বিবর্ণ হয়ে গেল। সে চিনে ফেলল, এ তো সম্রাট হিরাক্লিয়াসের স্ত্রী। দাসী পরিবৃতা হয়ে চলাফেরা করত তাই অনেকেই তাকে চিনে।

রূতাসের কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময় ঝরে পড়ল। বলল, আপনি.....সম্রাজ্ঞী লীজা! আপনি এখানে....সম্রাট হিরাক্লিয়াস কি এখানেই কোথাও আছেন?

লীজার কণ্ঠ থেকে যেন সত্যই সম্রাজ্ঞীর সুর ফুটে উঠল। বলল, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছো? কোথায় যাচ্ছ?

রূতাস এ কথা বিশ্বাসই করতে পারছে না যে, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের স্ত্রী কোন জনমানবহীন প্রান্তরে পড়ে থাকতে পারে। তার মনে হল, হয়তো কোন জ্বীন বা প্রেতাত্মা সম্রাজ্ঞী লীজার আকৃতি ধারণ করে আছে। তাই তার ভয় ও ভীতি আরো বেড়ে গেল।

রূতাসের কণ্ঠে ভয়ার্ত আওয়াজ। বলল, না, না..... আপনি হিরাক্লিয়াসের সাথে রোমে থাকার কথা। আপনি কার প্রেতাত্মা! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আপনার সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটালাম।

এই বলেই সে ভয় ও ভীতির প্রচণ্ডতায় পশ্চাৎদিকে না ফিরেই দূরে সরে যেতে লাগল।

লীজা তার কণ্ঠে গাম্ভীর্য টেনে এনে বলল, দাঁড়াও। যেয়ো না। তুমি তো রোমান বাহিনীর একজন সৈনিক। তোমার নাম কি?

রূতাস ধীর পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, আমার নাম রূতাস। আমি রোমান বাহিনীর সালার ছিলাম। মুসলমানরা আমাকে বন্দী করে রেখেছিল। আমি পালিয়ে এসেছি।..... আমি কি এখন যেতে পারি।

আন্তোনীস এবং ইউকেলিস গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে রূতাসের পশ্চাৎদিক থেকে এগিয়ে এল। উভয়ের হাতে খোলা তলোয়ার। তারা রূতাসের একেবারে নিকটে এগিয়ে এলে রূতাস অনুভব করল, তার পশ্চাৎদিক থেকে কেউ

এগিয়ে আসছে। সে ঘুরে দেখেই মুহূর্তে দূরে সরে গেল। সে তার সালার আন্তোনীস এবং সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পুত্র ইউকেলিসকে চিনে ফেলল।

বিস্ময়ে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় বলে উঠল, আমি এসব কী দেখছি!..... আপনারা সবাই এখানে কি করছেন?

আন্তোনীসের তরবারীর তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ রূতাসের হৃদপিণ্ড বরাবর চলে গেল। বলল, রূতাস! তুমি কি মনে করছে যে, আমি জানি না, তুমি সম্রাট হিরাক্লিয়াসের গুপ্তচর বাহিনীর অফিসার। তুমি অস্বীকার করতে পারবে যে, তুমি আমাদের সন্ধানেই এদিকে এসেছো?

রূতাস বলল, আপনি কেমন সালার হলেন? আপনার তো একথাই জানা নেই যে, আমি তিন চার মাস যাবৎ রোমান বাহিনীতে নেই। আমি সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে এদিকে আসিনি। আমি মুসলমানদের কয়েদখানা থেকে পালিয়ে এসেছি।

মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলল, আমি চরবৃত্তিতে হিমসে গিয়েছিলাম। আমার সাথে আরো দু'জন ছিল। আমরা গ্রেফতার হয়ে গেলাম। আমার সাথী দু'জন নিহত হয়েছে। আর আমি সুযোগ পেয়ে পালিয়ে এসেছি।

ইউকেলিসের অগ্নিকণ্ঠ ঝরে পড়ল। বলল, তাহলে এদিকে কিসের সন্ধানে এসেছো? এদিকে তো রোমান বাহিনী নেই!

লীজা বলল, তার চেহারার সজীবতা আর পোষাকের বাহার দেখ। যদি তিন চার মাস বন্দীই থাকতো তাহলে তো চেহারা থাকত বিধ্বস্ত আর কাপড় থাকত অপরিচ্ছন্ন, মলিন। সে তো আমাদেরকে ধোকা দিচ্ছে।

রূতাস তার কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বলল, হয়তো আপনার বিশ্বাস হবে না যে, মুসলমানরা বন্দীদের সাথে মেহমানের মত আচরণ করে।

আন্তোনীস বাম হাত দ্বারা তার জামার কলার চেপে ধরে তার কোমড় হাতড়ে তরবারীটি নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলল, নিশ্চয় তারা মেহমানের মত আদর আপ্যায়ন করে পালিয়ে আসার সময় তারা তোমাকে এ তরবারীটিও দিয়ে দিয়েছে!

তারপর আরো হাতড়ে দেখতে লাগল, কোন খঞ্জর আছে কি না। কিন্তু খঞ্জর পেল না। তবে হাতে একটি শক্ত বস্তু অনুভব করল। সে তা টেনে বের করে চাঁদের রোশনীতে ঝলমল করছে দেখে লীজার হাতে দিল। তারপর বলল, এ ক্রুশ প্রমাণ করে যে, তুমি মিথ্যাবাদী। আর আমি এটাও জানি যে, এ ক্রুশটি কার?

এ ক্রুশটি মালে গণিমত হিসাবে সিপাহ সালার আবু উবায়দার নিকট পৌছেছিল। নিহত এক রোমান অফিসারের নিকট তা থাকত। এখন তো চিন্তা

করতে হবে, যদি তুমি মুসলমানদের কয়েদখানায় বন্দী থাকতে তাহলে কি তারা তোমাকে এই মূল্যবান বস্তুটি তোমার সাথে রাখতে দিত? তারপর আন্তোনীস বলল, আচ্ছা তুমি এখনো কেন মিথ্যা বলে যাচ্ছো? শোন, আমার নাম আন্তোনীস! সত্য কথা বল। অন্যথায় তোমার লাশ এ প্রান্তরে পড়ে থাকবে। পশু পক্ষীর জন্য তা মজাদার খাবার হবে।

রূতাস এবার সত্য কথা বলতে লাগল। আমি আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরছি। আমি শুনেছি, সম্রাট হিরাক্লিয়াস পিছু হটে গেছেন। কিন্তু আমি আর তার নিকট ফিরে যাব না। তবে কোথায় যাব তাও আমার জানা নেই। চরবৃত্তির জন্যই আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু বন্দী হওয়ার পর মুসলমানরা আমার থেকে আমার বাহিনীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে নিয়েছে। তারপর সে তার বন্দী হওয়া থেকে মুক্তি পর্যন্ত সব কাহিনী বলে দিল। শারীনার প্রসঙ্গও বাদ দিল না। কিভাবে শারীনা তাকে কয়েদখানা থেকে মেহমান খানায় থাকার ব্যবস্থা করল। কিভাবে ধোঁকায় ফেলে মদ পান করিয়ে তার থেকে রোমান বাহিনীর গোপন তথ্য জেনে নিয়েছে। সব কিছুই বলল। তারপর বলল, আমার মনে হয়, আমার তথ্য পেয়েই মুসলমানরা আমাদের বাহিনীকে সহজে পরাজিত করতে পেরেছে। হয়ত এ কারণেই মুসলমানদের সিপাহ সালার আবু উবায়দা আমাকে এ ক্রুশটি পুরস্কার দিয়েছেন।

এবার আন্তোনীস ও লীজার নিকট রূতাসের কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচিত হল। আন্তোনীস তাকে বলে দিল, তোমার কথা বিশ্বাস করলাম। কিন্তু যদি কোথাও তুমি আমাদের ধোঁকা দেয়ার সামান্যতম চেষ্টা কর তাহলে তোমাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।

এবার রূতাস জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

উত্তরে আন্তোনীস অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তার গন্তব্য স্থানের কথা বলে দিল।

রূতাস বলল, তাহলে আপনি আমাকে একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী পাবেন। আমি তো দিশেহারা পথিকের ন্যায় ঘুরে ফিরছিলাম। আপনি আমাকে আমার মনযিলের সন্ধান দিলেন। আরব খ্রিস্টান কবিলাগুলোর সর্দারদের আমিও বেশ ভালভাবেই চিনি। তাদের সাথে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

রাতের অধিকাংশ সময় কেটে গেছে। বিশ্রামের জন্য তারা কিছুক্ষণ শুয়ে রইল। সকালের নির্মল আলো ছড়িয়ে পড়তেই আবার তারা যাত্রা শুরু করল।

* * *

ইরাক ও শামের মধ্যবর্তী বিরাট বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আরব খ্রিস্টান কবিলাগুলোর বসবাস। এ কবিলার লোক ইসলাম বিদ্বেষী ও বিরোধী। আমীরুল

মুমেনীন হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে এদের দমন করা হচ্ছে। শায়েস্তা করা হচ্ছে।

খ্রিস্টান কবিলাগুলোর একটি বনু তাগলিবকে নিয়ে এক বিস্ময়কর মজাদার ঘটনা ঘটল। এ কবিলাটি শাম ও ইরাকের সীমান্ত ও ফুরাত অববাহিকার মাঝামাঝি অবস্থিত। শামেরও কিছু এলাকা জুড়ে এদের অবস্থান। মরু অঞ্চল। এ কবিলাকে দমন করার দায়িত্ব ওয়ালীদ ইবনে ওক্কবা (রা.)-কে দেয়া হয়েছে। বনু তাগলিব কয়েকটি বস্তিতে বসবাস করে। দু'টি বস্তির রয়েছে সুদৃঢ় কেল্লা, তাবূত তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

সালার ওয়ালীদ ইবনে উক্কবা তাদের শায়েস্তা করতে অগ্রসর হলে বেশ কিছু বাধার সম্মুখীন হলেন। প্রধান বাধা হল, বনু তাগলিব প্রকৃতপক্ষেই যুদ্ধবাজ আর দুঃসাহসী। মুজাহিদদের যে বাহিনী প্রথমে মুসাল্লা ইবনে হায়েসা ও তাঁরপর সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্বে পারস্য সম্রাট কিসরার বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, সে বাহিনীতে বনু তাগলিবের যোদ্ধারাও অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের কারো কারো বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে সত্যই আরব যোদ্ধারা বিস্মিত ও বিমোহিত হত।

কিন্তু রোমান শক্তির বিরুদ্ধে যখন মুজাহিদরা যুদ্ধ করছিল তখণ বনু তাগলিবের যোদ্ধারা বিদ্রোহ করে বসল। অথচ তখন গোটা ইরাক ও শাম মুসলমানদের পদানত হয়ে গেছে।

সালার ওয়ালীদ ইবনে উক্কবার নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী বনু তাগলিবের দিকে অগ্রসর হল। বনু তাগলিবের যোদ্ধারাও অস্ত্রসজ্জিত হয়ে রণক্ষেত্রে নেমে এল। প্রাণপণে যুদ্ধ করেও বেশ কয়েকটি রণাঙ্গণে তারা পেরে উঠতে পারল না। রণাঙ্গণ ছেড়ে পিছু হটে গেল। মুজাহিদদের বিজয়ের পশ্চাতে কিছু কারণও আছে। তার একটি হল, মুজাহিদদের হাতে পারস্য ও রোম সম্রাটের বহু তাজা ঘোড়া রয়েছে। তাই অধিকাংশ মুজাহিদই অশ্বারোহী। মুজাহিদদের বিজয়ের আরেকদিক হল, তারা ইতিমধ্যে অপরাজেয় শক্তি বলে বিবেচিত রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে শামের মরু অঞ্চলে ওদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তাই মুজাহিদদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল সর্বত্র। পৃথিবীর সকল শক্তি মুজাহিদদের নামে ভীত, সন্ত্রস্ত।

আরব কবিলাগুলোর খ্রিস্টান যোদ্ধারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গণে এলেও টিকে থাকতে পারল না। বনু তাগলিবের সাথেও কয়েকটি রাণাঙ্গণে বুঝাপড়া হয়েছে। কিন্তু বিজয় মাল্য ছিনিয়ে আনা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। তারা প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রে পিছিয়ে গেছে। অবশেষে তাদের সর্দার সন্ধি করে মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিয়েছে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করলো না।

সেদিনই সালার ওয়ালীদ ইবনে উক্কবা (রা) হযরত উমর (রা.)-এর নিকট পয়গাম দিয়ে পাঠালেন যে, আমি তাদের ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দিলাম কিন্তু তারা তা অস্বীকার করেছে। তারা এখন আমীরুল মু'মিনীনের ফয়সালার অপেক্ষায় আছে।

হযরত উমর (রা.)-এর দূরদর্শিতা ও গভীর প্রজ্ঞার কথা সর্বজন জ্ঞাত। উত্তরে তিনি লিখলেন, বনু তাগলিবকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে চাপ দিবে না। ইসলাম গ্রহণ করা বা না করা তাদের ইচ্ছা। তবে তাদের সর্দারদের বলে দিবে, যদি তাদের গোত্রের কেউ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে তবে তারা তাকে বাধা দিতে পারবে না।

হযরত উমর (রা.)-এর উত্তর পত্র পেয়ে সালার ওয়ালীদ ইবনে উক্কবা যখন তা বনু তাগলিবের সর্দারদের শুনালেন, তখন তা তাদের মনে দারুণ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল, তখনই বেশ কিছু খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে গেল।

উমর (রা.) তার পয়গামে আরো লিখলেন, বনু তাগলিব থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করা হবে। তারা জিম্মি হিসাবে বসবাস করবে। এ বিষয়টি বনু তাগলিবের সর্দাররা মেনে নিতে পারল না। তারা বলল, আমরা জিযিয়া দিতে পারব না। আর আমাদের যেন জিম্মীও ডাকা না হয়।

বনু তাগলিবের এ কথা শুনে সালার ওয়ালীদ ইবনে উক্কবা দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন, হে বনু তাগলিব! তোমাদের কারণে আমরা আমাদের বিধান রহিত বা পরিবর্তন করতে পারব না। তোমাদের প্রত্যেকটি একগুয়েমীর সমাধানের জন্য আমি আর মদীনায় কাউকে পাঠাব না। মনে রাখবে, জিযিয়া কিছুতেই মাফ করা হবে না।

জনৈক সর্দার দাঁড়িয়ে বলল, আমরা অর্থ দিতে অস্বীকার করছি না। জিযিয়ার চেয়ে দ্বিগুণ অর্থ আমাদের থেকে গ্রহণ করুন তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে তাকে জিযিয়া বলবেন না আর আমাদেরকে জিম্মি বলে অভিহিত করবেন না।

বেশ কিছুক্ষণ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর সিদ্ধান্ত হল যে, বনু তাগলিবের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় গিয়ে হযরত উমর (রা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করবে।

তাই হল, বনু তাগলিবের প্রতিনিধি দল মদীনায় গিয়ে হযরত উমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, আমরা অর্থ দিতে প্রস্তুত। প্রয়োজনে জিযিয়ার চেয়ে দ্বিগুণ অর্থ দিতে রাজি। তবে আমাদের আবেদন, একে যেন জিযিয়া বলা না হয়। আর আমাদের যেন জিম্মি বলে অভিহিত করা না হয়। এতে আমাদের গোত্র অসম্মান বোধ করে।

হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় বললেন, যে জিযিয়া আরোপ করা হয়েছে আমরা তার চেয়ে বেশী নিব না। আর আমরা তাকে জিযিয়াই বলব।

বনু তাগলিবের এক বর্ষিয়ান সর্দার বলল, কিন্তু আমরা তাকে সদকা নামে অভিহিত করতে চাই।

হযরত উমর (রা.) বললেন, তোমরা তাকে যে নামেই অভিহিত কর কিন্তু আমরা আমাদের বিধান মতে একে জিযিয়াই বলব। ....আমি দারুণ বিস্মিত যে, তোমরা এক নিরর্থক বিষয় নিয়ে কেন এতো বাহানা করছো?

বর্ষিয়ান সর্দার বলল, আমীরুল মু'মিনীন! আমরা আপনাকে আমীরুল মু'মিনীন মেনে নিয়েছি। সাথে সাথে আমরা এ নিবেদন পেশ করছি, আপনি আমাদের গোত্রীয় মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করবেন। আপনি বনু তাগলিবের উঁচু মর্যাদার কথা অবহিত আছেন। আমরা জিযিয়াকে বেইজ্জতী ও অপমানজনক মনে করি। আর আশা করি, আপনি আমাদের ঐ অবদানের কথা ভুলবেন না যখন আমরা মুজাহিদ বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ইরান সম্রাট কিসরার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম। এখনো আমরা আবার আপনাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করব। আমরা আপনার আনুগত্য মেনে নিয়েছি। সুতরাং আমাদের থেকে অর্থ গ্রহণ করুন। তবে আমাদের ইজ্জত ও সম্মানহানীকর কিছু করবেন না।

কিন্তু হযরত উমর (রা.) নিজ সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। কথাবার্তায় উত্তপ্তা বেড়ে চলল। তখন হযরত আলী (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে সা'আদ ইবনে মালেক নামের এক সালারের কাহিনী শোনালেন। তিনি এক অঞ্চল পদানত করার পর পরাজিত লোকদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ না করে দ্বিগুণ সদকা গ্রহণ করেছিলেন।

তৎক্ষণাৎ হযরত উমর (রা.)-এর এ ঘটনা স্মরণ হয়ে গেল। তাছাড়া তিনি ভাবলেন, এরা যোদ্ধা। রক্ত খেলায় মেতে উঠাই এদের স্বভাব। তাই কঠোরতা অবলম্বন না করে তাদের দ্বারা কাজ নেয়াই উচিত হবে। অবশেষে ফয়সালা করা হল, তাদের থেকে দ্বিগুণ কর নেয়া হবে এবং একে সদকা নামে অভিহিত করা হবে। বনু তাগলিবের সর্দাররা সানন্দে তা মেনে নিয়ে সাথে সাথে কর পরিশোধ করে দিল। এভাবে একটা শক্তিশালী সম্প্রদায় মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিল। এরপর ধীরে ধীরে একের পর এক তারা ইসলামে দিক্ষীত হতে থাকল।

* * *

আন্তোনীস, রূতাস, লীজা ও ইউকেলিস আলেপ্পার নিকটবর্তী এক খ্রিস্টান বস্তিতে গিয়ে পৌঁছল। মরুর মাঝে কয়েকটি ঘরবাড়ি নিয়ে এ বস্তিটির অবস্থান। এরা বনু রবীয়ার লোক। আন্তোনীস ও তার সাথীদের দেখে ঘরবাড়ি থেকে লোকেরা বেরিয়ে এল। তারা বুঝতে পারল, এরা রোমী। রোমীদের সম্পর্কে এদের মনে দারুণ ক্ষোভ।

আন্তোনীস ও রূতাস দীর্ঘদিন এই আরব কবিলাগুলোর মাঝে কাটিয়েছে। তাই তারা তাদের ভাষা বোঝে। তাদের ভাষায় কথা বলতে পারে। বস্তির লোকদের বলল, আমরা তোমাদের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। তারা তাদের একটি ঘরে নিয়ে গেল। ঘর থেকে একজন শীর্ণকায় বর্ষীয়ান ব্যক্তি বেরিয়ে এসে তাদের স্বাগত জানাল। সসম্মানে বসাল। বর্ষীয়ান লোকটির কথাবার্তা আচার-আচরণ অসাধারণ। তার কথা বলার ভঙ্গী, উচ্চারণ ও শব্দচয়ন থেকে সহজেই অনুমেয় যে, লোকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব।

লোকটি সাবলীল কণ্ঠে বলল, তোমরা কি রোমী? আমাদের অন্তরে এখন আর রোমানদের ঐ মর্যাদা নেই যা পরাজয়ের পূর্বে ছিল। তবে তোমরা আমাদের মেহমান। ঐতিহ্য অনুযায়ী আমরা তোমাদের সমাদর করব, সম্মান করব। তোমরা কি কোথাও যাচ্ছ? তোমাদের কী সহায়তা আমরা করতে পারি? যদি পথ ভুলে এদিকে এসে থাক তাহলে আমরা পথ দেখিয়ে দিতে পারব।

আন্তোনীস বলল, জনাব! আমরা পথ ভুলে এদিকে আসিনি। আমরা আপনার গোত্রের কল্যাণে কিছু করতে চাচ্ছি। কিছু আমাদের জন্যও করতে চাই। সম্রাট হিরাক্লিয়াস পালিয়ে গেছেন। তার বাহিনী মুসলিম মুজাহিদদের হাতে নিঃশেষ হয়ে গেছে। যারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে তারাও বিক্ষিপ্ত। তাদের কোন সংগঠিত অস্তিত্ব নেই। আমি রোমান বাহিনীর একজন সালার। সেও একজন সালার। এই মহিলা আর যুবকটি কে তা পরে বলব। আমরা এখন বলতে চাচ্ছি, আমাদেরকে রোমান মনে করবেন না। আমরা একই ধর্মের অনুসারী পরস্পরে ভাই। সম্রাট হিরাক্লিয়াস প্রথমে বাদশাহ, তারপর খ্রিস্টান। তার ধার্মিকতা কপটতার মুখোশ মাত্র। আর আমরা প্রথমে খ্রিস্টান, তারপর রোমান।

তারপর আন্তোনীস ঐ ক্রুশটি দেখান যা রূতাসকে সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) দিয়েছিলেন এবং বলল, আমরা এই পিতার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় জীবন বাজি রাখতে চাচ্ছি।

আন্তোনীস আরো বলল, এটা রোম ও পারস্যের মত কোন বাদশাহী হবে না। এটা হবে ঈসা মসীহ এর সালতানাত। আরব কবিলাগুলোর সকল খ্রিস্টান যদি একমত হয় এবং আমার নেতৃত্ব মেনে নেয় তাহলে আমি তাদের নিয়ে

একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী গড়ে তুলব। তারপর অল্প সময়ের ব্যবধানে আমরা মুসলমানদের শাম থেকে তাড়িয়ে দেব।

আন্তোনীসের কথা শুনে বৃদ্ধের মলিন চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অধর কোণে একটি মিষ্টি হাসির রেখা বিকশিত হয়ে আবার মিলিয়ে গেল। মনে হল আন্তোনীসের মত চিন্তা ও ভাবনাই সে দীর্ঘদিন যাবৎ তার হৃদয়ের গহীন প্রকোষ্ঠে লালন করে আসছে।

বৃদ্ধ বলল, আমরা কখনো ইরানীদের গোলাম ছিলাম। কখনো ছিলাম রোমানদের একান্ত অনুগত প্রজা। আর এখন আমরা মুসলমানদের উন্মুক্ত তরবারীর নীচে অবস্থান করছি। গোটা এলাকার সংবাদ আমার নিকট আসছে। আমাদের কবিলাগুলো বিদ্রোহ করলেও তাদের মাঝে কোন ঐক্য নেই। সবাই বিচ্ছিন্ন। কেউ মুজাহিদদের মুকাবিলায় রণাঙ্গনে দাঁড়াতে পারছে না। বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করছে। তাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিচ্ছে। আমার দৃষ্টিতে এখন শুধুমাত্র আলেপ্পো শহরটিই বাকি আছে। আমি এখনো এই কেল্লা পরিবেষ্টিত শহরটির দিকে তাকিয়ে আছি। দু'টি শক্তিশালী গোত্র এতে বসবাস করে। বনু রবীয়া ও বনু তানুখ। এ পরিস্থিতিতে যদি আমরা আলেপ্পোবাসীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে পারি, মরণপণ যুদ্ধ করে মুজাহিদদের পরাজিত করতে পারি তাহলেই কবিলার অন্যান্য যোদ্ধাদের মনে সাহস সঞ্চারিত হবে। তারাও আমাদের পতাকা তলে ছুটে আসবে। আন্তোনীস বলল, তাহলে কি আপনি ঐ কবিলাগুলোর সর্দারদের এখানে ডেকে আনবেন? আমরা এখনো দৃশ্যপটে আসতে চাচ্ছি না। কারণ হতে পারে, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের গুপ্তচররা আমাদের সন্ধানে প্রত্যেকটি অঞ্চল চষে ফিরছে।

বৃদ্ধ বলল, তোমাদের কোন ভয়ের কারণ নেই। যতক্ষণ আমাদের মাঝে আছো ততক্ষণ তোমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবারও কারো সাহস হবে না। কোন সর্দারকে এখানে ডেকে আনার প্রয়োজন নেই। আমি তোমাদেরকে আলেপ্পায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করছি। সর্দাররাই তোমাদের সাথে এসে দেখা করবে। আমি তোমাদেরকে কৃষক ও মজুরের ছদ্মবেশে আলেপ্পায় পৌঁছিয়ে দিচ্ছি।

সুদৃঢ় দুর্গবেষ্টিত আলেপ্পার পরিস্থিতি শান্ত। বিদ্রোহের কোন আলামত দেখা যাচ্ছে না। অল্পসংখ্যক মুজাহিদ স্থায়ীভাবে সেখানে আছে। শহরের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, কর ও জিযিয়া আদায় করা ইত্যাদি অত্যন্ত আবশ্যকীয় কাজ তারা আঞ্জাম দিচ্ছে। তবে ক্রমান্বয়ে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরব কবিলা-গুলোর খ্রিস্টান যোদ্ধারা সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। বিভিন্ন কবিলার সর্দাররাও সেখানে বসবাস করছে। সেখানে আসা যাওয়া করছে।

আন্তোনীস, রূতাস, লীজা ও ইউকেলিস যখন আলেপ্পা শহরে প্রবেশ করল তখন কেউ তাদের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। তাদের খোঁজ খবর নেয়ার প্রয়োজনও অনুভব করল না। এদের মত কতো বিপর্যস্ত মানুষ একের পর এক আলেপ্পায় আশ্রয় নিচ্ছে। তাদেরকেও তেমনি বিপর্যস্তই মনে করা হল। তাদের সাথে বৃদ্ধের প্রেরিত দুই ব্যক্তি ছিল তারা তাদেরকে এক সর্দারের বাড়িতে পৌঁছে দিল।

আলেপ্পায় পৌঁছে তারা বুঝতে পারল, যে বৃদ্ধের নিকট তারা পৌঁছেছিল তিনি সাধারণ লোক নন। আরব খ্রিস্টান কবিলাগুলোর সর্দাররা তাকে বিশেষ মর্যাদার নজরে দেখে। তার ইশারা-ইঙ্গিতে সকলে উঠাবসা করে। তাকে তারা দিক দিশারী প্রজ্ঞাবান মনে করে। এ কারণেই আন্তোনীস ও তার সাথীরা আলেপ্পায় আরব খ্রিস্টান সর্দারের বাড়িতে পৌঁছলে সর্দার তাদের সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আরো কয়েকজন সর্দার এসে উপস্থিত হল। আন্তোনীস তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করার পর তারা আলেপ্পার বাইরে থেকে আরো কয়েকজন সর্দারকে উপস্থিত করল। আন্তোনীসের পরিকল্পনা ও ইচ্ছার কথা শুনে তারা প্রীত হল। একমত হল। সবাই খ্রিস্ট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। কিন্তু কিভাবে বিদ্রোহের সূচনা হবে? কিভাবে বিজয়ের পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে? এ আলোচনা শুরু হল। অনেক আলোচনা পর্যালোচনা হল। শেষে এক পরিকল্পনা তৈরী হল। এক কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত হল।

সে অনুযায়ী সর্দাররা তাদের বিশেষ ব্যক্তিদের ডেকে আনলেন। তাদের জরুরী কিছু নির্দেশ দিয়ে বিদায় জানালেন। এর দু'কি তিন দিনের মধ্যেই দুর্গ পরিবেষ্টিত আলেপ্পা শহরে অস্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন কবিলার লোকেরা আশ্রয়-প্রার্থীর ভুতনে আসতে লাগল। বন্যার স্রোতের ন্যায় তারা একের পর এক আলেপ্পায় আসছে। শহরের মুজাহিদরা এর তত্ত্ব তালাশের কোন প্রয়োজন অনুভব করল না। আশ্রয় প্রার্থীদের সাথে যুদ্ধাস্ত্রও আসছে। তীর, ধনুক, বর্শা আসছে, তুনীর আসছে। কিছু অস্ত্র খোলামেলাই আসল। আর কিছু অস্ত্র গোপনে এল।

রোমানরা এ শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে। তাদের প্রাসাদগুলো ও রোমান সৈন্যদের ক্যাম্পগুলো খালি পড়ে আছে। তথাকথিত আশ্রয় সন্ধানীরা এসব খালি প্রাসাদ ও ক্যাম্পগুলোতে আশ্রয় নিতে লাগল। আশ্রয় প্রার্থীদের সংখ্যা অস্বাভাবিক বেড়ে গেল। খালি প্রাসাদ আর ক্যাম্পগুলোতে আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই। এরপরও আরো আশ্রয় সন্ধানী এল। এরা খোলা মাঠে তাঁবু টানাতে লাগল। আন্তোনীস সর্দারদেরকে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দিচ্ছে। সর্দাররা

তা তাদের বিশেষ ব্যক্তিদের সহায়তায় কবিলাগুলোর প্রত্যেক সদস্যের নিকট পৌঁছে দিচ্ছে। এভাবেই অত্যন্ত গোপনে বিদ্রোহের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে।

আন্তোনীস ও তার সাথীদের কাউকেই মুজাহিদরা চিনে না। লীজা ও ইউকেলিস তো সম্রাট পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তাদের চিনার কোন প্রশ্নই আসে না। তবে ইউকেলিসকে কবিলাগুলোর প্রায় সকল সর্দারই চিনে। আর এ কারণেই সর্দাররা বিনা বাক্যব্যয়ে, নির্বিবাদে আন্তোনীসের পাশে এসে জড়ো হয়েছে।

ইউকেলিস কুস্‌তুনতীনের হাত থেকে এক আরব কবিলার সুন্দরী কন্যাকে উদ্ধার করেছিল। তাই তার সুনাম কবিলার সর্দারদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাছাড়া হিমসের যুদ্ধের পূর্বে প্রায়ই সে আরব কবিলাগুলোর যোদ্ধাদের মাঝে ঘোরাফেরা করত। সর্দারদের সাথে আলাপ আলোচনা করত। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পুত্র হওয়ার কারণে সবাই তাকে সম্মান করত। আদর আপ্যায়ন করত। তার উদার মন-মানসিকতা ও প্রাঞ্জল কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনত। তার বুদ্ধিমত্তা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে সবাই বিস্মিত হত। তারা তাকে তাদের ইজ্জত ও আযাদী রক্ষার প্রহরী মনে করত। এবার তারা ইউকেলিসকে তাদের মাঝে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত, বিমোহিত ও আশাবাদী হল।

* * *

রাতের আঁধার নেমে এলে মাঝে মধ্যে লীজা বাইরে বেরিয়ে আসে। কেল্লার প্রাচীর ধরে ঘুরে বেড়ায়। ইউকেলিস যুবক ছেলে। ঘরে সে বন্দী থাকতে পারে না। তাছাড়া তার তো বন্দী থাকার কোন প্রয়োজনই নেই। মুজাহিদদের কেউ তো তাকে চিনে না।

একদিন তার মন কেমন যেন উতলা হয়ে উঠল। কোন কিছুই তার ভাল লাগছে না। সবকিছুতেই তিক্ততা অনুভব করছে। মনের এই তিক্ততা ও অবসাদ দূর করার জন্য আলেপ্পা শহরের বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে চলে গেল। উদ্দেশ্যহীনভাবেই ঘোরাফেরা করছে। শহরের বাইরের পৃথিবীটা যেন অন্য জগত। চারদিকে সবুজের সমারোহ। মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু গাছপালা। দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের জমিন। এর মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে একটি সুন্দর খরস্রোতা নহর। নহরের নির্মল পানিতে প্রাণ জুড়ায়। নহরের কুল ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা দূরে চলে এলো। নহরটি বাঁক কেটে এঁকে বেঁকে সরীসৃপের ন্যায় দূরে বহুদূরে চলে গেছে। ইউকেলিসের মনে এক অজানা প্রফুল্ল উঁকি দিল। গুণগুণ করে গান ধরে আনমনে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটু দূরের ঝোঁপের আড়াল থেকে চারপাঁচ জন যুবতীর হাস্যধ্বনি শুনতে পেল। উৎকর্ণ হয়ে উঠল তার কান। দৃষ্টিতে তার চরম অনুসন্ধিৎসা। তারা দৌড়ে ঝোঁপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে

ইউকেলিসের সামনে পড়ে গেল। ইউকেলিসকে দেখেই তারা অপ্রস্তুত। হতবাক। তবে তাদের একজন ইউকেলিসকে দেখে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকিয়ে তার দিকে এগিয়ে এল। ইউকেলিস মেয়েটির আচরণে বিস্মিত হল।

মেয়েটি বলল, আপনি আমাকে চিনতে ভুললেও আমি কখনো আপনাকে ভুলব না। আপনিই আমার ইজ্জত রক্ষা করেছিলেন। আপনি না হলে.........।

ইউকেলিস মৃদু মিষ্টি হাসির পরাগ ছড়িয়ে বলল, সে তো আমার দায়িত্ব ছিল। আমি কিন্তু তোমাকে চিনতে পারছিলাম না।

মরুর কোলে লালিত মেয়েটি যৌবনের কোঠায় পৌঁছলেও কৈশোরের দূরন্তপণা এখনো দূর হয়নি। অসম্ভব রূপবতী। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যৌবনের জৌলুস। রূপতরঙ্গের কলতান। লাবনী ঝরে পড়ছে আভরণ ভেদ করে। আর আভরণ বাড়িয়েছে তার রূপের মহিমা। নিখুঁত আবেগ আর উচ্ছাসে মেয়েটি নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ইউকেলিসের হাত ধরে তাতে চুমু খেল, চোখে লাগাল। তারপর তার বাম হাতটি গভীর দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। ইউকেলিস বলল, জন্ম থেকেই আমার বাম হাতটি এমন নিষ্ক্রিয়। শক্তিহীন।

মেয়েটির চেহারায় বিষাদ বিষাদ ভাব ছড়িয়ে পড়ল। চোখের কোণে নির্মল অশ্রু টলটল করতে লাগল। বলল, আমি আপনাকে প্রায়ই স্বপ্নে দেখি। আমি যখন ভাবি আপনাকে জীবনে আর কখনো দেখতে পারব না, তখন আমার হৃদয়ে বিষাদের তরঙ্গ বয়ে যায়। আপনার মত আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আমার নিকট আমার জীবনের চেয়ে বেশী প্রিয়।

ইউকেলিস বলল, সে আমার বড় ভাই ছিল। আমি তাকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার বাম বাজু না থাকলেও আমি তলোয়ার, বর্শা ও কুঠার দিয়ে দু'তিনজনের মোকাবেলা করে অনায়াশে পরাভূত করতে পারি।

মেয়েটির মধুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বলল, শুনেছি আপনি নাকি সম্রাটের পুত্র। সে সম্রাট তো পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছেন। তাহলে আপনি এলেন কোথা থেকে?

ইউকেলিস বলল, আমি সম্রাটকে ত্যাগ করে চলে এসেছি। সে দিন তোমার ইজ্জত রক্ষা করেছিলাম। আজ তোমাদের কবিলাগুলোর ইজ্জত রক্ষা করতে এসেছি। এখন থেকে আমি এখানেই থাকব।

মেয়েটির চেহারায় এক অভাবনীয় প্রফুল্লের প্রভা ছড়িয়ে পড়ল। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না যে, তার স্বপ্নের শাহজাদা তার সামনে উপস্থিত।

অন্যান্য মেয়ে অনতিদূরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ভরা চোখে দেখছিল। মেয়েটি হাতে ইশারা করলে অন্যান্যরা কলহাস্যে চারদিক মুখরিত করে চলে গেল।

মেয়েগুলো চলে যাওয়ার পর ইউকেলিস ও মেয়েটি নহরের তীরে অবস্থিত একটি সুগন্ধি ফুলের ঝাড়ের পশ্চাতে গিয়ে বসল। তারা ঘেঁসে বসে আছে। মেয়েটি বার বার প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে শিশুর সারল্য নিয়ে ইউকেলিসের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দুরন্ত যৌবন যেন মুক্ত বিহঙ্গের মত পাখা মেলে উড়তে চাচ্ছে। ইউকেলিস আপাঙ্গে চেয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। মেয়েটির মসৃণ দীপ্তিময় মুখ তার চোখের পাতায় নেশা ধরিয়ে দেয়।

এরপরও কয়েকদিন মেয়েটির সাথে ইউকেলিসের দেখা হয়েছে। মেয়েটি তার কবিলার সর্দারের কন্যা। রাতেও সে ইউকেলিসের নিকট এসেছে। দু'জনে অভিসারে বেরিয়েছে। কখনো কেল্লার দেয়ালের পাশে নির্জন স্থানে গিয়ে বসেছে। আবার কখনো হাত ধরাধরি করে ঘুরে ফিরেছে। হৃদয় দেয়া-নেয়ার খেলায় তারা অনেক দূর চলে গেছে। ইউকেলিস আলেপ্পায় কি করছে? কি তার উদ্দেশ্য? কে কে তার সাথে এসেছে? এ সব কিছুই ইউকেলিস মেয়েটির নিকট বলে দিয়েছে। মেয়েটি ইউকেলিসের কথা শুনে তাকে আকাশ থেকে নেমে আসা কোন অবতার মনে করছে।

একদিন মেয়েটি কথা প্রসঙ্গে ইউকেলিসকে বলল, আমার মনের এক দুশ্চিন্তা, এক দুর্ভাবনা আপনি কিভাবে দূর করবেন? আপনারা যে বাদশাহী প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন তা যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে তো আপনি শাহজাদা হয়ে যাবেন। তখন কি আপনার নিকট আমার কোন মর্যাদা থাকবে? আমি কি আপনার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগটুকু পাব?

ইউকেলিস তখন শুধুমাত্র কথায় নয়, বরং মেয়েটির ললাটে প্রগাঢ় চুম্বন এঁকে দিয়ে সবলে বুকের মাঝে চেপে ধরে বলল, আমি সর্বদা তোমার নিকট তোমার মনের মানুষ হয়েই থাকব। তোমাকে কখনো ভুলব না।

* * *

আন্তোনীস যে রাতে যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত করেছিল সে রাতে কবিলার যোদ্ধারা অনায়াসে কেল্লার মুজাহিদদের কাবু করে ফেলে। মুজাহিদরা তাদের শয়ন কক্ষগুলোতে গভীর ঘুমে নিমগ্ন ছিল। মুজাহিদদের বন্দী করার জন্য যে সব যোদ্ধাদের নির্বাচিত করে আন্তোনীস ও রূতাস ট্রেনিং দিয়েছিল তারা তা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করল। তারা তাদের আক্রমণের অবকাশ না দিয়েই একটি বিরাট কক্ষে বন্দী করে ফেলল।

শহরের প্রধান ফটকে দু'জন মুজাহিদ তাদের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিল। তারা বুঝতে পারল, শহরে বিদ্রোহ হয়েছে এবং তাদের সাথীদের বন্দী করেছে। তারা কাল বিলম্ব না করে সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক তখন

তাদের উপর কয়েকজন বিদ্রোহী যোদ্ধা আক্রমণ করল। তারা প্রাণপণে যুদ্ধ করে জখমী হলেও সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হল। বহু কষ্টে তিন মাইল দূরে পৌঁছে এক বস্তি থেকে দু'টি ঘোড়া নিয়ে মরুর বুক চিরে ছুটে চলল। উর্ধ্বশ্বাসে মরুর দুরন্ত বায়ুকে পরাজিত করে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলছে।

প্রায় বিশ মাইল দূরে অবস্থিত কেল্লাসিরিন শহর। খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) সে শহরে অবস্থান করছেন। মজবুত কেল্লা বেষ্টিত বিরাট এই শহরটি খালিদ (রা.) আক্রমণ করে রোমানদের থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। জখমী মুজাহিদ দু'জন তাদের ক্ষতের কোন পরোয়া না করে তার পরদিন কেল্লাসিরিনে উপস্থিত হল। সোজা খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) এর নিকট পৌঁছে তাকে সংবাদ দিল, আলেপ্পায় আরব খ্রিস্টানরা বিদ্রোহ করেছে।

খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) সংবাদ পাওয়ার পর পরই সিপাহ সালার আবু উবায়দা (রা.) এর নিকট একজন দূত পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে সৈন্য নিয়ে আলেপ্পার পথে রওনা হলেন। ঝড়ো হাওয়ার মত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) আলেপ্পায় ছুটে এলেন। পশ্চাতে উট আর গরুর গাড়িতে করে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সামগ্রী পৌঁছার ব্যবস্থা করে এলেন।

অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) আলেপ্পায় পৌঁছে কেল্লার চারদিক পর্যবেক্ষণ করে বুঝলেন, সহজে এ কেল্লার পতন সম্ভব নয়। দূর দূরান্ত থেকে আগত কবিলার যোদ্ধারা কেল্লার প্রাচীরে তীর ধনুক আর বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সংখ্যা গুনে শেষ করার নয়। খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) এর সাথে চার হাজার মুজাহিদ। তিনি প্রাচীরের উপরে দণ্ডায়মান যোদ্ধাদের উপর তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তার প্রতিউত্তরে কেল্লার উপর থেকে যেভাবে তীরবৃষ্টি শুরু হলো তাতে মুজাহিদ বাহিনী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না।

সবদিক চিন্তা করে খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর নিকট এক অশ্বারোহী দূত পাঠিয়ে সংবাদ দিলেন, আরো মুজাহিদ বাহিনীর দরকার। কারণ কেল্লাটি অত্যন্ত মজবুত আর খ্রিস্টান যোদ্ধারা অত্যন্ত সাহসী ও সংখ্যায় প্রচুর। সংবাদ পেয়ে আবু উবায়দা (রা.) সালার ইয়ায ইবনে গানাম (রা.)-কে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী মুজাহিদসহ প্রেরণ করলেন।

খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) কেল্লার প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলতে ও কেল্লার পতনের ক্ষেত্রে দারুণ দক্ষ ছিলেন। এ জন্য তিনি একটি দুর্ধর্ষ বাহিনীও তৈরী করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসের এই কিংবদন্তী যোদ্ধা কখনো অবরোধ দীর্ঘ হওয়ার পক্ষে ছিলেন না।

অবরোধের পর তিন কি চার দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আন্তোনীস বন্দী মুজাহিদদেরকে রশি দিয়ে মজবুত করে বেঁধে কেল্লার প্রাচীরের নিকটে নিয়ে এসেছে। তারপর সাড়িবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ঘোষণা করল, অবরোধ তাড়াতাড়ি তুলে নাও, না হলে এদের ছিন্ন মস্তক তোমাদের উপহার দেয়া হবে।

একজন বন্দি মুজাহিদ বাঁধা অবস্থায় প্রাচীরের নিকটে দাঁড়িয়ে থেকেই অত্যন্ত উচ্চস্বরে বলল, মুজাহিদ ভাইয়েরা আমার! অবরোধ তুলে নিবে না। আমাদের নিহত হতে দাও। আমরা নিহত হওয়ার জন্যই আল্লাহ্‌র পথে বেরিয়েছি। আল্লাহ্‌ তোমাদের সহায়ক। কেল্লার প্রাচীর ভেঙ্গে ফেল!

বন্দী এই মুজাহিদের শাহাদাতের স্পৃহা ও মনের আবেগের উত্তাপে বাইরের মুজাহিদরা জ্বলে উঠল। তারা তখনই আক্রমণের জন্য চিৎকার শুরু করল। খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) ও ইয়ায ইবনে গানাম (রা.) সেখানে উপস্থিত। তারা সবকিছুই উপলব্ধি করছিলেন। তারা মুজাহিদদের শান্ত থাকার আহ্বান জানালেন। বললেন, অযথা রক্তক্ষয় করে লাভ নেই। বুদ্ধিমত্তার সাথে অগ্রসর হতে হবে, ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে কাজ করতে হবে। সবাই আল্লাহ্‌র নুসরতের দু'আ করতে থাক। আমরা ভাবছি।

প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য আরো দু'দিন চেষ্টা করলেন। কিন্তু মুষলধারায় তীর বর্ষণের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। তখন খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) দারুণ ভাবনায় পড়ে গেলেন। চিন্তার সাগরে যেন ডুবে গেলেন। হঠাৎ তার মাথা দুলে উঠল, স্বাগতোক্তি করে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, পেয়েছি। এ পন্থায়ই অগ্রসর হতে হবে।

কেল্লার প্রাচীরের কিছু দূরে এক উঁচু টিবি ছিল। সেখানে ও কেল্লার চার পাশে বিদ্যমান উঁচু উঁচু গাছে মুজাহিদদের আরোহণ করে সেখান থেকে অগ্নি তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। সা সা করে অগ্নিতীর কেল্লার ভিতরে গিয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু না, তেমন কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল না। কোথাও অগ্নিতীরে আগুন ধরল না। হই হুল্লোর বা বিশৃঙ্খলারও কোন আভাস পাওয়া গেল না। কারণ কেল্লার ভিতরে বাড়িঘর প্রাচীর থেকে অনেক দূরে। সেখানে অগ্নিতীর পৌঁছা অসম্ভব।

* * *

খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) ও ইয়ায ইবনে গানাম (রা.) কেল্লার ভিতরের কোন খবরই জানেন না। কেল্লার ভিতরে মুসলমান কোন চর থাকলেও বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছে না। আর বাইরে থেকেও কোন মুসলমান চর আরব খ্রিস্টানের ছদ্মবেশে ভিতরে যেতে পারছে না। কেল্লার প্রাচীরের উপরে দণ্ডায়মান

খ্রিস্টান যোদ্ধারা তীর ধনুক আর বর্শা নিয়ে প্রথম দিন যে আগ্রহ স্পৃহার সাথে যুদ্ধ শুরু করেছিল আজও তারা সে অবস্থায়ই আছে।

খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) তার অধীনস্ত সালারদের এবং মুজাহিদদের ডেকে বলেছেন, আলেপ্পাকে তোমরা নিজেদের শহর মনে করবে। তাদের আত্মবিশ্বাস ও সাহস বৃদ্ধির লক্ষ্যে বলেছেন, শহরে কোন বিজ্ঞ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফৌজ নেই। এরা হয়ত কয়েকদিন যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং বিশৃঙ্খলতার মাঝে ডাক চিৎকার করে শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চার করার চেষ্টা করছে। কিন্তু অবরোধের মাঝে স্থির থাকা বা অবরোধ ভেঙ্গে ফেলার ক্ষমতা এদের নেই। এরা অতিশীঘ্রই অস্ত্র সমর্পণ করে আমাদের আনুগত্য মেনে নিবে। বা এমন কোন ভুল করে বসবে যার কারণে তাদের উপর পরাজয় নেমে আসবে।

খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেন নি যে, অবরুদ্ধ খ্রিস্টান যোদ্ধাদের নেতৃত্বে রয়েছে এক রোমান সিপাহসালার আর তার সহযোগী হিসাবে আছে এক রোমান সামরিক অফিসার যে সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর নিকট হিমস বিজয়ের সময় বন্দী ছিল। মুসলমানরা এ কথা ভাবতেও পারেনি যে, তাদের মাঝে রয়েছে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের এক স্ত্রী ও তার পুত্র।

কেল্লার ভিতরে আন্তোনীস আর রূতাসের অবস্থা সঙ্গিন। রাতে তারা একটু ঘুমাতেও পারছে না। তাদের ক্ষেত্রে এটা কোন কেল্লা বা কোন এক শহর বিজয়ের যুদ্ধ নয় বরং তাদের জীবন মরণ সংগ্রাম। আন্তোনীসের প্রতিজ্ঞা, সে একটি খ্রিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেই। আরব খ্রিস্টান যোদ্ধাদের নিয়ে সে সেই রাজ্যে দুর্ধর্ষ বাহিনী গড়ে তুলবে। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হল আলেপ্পাকে ধরে রাখা। এ প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রূতাস হল তার প্রধান সহযোগী।

হিরাক্লিয়াসের পুত্র ইউকেলিসও নিরবে বসে নেই। এক হাত নিষ্ক্রিয় তাতে তার কোন আক্ষেপ নেই। বাকি এক হাত দিয়েই সে যুদ্ধ করতে পারে। সেও রাত দিন ব্যস্ত। ছুটাছুটি করছে। যোদ্ধাদের উৎসাহ দিচ্ছে। শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে আতঙ্কিত মানুষদের সমবেত করে বক্তৃতা দিয়ে উজ্জীবিত করছে। বলছে, ভয়ের কোন কারণ নেই। বিজয় আমাদের হবেই হবে। অল্পদিনে আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ঈসা মাসীহ এর রাজ্য কায়েম করতে যাচ্ছি। নিশ্চয় ঈসা মাসীহের সাহায্য আমাদের সাথে রয়েছে।

কয়েক রাত কেটে গেল সে তার মায়ের সাথে দেখা করার সুযোগ পেল না। কেল্লার প্রধান ফটকের উপরে যে কয়েকটি কক্ষ তৈরী করা হয়েছিল তাতেই সে রাত অতিবাহিত করে দিল।

* * *

আন্তোনীস, লীজা ও ইউকেলিস এক বাড়িতে থাকে আর রূতাস অন্য বাড়িতে থাকে। বাড়ি দু'টি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অত্যন্ত সুন্দর আদলে তৈরী। দেখলেই মনে হয় এ বাড়ি দু'টি রোমান কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মনের সকল মাধুরী দিয়ে তৈরী করেছিল। রূতাস তিন চার দিন পর পর লীজার বাড়িতে আসত। কিন্তু অবরোধ শুরু হওয়ার পর থেকে সে লীজার বাড়িতে খুব কমই যায়। কারণ দিন রাত সারাক্ষণ তাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়।

আন্তোনীস, লীজা ও ইউকেলিস এক বাড়িতে থাকলেও আন্তোনীস এখন আর প্রত্যেক দিন বাড়িতে আসতে পারে না। দু'তিন দিন পরপর ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে আসে। আন্তোনীস ও রূতাস সর্বক্ষণ কেল্লার প্রাচীরের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। যোদ্ধাদের নানা পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিতে থাকে। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয় তারা যেন সর্বক্ষণ সর্বত্র থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছে। খ্রিস্টান যোদ্ধাদের উৎসাহ দিচ্ছে। মনোবল বৃদ্ধি করছে। মাঝে মাঝে গভীর রাতে আন্তোনীস ক্লান্ত শ্রান্ত ও নেতিয়ে পড়া দেহ টানতে টানতে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেই বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরই সে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে ও অস্ত্র নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। বাড়িতে আসলেও মনে হয় সে বাড়িতে নেই।

আন্তোনীস ও রূতাস রোমান বাহিনীর উচ্চ পদস্থ সালার। তাই তারা খুব ভালভাবেই জানে, তারা যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা যুদ্ধ করতে জানলেও সুশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য তাদের নেই। তাই তারা বারবার দিক নির্দেশনার মুহতাজ। তারা কেল্লার প্রাচীরের উপর ঘুরে ঘুরে পরিস্থিতি দেখে এবং তার যোদ্ধাদের উৎসাহ দেয় যেন মুসলমানরা কিছুতেই প্রাচীরের নিকটবর্তী হতে না পারে। তাছাড়া তারা একদল সাহসী দুর্ধর্ষ যুবককে এমন প্রশিক্ষণ দিয়েছে যারা হঠাৎ কেল্লা থেকে বের হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে অভাবনীয় ক্ষতি করে আবার নিরাপদে কেল্লায় ফিরে আসতে সক্ষম হবে।

এক রাত আন্তোনীস বাড়িতে এসে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। শুয়ে পড়ল। লীজা এগিয়ে এল। মনে হচ্ছে, সে আন্তোনীসের সাথে কিছু কথা বলবে। কিন্তু আন্তোনীসের সে দিকে খেয়াল নেই। দু'চারটি কথা বলেই আন্তোনীস অবরোধের আলোচনা শুরু করল। সাথে সাথে লীজার চেহারায় বিরক্তির সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠল। বুঝা গেল, সে আন্তোনীসের এই কথায় কোন আগ্রহ অনুভব করছে না।

তিক্ততায় ভরা কণ্ঠে লীজা বলল, আচ্ছা আন্তোনীস! তুমি কি আমার সাথে অন্য কোন কথা বলতে পার না!

আন্তোনীস উঠে বিছানায় বসল। বলল, লীজা! তুমি একথা বলছো! আমি তো এ ধারণা রাখি যে, আমি বাড়িতে এলে সবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করবে, এখন অবরোধের পরিস্থিতি কেমন? অবরোধ কখন শেষ হবে? অবরোধ ভেঙ্গে ফেলার কোন পথ কি বের হয়েছে? এখন যা বললে তাতে মনে হয়, আমরা অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় আছি। অথচ আমি আমার মনে অন্য কোন চিন্তাকে আশ্রয় দিতে পারছি না।

লীজার অবস্থা স্বাভাবিক হল না। বরং আন্তোনীসের কথায় তার চেহারায় আরো বিরক্তি ও অসন্তোষের ভাব ছড়িয়ে পড়ল।

আন্তোনীস এবার লীজার চেহারায় সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে দেখল, লীজার চেহারায় অন্য ধরনের এক নেশা, তার অবয়বে ভিন্ন প্রকৃতির এক মোহের আলামত নৃত্য করছে। আন্তোনীস তার এই নেশা ও মোহের দাবী ও চাহিদা সম্পর্কে জ্ঞাত। তাদের মধ্যকার অবস্থা তো নির্মল প্রেম ও ভালবাসায় উজ্জীবিত এক প্রাণ এক দেহের মত নয়। যৌবনের ক্ষুধা নিবারণের জন্যই লীজা তার জীবনাকাশে আন্তোনীসকে টেনে এনেছে। তাই তার দাবী ও চাহিদা স্পষ্ট।

আন্তোনীস বলল, লীজা! আমাদের অবস্থার কথা একটু ভেবে দেখ। এ সময় কিন্তু মজে থাকার কথা নয়। আমরা যদি এ যুদ্ধে হেরে যাই তাহলে আমাদের কোন আশ্রয় থাকবে না। আমরা এখান থেকে পালিয়ে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিব। বনু তাগলিবের মত যোদ্ধা ও শক্তিশালী কবিলাও বাধ্য হয়ে মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু তোমারও দায়িত্ব আছে। তোমারও ঘর থেকে বেরিয়ে কেল্লার ভিতরের মহিলাদের নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তোলা দরকার। প্রয়োজনে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে। মনে রাখবে, জীবন দিয়ে হলেও এ যুদ্ধে আমাদের বিজয়ের মাল্য ছিনিয়ে আনতেই হবে।

তবুও আন্তোনীস লীজাকে তার মনের আবেগ, ইচ্ছা, প্রতিজ্ঞা ও পরিকল্পনার কথা বুঝাতে পারল না। কারণ লীজা তার সাথে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তা শুধুমাত্র দৈহিক সুখানুভূতির মাঝেই সীমিত ছিল। সম্রাট হিরাক্লিয়াস লীজাকে তার হেরেমে ফেলে রাখার পর লীজা তার যৌবন ক্ষুধা নিবারণের জন্য যাকে পেতো তাকেই গ্রহণ করত। আন্তোনীসকেই সে তখন অতি নিকটে পেয়েছিল। তাই তাকেই এ কাজের জন্য গ্রহণ করেছিল। উভয়ের এই মিলনের ফলশ্রুতিতে ইউকেলিসের আগমন হয়েছিল। এখন তো ইউকেলিসও তাকে পিতা হিসাবে বরণ করে নিয়েছে।

রাজা-বাদশাহদের স্ত্রী পরিজনের মাঝে সাধারণত জাতীয় কল্যাণ-অকল্যাণের চিন্তা থাকে না। কোন দেশ বা অঞ্চলের সাথে তাদের হৃদয়েরও

কোন টান থাকে না। তারা জীবনের উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে সর্বদা এ পরিণতির জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে যে, অন্য কোন রাজা হয়তো আক্রমণ করে তাদের দেশকে পদানত করে নিবে। তারপর তাদেরকে বন্দি করে নিয়ে তাদের আনন্দ উল্লাস আর বিনোদন সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করবে। অথবা কোন সালার বা রাজকুমার তাদের হাত ধরে টেনে নিয়ে স্বপ্নের আকাশে উড়ে যাবে। তখন কারো কিছু বলার অধিকারও থাকবে না। তাই হেরেমের নারীদের বিজয়-পরাজয় আর উত্থান-পতনের সাথে কোনই সম্পর্ক নেই।

লীজার মানসিক অবস্থাও ঠিক তেমনি। আলেপ্পার বিজয় বা পরাজয় তার মূখ্য বিষয় নয়। আন্তোনীসের সাহচর্যই তার বেশী প্রয়োজন। সে একথাও ভেবে দেখেনি যে, আন্তোনীসও তো তার ব্যাপারে নিস্পৃহ ও আগ্রহহীন হয়ে যেতে পারে। আজকাল লীজা তাকে আকর্ষণ করার কিছু চেষ্টা করলেও আন্তোনীস থাকে অন্য চিন্তায় বিভোর। তার এখন লীজার সাথে হাস্যরস করার সুযোগ কই।

লীজার কথায় নৈরাশ্য ভাব ফুটে উঠল। বলল, তুমি তো এখনো তোমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছ। কবে তা হবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারে। কিন্তু এখনই তোমার আচার-আচরণ সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মত হয়ে উঠেছে। আমার পাশে বসে তুমি এখন আর কথা বলার ফুরসুতটুকুও পাও না।

আন্তোনীস অত্যন্ত ক্লান্ত। হাত পা যেন এখন আর তার চলে না। তাছাড়া আলেপ্পার বিজয় আর মুসলমানদের পরাজয়ের চিন্তা ভাবনায় তার মাথা আগুন হয়ে আছে। কিভাবে মুসলমানদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করবে এ চিন্তাই সারাক্ষণ তার মাথায় ভনভন করছে। লীজা তাকে যে উদ্দেশ্যের জন্য আহ্বান করছে আন্তোনীস তার সে আহ্বানে সাড়া দিল না। বরং শ্রান্ত দেহ নিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেল। মৃত ব্যক্তির ন্যায় তার দেহটি বিছানায় পড়ে রইল। লীজা এগিয়ে এসে তার ঘুমন্ত মুখটির দিকে তাকিয়ে রইল। যেন একটি ফোয়ারা হঠাৎ শুকিয়ে মরে গেছে।

এ সময়ে লীজার অন্তরে ইউকেলিসের কথাও মনে পড়ে গেল। যাকে বুকের মাঝে রেখে রেখে সে জীবন কাটিয়ে দিল। যার জন্য নিজের জীবনকে নিংড়ে নিংড়ে শেষ করে দিল সেও তার দিকে এখন বেশি লক্ষ্য রাখছে না। দুই দুই তিন তিন রাত সে ঘরে আসে না। কখনো কিছু সময়ের জন্য এলেও কিছু আশার কথা শুনিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে যায়। আন্তোনীস বলে, সে ঈসা মসীহ-এর রাজত্ব কায়েম করবে। কিন্তু ইউকেলিসের সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে ও কুসতুনতীনকে নিজ হাতে হত্যা করার প্রতি বেশী আকর্ষণ। লীজা কখনো ইউকেলিসকে নিজের কাছে রেখে যুদ্ধে নিহত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখার চিন্তা

করেনি। তার এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন আন্তোনীসের। আর আন্তোনীসও যেন তার হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে।

* * *

পরদিন সকালে সূর্য বেশ উপরে উঠে যাওয়ার পর লীজার ঘুম ভাঙল। চোখ খুলেই দেখে চারদিক আলো ঝলমল। জানলা গলিয়ে সূর্যের যে আলো ঘরে এসেছিল তা এখন বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে সে সবগুলো কক্ষ ঘুরে দেখল, যেন খাঁ খাঁ করছে। প্রত্যহ সকালেই এমন হয়। কিন্তু আজ সকালের এই একাকিত্ব তার হৃদয়ে যেন কাঁটা হয়ে বিঁধছে। পরিচারিকা এসে নাস্তা রেখে গেছে। ধূমায়িত খাবার। সুগন্ধে চারদিক মৌ মৌ করছে। লীজা নাস্তা খেতে বসল। অদূরে পরিচারিকাটি নির্দেশের অপেক্ষায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পর পরিচারিকাটি ভীত কণ্ঠে বলল, রাণী মাতাজী! ঈশ্বর আপনাকে আরো মর্যাদাবান করুন। আমরা গরীব মানুষ। কবে অবরোধ উঠে যাবে জানলে মনটা আনন্দিত হয়। আপনি হয়তো জানেন না শহরে তরী তরকারির অভাব দেখা দিয়েছে। পানি তো যথেষ্ট আছে। কিন্তু শুধু পানি দ্বারা তো আর জীবন চলে না।

লীজার কণ্ঠ গম্ভীর। বলল, দিশেহারা হয়ো না। ভয়ও পেয়ো না। শীঘ্রই অবরোধ উঠে যাবে। যদি তা না হয় তাহলে আমাদের যোদ্ধারা বাইরে বেরিয়ে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে।

পরিচারিকাটি বিনীত কণ্ঠে বলল, রাণী মাতাজী! আপনাকে তো গীর্জায় কখনো দেখলাম না। গীর্জায় প্রত্যহ আমাদের বিজয় আর মুসলমানদের পরাজয়ের জন্য দু'আ করা হয়। পাদ্রীরা বলেন, পাপ থেকে তওবা কর। আমাদের পাপের কারণেই এ বিরাট আযাব আমাদের উপর আপতিত হয়েছে। রাণী মাতাজী! আমরা গরীব মানুষ। আমরা আবার কি পাপ করলাম!

পারিচারিকার কথা পূর্ণ না হতেই লীজা হেসে ফেলল। পরিচারিকা কথা বন্ধ করে বিস্ময় বিমোহিত দৃষ্টিতে লীজার চেহারার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর পরিচারিকা বলল, শহরের লোকেরা বলছে, কেল্লার বাইরে গিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা হবে। কিন্তু কিছু লোক বলছে, আক্রমণ না করে মুসলমানদের সাথে চুক্তি-পরামর্শ করে নগর প্রাচীর খুলে দেয়া উচিত। তারা বলছে, মুসলমানরা অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণ জাতি। বিজিত শহরের লোকদের সাথে তারা অত্যন্ত ভাল আচরণ করে। কখনো কারোর উপর যুলুম অত্যাচার করে না।

লীজার হাসি যেন এবার নতুন প্রাণ পেল। কিন্তু পরিচারিকার কথায় সে কোন ভ্রুক্ষেপই করল না। নির্বিকার থেকেই তার কথাগুলো শুনল। আজকে লীজা একটু দ্রুত নাস্তা সেরে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

শহরের ভিতরে থেকেও অবরোধের হট্টগোল শোনা যায়। যে সব লোক শহর রক্ষার জন্য নগর প্রাচীরে দাঁড়িয়ে আছে তারা বার বার আনন্দ ধ্বনি দিচ্ছে আর মুসলমানদের ব্যঙ্গ করে আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তাদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় তারা এখনো অত্যন্ত দৃঢ় মনোবল, অসম্ভব উৎসাহী ও বিজয়ে আশাবাদী। লীজা ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট কোন জায়গায় পৌঁছার লক্ষ্যে সে যাচ্ছে না। নয়ন তাকে যেদিকে পথ দেখাচ্ছে সেদিকেই সে এগিয়ে যাচ্ছে। শহরের মেয়েরা তাকে চিনে যে, সে তাদের সিপাহসালারের স্ত্রী। কিছুদূর অগ্রসর হলে, বেশ কিছু মহিলা তাকে ঘিরে ধরল। তাদের চেহারায় ভয় ও আতঙ্কের সুস্পষ্ট ছাপ। তারা জিজ্ঞেস করল, আর কতোদিন এ অবরোধ চলবে? দীর্ঘদিন কি এ অবরোধ চলতে থাকবে?

লীজা এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে যেন সজাগ হয়ে উঠল। মহিলাদের সাহস দিল। উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলল। অভয় দিয়ে বলল, অবরোধ বেশী দীর্ঘ হতে দেয়া হবে না। অতি শীঘ্রই কেল্লার বাইরে গিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা হবে। সুতরাং আমরা নারী হলে কি হবে, আমাদেরও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমাদেরও অস্ত্র হাতে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

লীজার উৎসাহব্যঞ্জক কথায় মহিলারা বেশ মুগ্ধ হল। তাদের চোখ-মুখের আতঙ্ক ভাব দূর হয়ে গেল। কেউ কেউ বলল, আমরা পুরুষদের মত বীর বীক্রমে যুদ্ধ করব। কিছুতেই মুসলমানদের জয়ী হতে দেব না।

লীজার মনের দুর্ভাবনা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। আরো সামনে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ চলার পর নগর প্রাচীরে গিয়ে পৌঁছল। প্রাচীরটি এতো প্রশস্থ যে একসাথে পাশাপাশি চারজন ব্যক্তি অনায়াসে চলতে পারে। কিন্তু তখন প্রাচীরের উপর দিয়ে চলা মুশকিল। কারণ শহরের প্রায় সকল লোক এসে প্রাচীরে উপস্থিত হয়েছে। এদিক সেদিক যাতায়াত করছে। এ ভীড়ের মাঝে পথ করে করে লীজা এগিয়ে চলছে। তাকে যারা চিনে তারা তাকে দেখেই কুর্নিশ করে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। লীজা যখন ভীড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক তখন কাঁধের উপর যেন কার হস্তস্পর্শ অনুভব করল।

লীজার চলার গতি থেমে গেল। পশ্চাতে দৃষ্টি ফেলে দেখে, রূতাস দাঁড়িয়ে আছে। লীজার চেহারা আলোকময় হয়ে উঠল। রূতাসকে জিজ্ঞেস করল, যুদ্ধের পরিস্থিতি এখন কেমন? অবরোধ ভেঙ্গে ফেলা কি সম্ভব? না এখনো আমরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছি?

রূতাসের কণ্ঠ একেবারে শুষ্ক। বলল, আমরা তো মুসলমানদের অবরোধ প্রতিহত করে যাচ্ছি। তবে কোন ভয় নেই, কোন আতঙ্ক নেই সে কথা বলা আত্মপ্রবঞ্চনা মনে করছি।

মুসলমানদের সিপাহসালার হল খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)। আপনার হয়তো জানা নাও থাকতে পারে যে, আমি রোমান সম্রাটের গোয়েন্দা বিভাগের একজন উঁচু শ্রেণীর অফিসার ছিলাম। আমি ছদ্মবেশে মুসলমানদের তাঁবুতে গিয়েছিলাম। অতি নিকট থেকে খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-কে দেখেছিলাম। এ সিপাহ-সালারের কারণেই শাম থেকে আমাদের পালিয়ে যেতে হয়েছে। সে আমাদের প্রত্যাক্রমণেরও সুযোগ দেয়নি।

লীজা বলল, এ নাম তো আমিও শুনেছি। একদিন সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে বলতে শুনেছি, যদি খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-কে হত্যার কোন ব্যবস্থা করা যায় তাহলে আমি মুসলমানদের শুধুমাত্র শাম থেকেই তাড়িয়ে দেব না, বরং আরব থেকেও তাড়িয়ে সমুদ্রে নিয়ে ডুবিয়ে মারব। কিন্তু আমাদের ঘাতকরা তো তার টিকিটিও ছুঁতে পারছে না।

রূতাস বলল, আপনি হয়তো জানেন না; দুই বার খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-কে হত্যার জন্য চারজন করে গুপ্তচর পাঠানো হয়েছিল। তাদের গায়ে ছিল মুসলমানদের পোষাক। আরবদের মত তারা অনর্গল আরবীতে কথা বলতে পারত। আমার বিশ্বাস ছিল যে, মুসলিম বাহিনীর কেউ তাদের ধরতে পারবে না। তাদের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহও করতে পারবে না। কিন্তু তারা সবাই সেখানে পৌঁছে নিহত হয়েছে। আমরা এখন যে অবরোধের মুখোমুখী আছি, এই অবরোধকারীদের সালারও স্বয়ং খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)। কেল্লার প্রাচীর ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া ও কেল্লার পতনের ক্ষেত্রে সে দারুণ অভিজ্ঞ। হঠাৎ রূতাসের দৃষ্টি কেল্লার বাইরে পড়তেই সে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, ঐ তো, ঐ যে খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)কে দেখা যাচ্ছে। এদিকে আসুন। এদিকে আসুন। আমি আপনাকে খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-কে দেখিয়ে দিচ্ছি।

রূতাস লীজাকে নগর প্রাচীরের এক উঁচু স্থানে নিয়ে গেল। লীজা স্পষ্টভাবে দেখতে পেল, দু'টি অশ্বারোহী আগে আগে এগিয়ে যাচ্ছে আর তাদের পিছনে আরো আট-দশজন অশ্বারোহী। রূতাস বলল, অগ্রগামী দুই অশ্বারোহীর ডান পার্শ্বের ব্যক্তিটি খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) আর বাম পার্শ্বের জনের নাম ইয়ায। তার পূর্ণ নাম আমি জানি না। সেও একজন সালার।

রূতাস বলল, এতো দূর থেকে খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) এর চেহারা স্পষ্টভাবে দেখতে পারবে না। নিকট থেকে দেখলে শত্রু হলেও মনে হবে, আল্লাহ্ তার চেহারায় এক অভাবনীয় প্রভাব লেপ্টে দিয়েছেন। যে কেউ তাকে দেখলে

প্রভাবিত না হয়ে পারবে না। তার হৃদয়ের দীপ্তি আর উজ্জ্বল্য তার চেহারা দিয়ে ঠিকরে বেরুতে থাকে। তিনি এমন এক সালার যার জীবন কোষের পাতায় পরাজয় শব্দটি নেই।

লীজার কণ্ঠে ভীতির আভাস। বলল, আচ্ছা, তাহলে কি আলেপ্পাও তারা পদানত করে নিবে!

রূতাস বলল, আমি আপনার মনোবল ভাঙ্গব না। আমরা জীবন দিয়ে যুদ্ধ করব। প্রয়োজনে আলেপ্পা রক্ষার জন্য আলেপ্পার মানুষ জীবন দিবে। দুর্গের ফটক খুলে আমরা সম্মুখ যুদ্ধে জীবন বাজি রেখে লড়াই করব। রূতাস কি হতে পারে, কি হওয়া সম্ভব সবই একে একে লীজার নিকট বলতে লাগল। লীজা তার ডাগর চোখ জোড়া বাইরের দিক থেকে ফিরিয়ে এনে রূতাসের চেহারায় নিবদ্ধ করল। গভীর ও গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকে দেখল। বারবার আপাদমস্তক তাকে দেখল। তার অধর কোণে মধুর এক চিলতে হাসির রেখা ফুটে উঠল। অত্যন্ত বিমুগ্ধ, অত্যন্ত হৃদয় কাড়া সে দৃশ্য।

তারপর আর লীজা বেশী চিন্তা করতে পারেনি। রূতাসের বাহু ধরে তাকে নগর প্রাচীরের উঁচু স্থান থেকে নিয়ে এল। রূতাস সুবোধ বাধ্যগত পুরুষের ন্যায় তার সাথে চলতে লাগল।

* * *

আন্তোনীস, ইউকেলিসের মত রূতাসও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সময় কাটাচ্ছে। সেও একজন সালার। বয়স পঁয়ত্রিশ ও চল্লিশের মধ্যে। দেখতে সুশ্রী, চিত্তাকর্ষী। লীজা থেকে তিন চার বৎসরের ছোট। শাহী পরিবারের সন্তান। সাম্রাজ্যের উঁচু পদে কর্মরত ছিল। বয়সে লীজার চেয়ে ছোট হলেও দেখতে লীজার চেয়ে বড় মনে হয়। শাহী খান্দানের সন্তান বলে লীজা রূতাসকে সম্মান করে। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের স্ত্রী হওয়ার কারণেও সেও তাকে সম্মান করে।

রূতাস বাইরের দিকে তাকিয়ে লীজাকে বলল, ঐ তো দেখুন, একদল অশ্বারোহী যোদ্ধা চলে যাচ্ছে। হতে পারে একদলের পরিবর্তে আরেক দল আসছে। কিন্তু ... কিন্তু আমার মনে হচ্ছে মুসলমানরা ধীরে ধীরে অবরোধ তুলে নিবে।

প্রায় এক হাজার অশ্বারোহী মুজাহিদ খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-এর নির্দেশে অবরোধ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। রূতাস ও লীজা অপলক নয়নে দেখছে, অশ্বারোহী দলটি ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। যেতে যেতে তারা দূরের এক পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল। লীজা রূতাসের দিকে ফিরে তাকাল। দেখল, রূতাসের চেহারায় এক বিমল আনন্দ খেলা করছে। তাকে আগের চেয়ে আরো

সুশ্রী মোহময় মনে হচ্ছে। রূতাস ও লীজার মাঝে কোন লৌকিকতা ছিল না। অবরোধ শুরু হওয়ার পর প্রায়ই সে লীজার ঘরে যেত। তবে যখন ঘরে আন্তোনীস থাকে তখন সে কথাবার্তা ও আচার-আচরণে এ কথা বুঝায় যে, সে লীজার নিকট আসে নি। আন্তোনীসের নিকট এসেছে। তারই সাক্ষাৎ প্রার্থী।

লীজার কণ্ঠে বন্ধুসুলভ আবেদন ফুটে উঠল। বলল, রূতাস! একাকী থাকতে থাকতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। শহরের সাধারণ নারীদের সাথে তো আমি খোলামেলা মিশতে পরি না। আর তুমি তো জান আমি কেমন পরিবেশ থেকে এসেছি। আন্তোনীস দিন-রাত বাইরে থাকে। যখন ফিরে আসে তখন ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ফিরে আর বিছানায় পড়ে নাক ডেকে ঘুমায়। আমি আজ একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে কেল্লার পাঁচিলের নিকট চলে এসেছি। তোমাকে পেয়ে আমার কতো ভাল লাগছে! রূতাস তোমার সাথে যদি আমি তোমার ঘরে যাই তাহলে কি তুমি তা খারাপ মনে করবে?

রূতাস বলল, না, না, অমন কথা বলবেন না। আমি তো এখন আমার ঘরেই যাচ্ছিলাম। সারারাত ঘুমাইনি। এখন যাচ্ছি চলুন। রূতাস লীজাকে নিয়ে তার ঘরে গেল।

রূতাস লীজাকে সসম্মানে বসাল এবং নিজে একটু দূরে বসতে চাইল। কিন্তু লীজা বাহু ধরে তাকে তার পাশে বসাল। এবং একটি হাত তার কোমড়ের উপর রাখল। রূতাস ফিক করে একটু হেসে তার থেকে দূরে সরে যেতে চাইল। কিন্তু লীজা তাকে হাত দিয়ে শক্ত করে ধরল। তারপর তার সাথে এমন এক অবাধ আচরণ করল যা সে আন্তোনীসের সাথে করে যাচ্ছিল। রূতাস ধারণা করতে পারেনি যে, সে তার সাথে এমন অবাধভাবে মিশবে। তারপর লীজা কামাতুর কণ্ঠে দু'চারটি আবেগময় কথাও বলল। রূতাস তো আর অল্প বয়সের বালক নয়। সে সব কিছু বুঝে ফেলল। সে লীজার চেহারায় দৃষ্টি ফেলে তার নিরব আহবানে সুখ অনুভব করল।

রূতাসের কণ্ঠ একটু বেরসিক হয়ে উঠল। বলল, আমার অন্তরে আপনার সম্মান বিদ্যমান। আপনি শাহী খান্দান থেকে পালিয়ে এসেছেন। আমিও তো সেই খান্দানেরই লোক। আমি আপনার ইহতেরাম করি। সম্মান করি। যদি এ দিকটি বাদও দেই যে আপনি শাহী খান্দানের ইজ্জত। তবে একথা তো আমি ভুলতে পারি না যে, আপনি আমার সালার আন্তোনীসের বান্ধবী।

লীজার কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস। এ সময় তুমিই আমার বন্ধু। তুমিই আমার সঙ্গী। আমার থেকে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করবে না। এখন আমি সম্রাট হিরাক্লিয়াসের স্ত্রী নই আর আন্তোনীসের বন্ধুও নই। এখন আমি শুধুমাত্র লীজা। আমাকে সম্মানসূচক কিছু না বলে, প্রেমের আবেশে লীজা বলে ডাক।

রূতাসের কণ্ঠ তবু নিরস শোনা গেল। বলল, লীজা! এ কথাও চিন্তা কর, পাদ্রী প্রত্যেক দিন বিজয়ের দু'আ করছেন আর বার বার বলছেন, আমাদের উপর এক মহা বিপদ সমাগত। এ বিপদ থেকে মুক্তির একই উপায় তাহলো, বিগত দিনের পাপ থেকে তওবা করা। সর্বপ্রকার পাপ পরিত্যাগ করা।

লীজা বলল, আমি আপাদমস্তক পাপ। ইরানের শাহী খান্দান থেকে এক জঘন্যতম পাপের প্রতিজ্ঞা করে হিরাক্লিয়াসের হেরেমে এলাম। কিন্তু সে পাপ সংকল্পে সফল হতে পারলাম না। তারপর যখন সম্রাট হিরাক্লিয়াস আমাকে বিয়ে করে অল্প কিছুদিন পরই হেরেমে নিক্ষেপ করল, তখন আমি আরেকটি পাপ করলাম।

লীজা আবেগে অধীর হয়ে একের পর এক বলে গেল, কিভাবে সে আন্তোনীসকে তার জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য কাছে টেনে নিয়েছে। কিভাবে তার সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। একথাও বললো, ইউকেলিস সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পুত্র নয়। আন্তোনীসের ঔরসজাত।

লীজা বলল, তুমি হয়তো ভুল বুঝে আছো। তুমি মনে করেছো, আমি আন্তোনীসের এই চেষ্টায় একমত যে, আমরা শামে ঈসা মসীহ-এর সাম্রাজ্য কায়েম করব। আন্তোনীসও তাই মনে করে। কিন্তু রূতাস! আমি তোমাকে সত্য কথা বলছি, আমার একমাত্র সন্তান ইউকেলিসকে সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও তার পুত্র কুস্তুনতীনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমি আন্তোনীসের হাতে ধরা দিয়েছি।

বলতে বলতে লীজা রূতাসকে এ কথাও বলে দিল যে, হিরাক্লিয়াস ও কুসতুনতীন ইউকেলিসকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আন্তোনীস যথাসময়ে তা দেখে ফেলে তাদের প্রেরিত ঘাতকদের হত্যা করে উইকেলিসকে রক্ষা করেছে। আর আন্তোনীসও পালিয়ে এসেছে। কারণ এরপর হিরাক্লিয়াস তাকে পেলে আস্তো রাখত! নির্ঘাত হত্যা করত।

রূতাসের শান্ত কণ্ঠ। বলল, আমি এ সব কিছু শুনে বিস্মিত বা হতবাক নই। এ সব কাণ্ড শাহী খান্দানে ঘটা স্বাভাবিক। একজনের স্ত্রী অন্যজনের দাসী হয়। সম্রাটের ছেলে সম্রাটের অন্য স্ত্রী বা দাসীদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলে। তাই আমি বলব যে, রাজা-বাদশাহ আর সম্রাটদের পরাজয়ের কারণও ঐ একটিই। আমরা কি কখনো ভেবেছিলাম যে, ইরান আর রোমের মত অপরাজেয় শক্তি কখনো আরবের সাধারণ বুদ্ধুদের হাতে পরাজিত হবে। আর এমন পরাজয় যে, রোম সম্রাট আশ্রয়ের সন্ধানে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মুসলমানরা আমাদের দুশমন হতে পারে, কিন্তু রোমান গুপ্তচর হওয়ার সুবাদে বিভিন্ন শ্রেণীর

মুসলমানের সাথে মেশার সুযোগ পেয়েছি, মুসলমানদের বস্তিতে থেকেছি, তাদের তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে ফিরেছি। তাদের মাঝে ভোগ বিলাসের কোন নাম গন্ধও নেই। তাদের সকল কাজ পাহাড়ী ঝরণার মত স্বচ্ছ। যার উপর থেকে গভীরের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়। এটাই তাদের শক্তির মূল। যার কারণে কোন শক্তিই তাদের মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারছে না। লীজা! আমি এখনো বলছি, আমার কথা শুন, পাপ থেকে দূরে থাক। আন্তোনীসকে নিয়ে গির্জায় যাও এবং তাকে বিয়ে করে নাও।

লীজার কণ্ঠে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল। বলল, রূতাস! তুমি আমার কথা কেন বুঝছো না। আন্তোনীসের সাথে আমার সেই ভালবাসা অবশিষ্ট নেই যা তুমি ধারণা করছো। সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু সে আমার সাথে যে আচরণ করেছে তাতে আমি বুঝে ফেলেছিলাম সে ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র নয়। আমি তখন সালার আন্তোনীসের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাকে ধোকা দিয়েছিলাম। আমি একজন মানুষ। তদুপরি একজন যুবতী। আমার এই নিটোল দেহের দিকে চেয়ে দেখ। তার ক্ষুধা আছে। তীব্র চাহিদা আছে। কিন্তু.......... ।

রূতাস তার কণ্ঠে একটু কোমলতা এনে বলল, তারপরেও লীজা! আন্তোনীসের এই প্রতিজ্ঞা ও প্রচেষ্টাকে আমাদের সম্মান করা উচিৎ। ঈসা মসীহ (আ.)-এর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সে কত মেহনত করছে। আমাদের কর্তব্য তাকে সার্বিক সহায়তা করা।

লীজা মৃদু হেসে শ্লেষভরা কণ্ঠে বলল, রূতাস! তুমি এক নির্বোধ। গুপ্তচর বাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসারের আরো সতর্ক হওয়ার দরকার। চিন্তা কর, গভীরে পৌছ। পশ্চাৎপসরণ আর পরাজয়ের যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে তার আলোকে ভেবে দেখ। আন্তোনীসতো এমন সুখ স্বপ্নে বিভোর যার কোন ব্যাখ্যা নেই। এ অল্প মুসলিম মুজাহিদই তো লাখ লাখ ইরানী ও রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাভূত করেছে। নিষ্পেষিত করেছে। আন্তোনীস এ অশিক্ষিত অচেতন অদূরদর্শী কবিলার লোকদের নিয়ে কিভাবে সেই অজেয় মুসলিম শক্তিকে পরাজিত করবে! তুমি নিশ্চয় বুঝ এটা অবরোধ। আমরা মজবুত কেল্লায় আবদ্ধ হয়ে নিরাপদে আছি। তাই মুসলমানদের সময় লাগছে। যদি খোলা প্রান্তরে হত, তাহলে দেখতে, সূর্যাস্তের আগেই মুসলমানরা এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করত।

রূতাস হালকা ব্যঙ্গ করে বলল, লীজা! তুমি এতো নিরাশ। মনে হয় তুমি আন্তোনীস ও ইউকেলিসের সাথেও এমন ধরনের কথা বল।

লীজা বলল,না, তাদের সাথে এ ব্যাপারে আমি কোন কথাই বলি না। তাদের বিশ্বাস যে, মুসলমানরা অবরোধ তুলে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাবে।

তারপরই লীজা রূতাসকে আরো কাছে টেনে এনে কামনায় ভেঙে পড়া কণ্ঠে নীচু স্বরে বলল, রূতাস! তুমি এসব কথা ছাড়। আমি কি চাচ্ছি বুঝ...?

রূতাস যুবক। যৌবনের জোয়ারে তার শরীর প্লাবিত। তাছাড়া সে কোন দুনিয়া বিরাগী পাদ্রী বা সন্নাসীও নয়। তার শরীরের ঘুমন্ত পৌরুষ জাগ্রত হয়ে উঠল। রূতাস বেকারার অস্থির হয়ে উঠল। সহজেই লীজার পাতানো জালে আটকে গেল। যেমন মাকড়সার জালে মাছি আটকে যায়।

রূতাসের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা ও ভয়। বলল, লীজা! ক্ষণিকের জন্যও কি ভেবে দেখেছো, যদি আন্তোনীস আমাদের এই বন্ধুত্বের কথা জানতে পারে, তাহলে কি হবে?

লীজা একটু শ্লেষভরা কণ্ঠে বলল, তাহলে আর কি হবে। আন্তোনীস হয়তো তোমাকে হত্যা করবে।..... কিন্তু আমরা তাকে সে বিষয় জানতে দিব কেন?

তারপর একে অপরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। লীজা ধীর পায়ে চলে এল।

* * *

অবরোধ তীব্র আকার ধারণ করল। মুজাহিদরা শহরে তীর নিক্ষেপ শুরু করল। কিন্তু একটি সমস্যা দেখা দিল। তা হল কেল্লার পাঁচিল এতো উঁচু যে, তার উপর দিয়ে গিয়ে অগ্নিতীর লক্ষ্যে পৌঁছছে না। খুঁজে একটি উঁচু জায়গা পাওয়া গেলো। মুজাহিদরা সেখানে অবস্থান নিয়ে অগ্নি তীর নিক্ষেপ শুরু করল। কেউ কেউ উঁচু গাছের মগডালে উঠে সেখান থেকে অগ্নি তীর নিক্ষেপ করছে। কিন্তু কেল্লার ভিতরের মানুষের ঘরবাড়ি কেল্লার পাঁচিল থেকে দূরে। তাই অগ্নিতীর তেমন ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

যারা গাছের মগডালে চড়ে অগ্নিতীর নিক্ষেপ করছে, তাদের একজন হঠাৎ দেখতে পেল, কেল্লার ভিতরে একদিকে সারি সারি তাঁবু দেখা যাচ্ছে। অবশ্য সে দিকে পাঁচিলের নিকেট কোন উঁচু স্থান নেই। কোন গাছও নেই। তবে সেদিকের তাঁবুগুলো একেবারে কেল্লার পাঁচিল পর্যন্ত বিস্তৃত। বিভিন্ন কবিলা থেকে আগত খ্রিস্টান যোদ্ধারা এখানে তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান নিয়েছে। অবশ্য এর ব্যবস্থাপনায় ছিল এ শহরের প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত বন্দী মুসলমানরা। তারাই তাদের থাকার জন্য এ উন্মুক্ত প্রান্তরে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

সে সাথে সাথে দৌড়ে গিয়ে এ সংবাদ সালারদের নিকট পৌঁছে দিল। বলল, যদি সেদিক থেকে অগ্নিতীর নিক্ষেপ করা হয় তাহলে তা পাঁচিলের উপর দিয়ে গিয়ে তাঁবুর উপরে পড়বে।

খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) ও ইয়ায ইবনে গানাম (রা.) সংবাদ পেয়ে সেই গাছের নিকট গেলেন এবং তার মগডালে চড়ে স্বচক্ষে সবকিছু পর্যবেক্ষণ

করলেন। গাছ থেকে নেমে এসে খালিদ (রা.) বললেন, ইবনে গানাম! আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যদি আমরা শহরে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারি, শহরবাসীদের অন্তরে ভয় সঞ্চারিত করতে পারি, তাহলে মনে করবে, আমরা অর্ধেক বিজয় লাভ করে ফেলেছি।

ইয়ায ইবনে গানামের মনে আত্মবিশ্বাস পরিস্ফুট। বললেন, "সিপাহ্ সালার! আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহে আমরাই বিজয় লাভ করব। ইনশাআল্লাহ্। কেউ তা রোধ করতে পারবে না। শহরে কোন সৈন্য নেই। শহরবাসীদের মাঝে চরম অস্থিরতা বিরাজমান। আমার মাথায় একটি বুদ্ধি এসেছে, আমরা তাদেরকে প্রবঞ্চনায় ফেলব যে, আমরা অবরোধ তুলে নিচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ করেই তা করা যাবে না। প্রথমে অশ্বারোহী বাহিনীর দু'চারটি দলকে সরিয়ে নেয়া হোক। তারপর আমাদের তৎপরতা বন্ধ করে দেয়া হোক। এতে শহরের লোকেরা বুঝবে, আমরা অবরোধে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি।"

খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) তখন ঘোড়ায় সাওয়ার ছিলেন। অন্য ঘোড়ায় ছিলেন ইয়ায ইবনে গানাম (রা.)। উভয়ের ঘোড়া ধীর পদবিক্ষেপে চলছে। পাশাপাশি চলছে। খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) ইয়ায ইবনে গানাম (রা.)-এর কথা শুনে ঘোড়ার বাক টেনে ধরলেন। ইয়ায ইবনে গানাম (রা.)-এর পিঠ চাপড়ে বললেন, "ইবনে গানাম! তুমি আমাকে বিজয়ের এক আলোক রশ্মি দেখালে। এসো, নিবিড়ে কোথাও বসি এবং কিভাবে তাদের প্রবঞ্চনা দেয়া যায় তা চিন্তা করি।"

খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) গাছ ও উঁচু স্থানের তীরন্দাজদের ডেকে একত্রিত করলেন। তারপর তাদের নিয়ে শহরের ঐ প্রান্তে গেলেন যেখানে সারি সারি তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। তারপর তাদের কেল্লার পাঁচিলের থেকে বেশ দূরে দাঁড় করালেন। এখানে পাঁচিল থেকে নিক্ষিপ্ত তীর এসে পৌঁছে না। তারপর অগ্নিতীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। দেখলেন, তীরগুলো পাঁচিল অতিক্রম করে যায় না। তারপর তিনি কি যেন চিন্তা করলেন এবং একজন দুঃসাহসী অশ্বারোহী তীরন্দাজকে ডেকে কি যেন বললেন। অশ্বারোহী সাথে সাথে তৈরী হয়ে গেল। চোখের পলকে অশ্ব ছুটিয়ে পাঁচিলের নিকট পৌঁছেই ধাবমান অশ্বের উপর থেকে অগ্নিতীর নিক্ষেপ করতে করতে নিরাপদে চলে এল। কেল্লার উপর থেকে তার উপর অসংখ্য তীর বর্ষিত হলেও সে নিরাপদেই ফিরে এসেছে।

এভাবে কিছুক্ষণ পর পরই অশ্বারোহী তীরন্দাজ বাহিনী ছুটে গিয়ে কেল্লার ভিতর অগ্নিতীর বর্ষণ করতে লাগল। ইতিমধ্যে কয়েকজন পাঁচিল থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে জখম হয়েছে। কেউ পাঁচিলের নিকটবর্তী হলেই তার উপর প্রবল

তীর বর্ষণ শুরু হয়। ইয়ায ইবনে গানাম (রা.) অশ্বারোহীদের অগ্নিতীর বর্ষণ করতে নিষেধ করলেন। ভাবলেন, এভাবে জীবনের ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।

ইতিমধ্যে পাঁচিলের উপর থেকে রব উঠল, "আগুন, আগুন"। সাথে সাথে কেল্লার ভিতর থেকে ধোঁয়া কুণ্ডুলী পাকিয়ে পাকিয়ে উপরে উঠতে লাগল। সাথে সাথে তাঁবুর লোকদের ডাক-চিৎকার আহাজারী চারিদিক কাঁপিয়ে তুললো।

সারি সারি তাঁবু। সবগুলো তাঁবু পাশাপাশি। তাই এক তাঁবুর আগুনে প্রথমে চার তাঁবু জ্বলে উঠল। চোখের পলকে চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। তাঁবুর ভিতর থেকে যারা প্রাণপণে দৌড়ে বেরিয়ে গেছে তাদের অনেকেরই কাপড় পুড়ে গেছে। গা পুড়ে গেছে। অনেকে বেরিয়ে আসতে না পেরে জ্বলে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। কেল্লার পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে যে সব খ্রীস্টানরা তীর নিক্ষেপ করছিল তারা ভয়ে আতঙ্কে সেখান থেকে ছুটে আগুন নিভাতে চলে গেল। পাঁচিলের বিরাট অংশ খালি হয়ে গেল।

মুজাহিদরা এই সুযোগে রশি নিয়ে এসে আংটাসহ পাঁচিলে নিক্ষেপ করল। আংটা লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে আটকে গেল। সাথে সাথে মুজাহিদরা রশি বেয়ে পাঁচিলের উপরে উঠতে লাগল। কিন্তু ডান ও বাম দিক থেকে তাদের উপর বৃষ্টির ন্যায় তীর বর্ষিত হতে লাগল। পশ্চাতে অবস্থানরত অনেক মুজাহিদ দৌড়ে সামনে এগিয়ে এল। তারা পাঁচিলে অবস্থানরত খ্রীস্টান সৈন্যদের উপর তীর নিক্ষেপ শুরু করল। কয়েকজন খ্রীস্টান সৈন্য মুজাহিদদের তীরের আঘাতে আক্রান্ত হয়ে পাঁচিলের উপর থেকে লুটিয়ে নীচে পড়ে গেল। তারা সফল হল না। যে সব মুজাহিদ রশি বেয়ে উপরে উঠছিল তারা তীরের আঘাতে জর্জরিত হল। তারা বাধ্য হয়ে নীচে নেমে এল। এ অবস্থা দেখে বেশ কিছু মুজাহিদ শাহাদাতের তামান্নায় অধীর হয়ে রশির দিকে দৌড়ে যেতে চাইল। কিন্তু সালাররা তাদের পথ আগলে ধরল। অপর দিকে পাঁচিলের যে স্থানে রশি-আংটা লেগেছিল, খ্রীস্টান সৈন্যরা তা খুলে ফেলে এবং রশি নীচে পড়ে যায়।

শহরের ভিতরের ডাক-চিৎকার আর আর্তনাদে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, সেখানে কী কিয়ামত ঘটছে। খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) যে ভয় ও আতঙ্ক শহরের লোকদের মাঝে সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন তা বাস্তবায়িত হল। তিনি তীরন্দাজ বাহিনীকে এবং যারা পাঁচিলে উঠার সুযোগ খুঁজছে তাদের পিছু হটিয়ে নিয়ে এলেন।

রাতে মুজাহিদ বাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল কেল্লার ফটকের নিকটবর্তী হয়ে কুঠার দিয়ে ফটক ভাঙ্গার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রহরীদের তীর বর্ষণের কারণে তারা ফিরে আসতে বাধ্য হল। প্রহরীরা তাদের উপর জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে মারল। ফলে কয়েকজনের কাপড়ে আগুন লেগে গেল এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গা পুড়ে গেল।

* * *

খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) একদিন এক হাজার অশ্বারোহী মুজাহিদের এক বাহিনীকে অবরোধ তুলে পশ্চাতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা এমনভাবে চলে গেল যেন আর ফিরে আসবে না। এরা ঐ এক হাজার অশ্বারোহী মুজাহিদ যাদেরকে রূতাস কেল্লার পাঁচিল থেকে দেখে বিমুগ্ধ হয়ে লীজাকে বলেছিল, হয়তো মুসলমানরা নিরাশ হয়ে অবরোধ তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে।

খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) আরেকটি কৌশল অবলম্বন করলেন। তা হল, মুজাহিদদের সকল কর্মতৎপরতা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। অথচ মুজাহিদরা এমন শৌর্যবীর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছে যে, কয়েজকন মুজাহিদ তীব্র তীর বর্ষণের মাঝেও কুঠার নিয়ে কেল্লার ফটকের দিকে ছুটে গেছে এবং ফটক ভাঙার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু কেল্লার পাঁচিলের উপর থেকে ক্রমাগত নিক্ষেপিত তীর ও বর্শার আঘাতে তাঁরা অবিচল থাকতে পারেনি। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ফিরে এসেছে। এমন কি এক দুঃসাহসী মুজাহিদ শহীদও হয়েছেন।

খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-এর নির্দেশে অবরোধের অপর পার্শ্ব থেকে আরো এক হাজার অশ্বারোহী মুজাহিদ পশ্চাতে চলে গেলেন। তারাও এমনভাবে পশ্চাতে চলে গেল যেন আর ফিরে আসবে না। তারা একটি পাহাড়ের পশ্চাতে অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিকে খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) ও ইয়ায ইবনে গানাম (রা.) শহরের চতুষ্পার্শ্বে টহল দিতে থাকলেন আর অন্যান্য মুজাহিদরা তাঁবুতে গা ঢাকা দিয়ে আছে। অনেকে গাছ বা ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে।

কেল্লার ভিতর আন্তোনীসের যেন আনন্দের শেষ নেই। বিজয় আনন্দে তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত, কিন্তু তারপরও তার বিশ্রাম নেই। কখনো সে কবীলার সর্দারদের একত্রিত করে উপদেশ বাণী বিতরণ করছে। কখনো কেল্লার পাঁচিলে গিয়ে টহলরত লোকদের উৎসাহিত উদ্বেলিত করছে। কখনো নীচে নেমে এসে সমবেত লোকদের বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছে। আর বলছে, এখনো আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়নি। এই মুসলমানদের শুধু তাড়িয়ে দিলেই হবে না। তাদের মৃত-লাশে পরিণত করতে হবে। আর যারা প্রাণে বেঁচে যাবে তাদের পশুর মত কেল্লায় এনে বন্দী করে রাখতে হবে।

আন্তোনীস যেন পাগল হয়ে গেছে। ভ্রান্ত বিজয়ের নেশায় সে দুনিয়ার সব লোভনীয় বস্তুর কথাও ভুলে গেছে। লীজাও যেন তার অন্তর থেকে হারিয়ে গেছে। লীজাও তার থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। আগের মত আর তাকে জিজ্ঞেস করে না, কেন সে সময়মত ঘরে আসে না! তার খাওয়া দাওয়ার প্রতি যত্ন নেয়া না। ঘরে এলে মনে হয় অন্তর তার বাইরে বাইরে ঘুরছে। আন্তোনীসের স্থানে এখন রূতাস লীজার নিকট যায় আবার লীজাও সময় সুযোগে রূতাসের নিকট গমন করে।

ইউকেলিসের অবস্থা এমন যে যুদ্ধের নেশায় সে তার মায়ের কথাও ভুলে গেছে। এখন খাবার দাবারেরও তার কোন নিয়মানুবর্তিতা নেই।

যেদিন মুসলমানদের নিক্ষিপ্ত অগ্নি-তীরের কারণে কেল্লার মাঝে অবস্থিত বিভিন্ন কবিলা থেকে আগত লোকদের তাঁবুতে আগুন লেগে গিয়েছিল, তাঁবুর লোকদের ডাক-চিৎকারে সবাই অস্থির হয়ে পড়েছিল, সারি সারি তাঁবুতে আগুন লেগে প্রলয় কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল, নারী পুরুষ আর শিশুরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হচ্ছিল, অনেকেই জ্বলে পুড়ে মরেছিল, বহু চেষ্টার পর অল্প কিছু তাঁবু আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছিল, সেদিন মানুষের মাঝে চরম হতাশা ও অতিষ্ঠতা দেখা গেছে। অনেকেই বলেছে, আর নয়। মুসলমানদের হাতেই শহর তুলে দাও। এভাবে জ্বলে পুড়ে মরার কোন অর্থ নেই। আজ তাঁবুতে আগুন লেগেছে। কাল বাড়িতে বাড়িতে আগুন লাগবে। জ্বলে পুড়ে সব শেষ হয়ে গেলে জীবনের আর অর্থ রইল কোথায়?

সেদিন আন্তোনীস, ইউকেলিস ও রূতাস সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আগুন নিভাচ্ছিল। তখন আন্তোনীস আর নিজেকে ধারণ করতে পারেনি। সমবেত মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল, ভাইয়েরা আমার! স্বজাতির জন্য, আযাদির জন্য এমন একটু আধটু কুরবানী দিতেই হবে। এই মুসলমানদের কথাই ভেবে দেখ। তারা কতদূর থেকে ছুটে এসেছে। একের পর এক যুদ্ধ করছে। এতো ক্ষতির মুখোমুখি হয়েও তারা এখনো আমাদের অবরোধ করে আছে।

আন্তোনীস একটু বিরতি দিয়েই আবার বলতে লাগল, আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, মুসলমানরা অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। তারা তাদের কতিপয় সৈন্যকে ইতিমধ্যে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি এখন নিশ্চিত যে, শীঘ্রই মুসলমানরা অবরোধ তুলে পালিয়ে যাবে। সুতরাং এমন কথা কিছুতেই বলবে না যে, শহর মুসলমানদের হাতে তুলে দাও।

আন্তোনীস শহরবাসীদের অত্যন্ত উৎসাহিত ও উদ্বেলিত করল। তার ইঙ্গিতে ইউকেলিস একটি ঘোড়ায় আরোহন করল। সবাই তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ইউকেলিস অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে বলল, হে ক্রুসধারীরা! হে ঈসা মসীহ-এর ভক্তরা! আমার দিকে তাকাও! আমার বয়স দেখ! এ বয়স কি হাসি আনন্দ ও আমোদ-স্ফূর্তির নয়? উপরন্তু আমার এক হাত অবশ। এরপরও দেখ আমি পানাহার ও সুখনিদ্রার কথা ভুলে গেছি। তোমরা দেখছো, আমি কিভাবে এক হাত নিয়ে লড়াই করছি। আমি তোমাদের সন্তানতুল্য। তোমাদের ইজ্জত সম্মান রক্ষার্থে আমি শাহী জিন্দেগী ছেড়ে দিয়ে তোমাদের মাঝে চলে এসেছি। আমি তোমাদের সহযোগিতা কামনা করছি। আমরা তোমাদের সাথে থাকব, আছি।

* * *

তাঁবুর আগুন যখন প্রায় নিয়ন্ত্রণে চলে এলে আন্তোনীস ও ইউকেলিস লোকদের উদ্দেশ্যে এক অগ্নিঝরা বক্তৃতা দেয়। তখনো আগুনে পোড়া লাশগুলো খুঁজে এনে একত্রিত করা হয়নি। আন্তোনীস ও ইউকেলিসের বক্তৃতায় সবাই উদ্বুদ্ধ ও উদ্বেলিত হয়। শহরে যে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল তা দূর হয়ে যায়। এক অভিনব শক্তিতে যেন সবাই বলিয়ান হয়ে উঠে।

সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত কোথাও কোথাও আগুন জ্বললেও শীঘ্রই তা আয়ত্বে চলে আসে। যে সব লোক জ্বলন্ত তাঁবু থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিল এবার তারা তাদের ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী পরিজনদের তালাশ করতে থাকে। পোড়া তাঁবুর মাঝ থেকে খুঁজে খুঁজে বীভৎস বিকৃত লাশগুলো একের পর এক বের করে এনে একজায়গায় পাশাপাশি শুইয়ে রাখে।

সূর্য উদিত হলে শহরের লোকেরা একে একে পোড়া তাঁবুগুলোর নিকট আসতে লাগল। তারা সারিবদ্ধ বিকৃত লাশগুলো দেখতে পেল। যুবক ছেলের লাশ, যুবতী মেয়ের লাশ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার লাশ, কিশোর-কিশোরীর লাশ। সবাই জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। কাউকে চেনার বা সনাক্ত করার কোন উপায় নেই। কিছু কিছু পুড়ে এমন হয়েছে যেন পোড়া কাষ্ঠখণ্ড।

মহিলারা সন্তানের লাশ নিয়ে বিলাপ করে করে কাঁদছে। কেউ কেউ আত্মহারা হয়ে নিজের চুল নিজেই ছিড়ছে। স্বজনহারা সবাই হয়রান পেরেশান। স্বজনের তালাশে ছুটাছুটি করছে। সকলের চোখে অশ্রু। চেহারায় আতঙ্কের ছাপ।

এ ভয়াবহ বীভৎস অবস্থা দেখে শহরের লোকেরা ক্ষীপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। আন্তোনীস ও ইউকেলিসের গত দিনের বক্তৃতার কথা তারা ভুলে গেল। এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলল, কোথায় আমাদের সেই রোমান সিপাহসালার? পুড়ে মরলাম তো আমরাই। ধন-সম্পদ পুড়ে ছারখার হলো তো আমাদেরই। তাহলে কেন আমরা কেল্লা থেকে বেরিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করছি না? এতে বাধা কোথায়?

এ লোকদের কথা শেষ হতে না হতেই বেশ কিছু মানুষ চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, আর কেল্লায় বসে বসে মরতে চাই না। এবার প্রতিশোধ চাই। তাজা রক্ত চাই। যুদ্ধ চাই। সবার মাঝে এই গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। সবাই বলছে, সেই রোমান সিপাহসালারকে ডেকে আন। এক্ষুণি ডেকে আন।

আন্তোনীস সংবাদ পেয়ে ইউকেলিসেকে সাথে নিয়ে ছুটে এল। তাদের আসতে দেখেই লোকেরা চিৎকার শুরু করল। সবাই ক্ষুব্ধ উত্তেজিত। সবাই

মারমুখী উত্তপ্ত। কেউ বলে উঠল, আরে! এই রোমান সালার তো বাদশাহ হওয়ার জন্য আমাদের নিয়ে জুয়া খেলছে!

আন্তোনীস সমবেত জনতাকে কৌশলে একটু শান্ত করল। তারপর বলল, আপনারা অধৈর্য হবেন না। ক্ষীপ্ত হবেন না। এই তো দু'এক দিনের মধ্যেই অবরোধ শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানরা তাদের বাহিনী সরিয়ে নিচ্ছে।

এক ব্যক্তি অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, আমরা আর ধৈর্য ধারণ করতে পারব না। আর অপেক্ষা করতে পারব না। আমরা সবাই কেল্লা থেকে বেরিয়ে এখনি মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই। বীরের মত যুদ্ধ করে মরতে চাই।

আন্তোনীস রোমান বাহিনীর সালার ছিল। রূতাসও যুদ্ধে কম দক্ষ নয়। যুদ্ধের কলা-কৌশল সম্পর্কে তারা সম্যক অবহিত। তারা জানে, কেল্লায় অবরুদ্ধ থাকার পর কখন কোন পরিস্থিতিতে কেল্লার বাইরে গিয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ করতে হয়। তাই তারা লোকদের বিভিন্নভাবে বুঝাল। কিন্তু উত্তেজিত জনতার এক কথা, এক দাবী।

এক বৃদ্ধ ব্যক্তি বলল, হে রোমান সালার! আমরা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা রাখতে চাই না। যদি তোমরা বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে না চাও তাহলে আমরাই কেল্লার দরজা খুলে দিব।

আন্তোনীসের কণ্ঠ এবার একটু কঠিন হয়ে উঠল। বলল, তুমি মূর্খ। তুমি তো মুসলমানদের জন্য কেল্লার দরজা খুলে দিবে না বরং এ দেশে ইসলাম প্রবেশের সুযোগ করে দিবে। ওরা শহরে প্রবেশ করলে সর্বপ্রথম তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। তোমাদের শুধু ধর্মই ছাড়তে হবে না। ঘরের সুন্দরী মেয়েদের ও রূপসী স্ত্রীদের মায়াও ছাড়তে হবে। তোমরা তোমাদের জাতীয় পরিচয় নিমিষে হারিয়ে ফেলবে।

রূতাস উচ্চকণ্ঠে বলল, হে ক্রুশধারীরা! যে মুসলমানদের জন্য তোমরা দরজা খুলে দিতে চাচ্ছো, তোমরা যাদের আনুগত্য মেনে নিতে চাচ্ছো, তাদের হিংস্রতা ও বর্বরতা দেখো যা বীভৎস বিকৃত লাশ হয়ে তোমাদের সামনে পড়ে আছে। তারা তোমাদের নিষ্পাপ দুগ্ধপোষ্য সন্তানকেও জ্বালিয়ে দিয়েছে। যদি তোমরা আজ আত্মসমর্পণ কর তাহলে যে-ই ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করবে তাকেই নির্মমভাবে হত্যা করবে।

এক বৃদ্ধ আগে বেড়ে বলল, হে রোমান সালার! যেখানে যুদ্ধ হয় সেখানে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চলে। তুমি কি ভুলে গেছো, রোমান ও ইরানী সৈন্যরা যেদিক দিয়েই গেছে নির্বিচারে হত্যা করেছে। নিষ্পাপ শিশুদের দু'হাতে হত্যা করেছে। যুবতী মেয়েদের কৌমার্য রক্তাক্ত করেছে। কিশোর-বালকদের হত্যা

করেছে, বাকীদের গোলাম বানিয়ে নিয়ে গেছে। আর আমরা তো ইচ্ছে করে মুসলমানদের শত্রু বানিয়েছি। আমরা রোমানদের সমর্থন দিয়েছি, তাদের সাহায্য করেছি। অথচ রোমানরা যুদ্ধ না করে পালিয়ে গেছে। তাই মুসলমানরা আমাদেরকে কেন দুশমন মনে করবে না? যদি নারী ও শিশুদের জন্য তোমার এতোই দরদ উথলে উঠে তাহলে আর কালক্ষেপণ নয়, এবার চল কেল্লার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করি। দেখবে, শহরের শিশু-কিশোররাও যুদ্ধ করবে। হাসতে হাসতে প্রাণ বিলিয়ে দিবে।

শহরের প্রায় সকল মানুষ সেখানে সমবেত হয়েছিল। বৃদ্ধের এই কথা শোনার পর লোকেরা চিৎকার শুরু করল। বলতে লাগল, মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে আমরা অবরোধ ভেঙে ফেলব। যখন এ চিৎকার ও হট্টগোল চলছে ঠিক তখন আরেক ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলল, ভাইয়েরা আমার! আমাদের উপর আরেকটি বিপদ এগিয়ে আসছে। শহরে খাদ্য-শস্যের সংকট দেখা দিয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। গৃহপালিত পশু ও ঘোড়ার খাবারের চরম সংকট। জমিজমা সব কেল্লার বাইরে। বাইরে থেকে কোনকিছু আনা সম্ভব হচ্ছে না। মানুষের আগেই এই প্রাণীগুলো মারা যাবে। তাই বলছি, অনাহারে হাড় জিরজিরে হয়ে ছটফট করতে করতে না মরে এটাই কি উত্তম নয় যে, আমরা আমাদের ধর্মের জন্য, আমাদের স্বাধীনতার জন্য, ইজ্জত সুরক্ষার জন্য যুদ্ধ শুরু করি! যুদ্ধ করতে করতে জীবন বিলিয়ে দেই!

আন্তোনীস ও রূতাসের মস্তিষ্কের টিস্যুতে টিস্যুতে শুধু যুদ্ধ আর অবরোধের চিন্তা সারাক্ষণ ঘুরপাক খাচ্ছিল। এ রঙিন স্বপ্নে সর্বদা বিভোর, বিজয় তাদের হবে। কিন্তু তারা একথা ভাবেনি যে, যুদ্ধ জয়ের বিশেষ কিছু কৌশল আছে। কিছু দাবীও আছে। যে শহরে যোদ্ধারা থাকে সেখানে খাদ্যসামগ্রী ও রসদপত্রও এতো থাকা চাই এক বৎসর বা তার চেয়ে বেশী সময় তারা তা দিয়ে স্বাচ্ছন্দে জীবন নির্বাহ করতে পারে। আলেপ্পায় কোন সৈন্য ছাউনী ছিল না। শহরের কেউ কখনো খাদ্য মজুদের প্রয়োজনও অনুভব করেনি। মুসলমানরাও সেখানে কোন সৈন্য ছাউনী তৈরি করেনি। তাই সেখানে অতিরিক্ত খাদ্যের মওজুদ নেই। এখন শহরের লোকেরা অনুভব করল যে, দ্রুত খাদ্য শস্য ফুরিয়ে যাচ্ছে। গৃহপালিত পশুর খাবারেরও তীব্র সংকট।

এ এমন এক সমস্যা যার সমাধানের কোন পথ খোলা নেই। আন্তোনীস ও রূতাস এবার একেবারে নিরব হয়ে গেল। এমন কোন সমাধান তাদের মাথায় এল না যা শুনিয়ে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করা সম্ভব। দিশেহারা আন্তোনীস। কিংকর্তব্যবিমূঢ় রূতাস। অবশেষে আন্তোনীস কবিলার সর্দারদেরকে ডেকে নির্জন স্থানে নিয়ে বসল। তাদের সামনে বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরে বলল, এখন

আমাদের বাইরে বেরিয়ে যুদ্ধ করেই অবরোধ ভেঙে ফেলতে হবে। যদি আমরা এ অপেক্ষায় থাকি, মুসলমানরা এক সময় অবরোধ তুলে চলে যাবে, তাহলে শহরের লোকেরা ক্ষুধা পিপাসায় মৃত্যুর ভয়ে নিজেরাই শহরের দরজা খুলে দিবে আর তার ফলাফল কত ভয়াবহ হবে তা সহজেই অনুমেয়।

কবিলার সর্দাররা চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত দিল যে, এখন আক্রমণ করেই অবরোধ ভেঙে ফেলতে হবে। এ ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই। আন্তোনীস সর্দারদের বলল, সে শহরের যুদ্ধে সক্ষম লোকদের একত্রিত করে যুদ্ধের কলা-কৌশল ও প্রয়োজনীয় বিষয় শিখিয়ে দিবে।

* * *

আলেপ্পা শহরের দু'দিক থেকে দু'টি অশ্বারোহী বাহিনী পশ্চাৎ গমনের কারণে শহরবাসীদের মাঝে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) কিছুই জানতে পারেননি। শহরে যে খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিয়েছে তাও তিনি জানতে পারেননি।

একদিন খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) সাথী ইয়ায ইবনে গানাম (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করে শহরের এক পার্শ্বের অবরোধ তুলে নিলেন এবং মুজাহিদদের দূরে পাঠিয়ে দিলেন।

সেদিন আন্তোনীস, রূতাস ও কবিলার সর্দাররা কেল্লার সুউচ্চ পাঁচিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন দেখল, অবরোধকারী মুজাহিদ বাহিনী শহরের এক পার্শ্ব থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন তাদের আর আনন্দের সীমা রইল না।

আন্তোনীসের কণ্ঠে গর্ব ও অহঙ্কার ভরা আত্মবিশ্বাসের সুর ফুটে উঠল। বলল, আমরা আর বেশী অপেক্ষা করতে পারি না। কাল সকালেই এদিকের দু'টি দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ব। তারপর মুসলমানদের ধূলির সাথে মিশিয়ে তবে ফিরব।

পূর্বাকাশ আলোকিত। পৃথিবী আলোয় উদ্ভাসিত। আলো ছড়াতে ছড়াতে সূর্য কিছুটা উপরে উঠে এসেছে। অকস্মাৎ শহরের দু'টি দরজা খুলে গেল। শহরের লোকেরা বাধভাঙা বন্যার পানির ন্যায় তলোয়ার বর্শা নিয়ে মার মার কাট কাট রব তুলে বেরিয়ে এল। তাদের অনেকেই অশ্বারোহী।

এমন পরিস্থিতির জন্য মুসলমানরা প্রস্তুত ছিল না। এ ধরনের হামলা প্রতিহত করার জন্য তারা সুযোগই পেল না। তবে সালারদের পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল, তারা যেন সর্বদা সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে। তাই একেবারে ভেঙে পড়ল না।

আক্রমণের কৌশল আন্তোনীস অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে তৈরি করেছিল। তাই এমন হল না যে একদিক থেকে আক্রমণ করল আর পিছন দিক থেকে মুজাহিদ বাহিনী এসে তাদের ঘিরে ফেলল। সে শহরের যোদ্ধাদের শিখিয়ে দিয়েছে, কেল্লা থেকে বেরিয়েই তারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। ডানে ও বামে চলে যাবে। তাহলে পশ্চাৎ দিক থেকে তারা নিরাপদ থাকবে। এক দলের সালার আন্তোনীস। আরেক দলের সালার রূতাস। ইউকেলিস রূতাসের সাথে তার সহযোগী হিসাবে রইল।

অপ্রস্তুত, অসচেতন ও অলসতা ঝেড়ে ফেলে যখন মুজাহিদ বাহিনী উঠে দাঁড়াল এবং অত্যন্ত শক্ত হাতে তাদের প্রতিহত করল তখন শহরের লোকেরা বুঝতে পারল যে তারা এক কঠিন বিশাল পাথরের সাথে আঘাত খেয়েছে। এ জগদ্দল পাথর ঠেলে সামনে অগ্রসর হওয়া এক অসম্ভব কাজ।

খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) ভেবেছিল, যদি শহরের লোকেরা কেল্লার বাইরে এসে আক্রমণ করে তাহলে কিছু মুজাহিদ আক্রমণকারীদের পশ্চাতে চলে গিয়ে খোলা দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করবে। কিন্তু এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। কারণ আন্তোনীস শহরের যোদ্ধাদের দু'ভাগে ভাগ করে পশ্চাতে যাওয়ার সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে।

ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। ক্ষুধার্ত শার্দূলের ন্যায় একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তীর, বর্শা আর তলোয়ারের যুদ্ধ শুরু হল। রণহুঙ্কারে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল। আন্তোনীস ও রূতাস প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যদের মতই শহরের যোদ্ধাদের পরিচালিত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগল। কিন্তু আসলে তো তারা সৈন্য নয়। যুদ্ধের কলা-কৌশল তাদের জানা নয়। তারা এক বিশৃঙ্খল জনতার ঢল। তারা বাঁধ ভাঙা স্রোত। তাদের একটিই ইচ্ছা, মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করা। কিন্তু বিশৃঙ্খলতার কারণে ফলাফল হল একেবারে বিপরীত। অধিকাংশ মুজাহিদ অশ্বারোহী হওয়ার সুবাদে নিরাপদে ও অত্যন্ত সহজে শহরের যোদ্ধাদের ধরাশায়ী করতে লাগল।

আন্তোনীস সজাগ। সতর্ক তার দৃষ্টি। সে মুসলমানদের গতি প্রকৃতি দেখে বুঝে ফেলল, মুসলমানরা কেল্লার দরজায় পৌঁছতে চাচ্ছে। শহরের যোদ্ধারা তাদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তারা ক্রমেই দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনি পরিস্থিতিতে সে তার কর্তব্য নির্ধারিত করে ফেলল। শহরের যোদ্ধাদের নির্দেশ দিল তারা যেন কাল বিলম্ব না করে শহরে প্রবেশ করে। কিন্তু কেউ তার কথায় কান দিচ্ছে না। আন্তোনীস দেখল, সামনে কঠিন পরীক্ষা। কবিলার সর্দারদের ডেকে বলল, তারা যেন তাদের গোত্রের যোদ্ধাদের শহরে প্রবেশের নির্দেশ দেয়। সর্দারদের নির্দেশ পাওয়া মাত্র যোদ্ধারা শহরে প্রবেশ শুরু করল।

মুজাহিদরা তাদের পশ্চাৎগমন করল। তাদের ধারণা ছিল, শহরের যোদ্ধাদের সাথে তারাও শহরে প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু তারা তড়িঘড়ি করে বহু যোদ্ধাকে বাইরে রেখেই দরজা বন্ধ করে দিল। যারা বাইরে আটকা পড়েছিল তারা প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। অপরদিকে শহরের যোদ্ধারা কেল্লার পাঁচিলের উপর থেকে মুজাহিদদের লক্ষ্য করে অব্যর্থ তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করতে লাগল। মুজাহিদরা এতে ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হল। ফলে তারা নিরাপদ স্থানে চলে গেল। শহরের বাইরে থাকা যোদ্ধারা এই সুযোগে সহজেই শহরে প্রবেশ করল।

কেল্লার উঁচু প্রাচীরে দাঁড়িয়ে যোদ্ধারা বাইরের হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখতে পেল। নিকটে দূরে বহু লাশ ছড়িয়ে আছে। চারদিকে রক্ত আর রক্ত। অনেকে আক্রান্ত হয়ে উঠে আসতে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। একটু অগ্রসর হয়েই আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। এ দৃশ্য বিভিন্ন কবিলার খ্রিস্টান যোদ্ধাদের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিল। তারা ঘোষণা করল, তারা আরেকটি আক্রমণ করবে। তা হবে মরণপণ আক্রমণ। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আক্রমণ। মুসলমানদের জীবনের তরে যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দিতে হবে।

এদিকে শহরের নারীরা তাদের সন্তান, ভাই, পিতা ও স্বামীদের তালাশে পাগল পারা হয়ে গেল। যারা যুদ্ধ করে ফিরে এসেছে তারা তাদের উপর যেন উপচে পড়ল। সবার চোখে অশ্রু। মুখে আহাজারী আর বিলাপ।

তাদের মাঝে লীজাও বিদ্যমান। ইউকেলিস, ইউকেলিস বলে চিৎকার করে সে ইউকেলিসকে খুঁজছে। কিন্তু ইউকেলিসকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। লীজা দৌড়ে কেল্লার পাঁচিলের উপর উঠল। দেখল, দূরে ইউকেলিস রূতাসের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে। সে দৌড়ে গিয়ে ইউকেলিসকে ঝাঁপটে ধরল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল। ইউকেলিস বলল, আম্মা! আপনি এতো অধৈর্য হবেন না। দেখুন আমি একেবারে সুস্থ। আমার জন্য আপনি এতো উতলা হচ্ছেন কেন!

ইউকেলিসের তালাশে আরেকজন অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী হয়রান পেরেশান হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে। কিন্তু কাউকে কিছু বলছে না। সে যেন প্রায় পাগলিনী। সে ঐ খ্রিস্টান যুবতী যাকে ইউকেলিস কুস্তুনতীনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এ যুবতীর সাথে ইউকেলিসের আলেপ্পা শহরে দেখা হয়েছে এবং বেশ কয়েকবার তাদের অভিসার হয়েছে। তার নাম রোজী। সেও ইউকেলিসের সন্ধানে কেল্লার প্রাচীরের উপর উঠে দেখল, দূরে ইউকেলিস লীজার কাছে দাঁড়ান। সে আর সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ছুটে এল ইউকেলিসের নিকটে। ইউকেলিস দেখল, তার দিকে তার প্রেয়সী এলোকেশে

ছুটে আসছে। যেন উন্মাদিনী। ইউকেলিস নিজেকে তার মায়ের স্নেহপরশ থেকে মুক্ত করে দু'হাতে রোজীকে জড়িয়ে ধরল।

* * *

শহরের বাইরে মুজাহিদরা তাদের শহীদ সঙ্গীদের লাশ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। মহিলারা আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করছে। এরা মুজাহিদদের স্ত্রী, মেয়ে, মা। এরা মুজাহিদদের সাথেই এসেছে। এরা অবরোধ থেকে কিছুটা দূরে এক নিরাপদ স্থানে অবস্থান করছে। এদের সাথে শারীনাও এসেছে। সে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কন্যা। বর্তমানে আরবের খাজরাজ বংশের মুজাহিদ হাদীদ ইবনে মুমিনের স্ত্রী। অন্যান্য নারীদের সাথে সেও অসুস্থ ও জখমীদের পানি পান করাচ্ছে। তাদের তুলে নিয়ে তাঁবুতে শুইয়ে দিয়ে ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগিয়ে দিচ্ছে। পট্টি বেঁধে দিচ্ছে।

মুজাহিদরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এমন হয়নি যার প্রতিক্রিয়ায় অবরোধ শিথিল হয়ে যাবে। জখমীদের সংখ্যা একটু বেশী। কিন্তু তাতেও অবরোধ কার্যক্রমে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) শহরের যেদিক থেকে অবরোধ তুলে নিয়েছিলেন সেদিকে একদল অশ্বারোহী মুজাহিদ পাঠিয়ে দিলেন। এছাড়া আর তেমন কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হল না। কেল্লায় আক্রমণেরও কোন পরিকল্পনা করলেন না। বরং পূর্বের ন্যায় মুজাহিদরা অবস্থান করতে থাকল।

পুনরায় আক্রমণের জন্য উভয় পক্ষের কিছুটা অবকাশের প্রয়োজন। যেন অসুস্থ ও সাধারণ জখমীরা সুস্থ হয়ে উঠে। আন্তোনীস ও রূতাস পুনরায় আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। কবিলার সর্দারদের সাথে বারবার আলোচনা পর্যালোচনা ও পরামর্শ হচ্ছে। সর্দারদের মাধ্যমেই পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা যোদ্ধাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছে। কেল্লায় অবস্থিত খ্রিস্টানদের অবস্থা এমন হল যে, কিশোররা পর্যন্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। নারীরাও বলাবলি করতে লাগল, প্রয়োজন হলে তারাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে।

মুসলমানদের শিবিরে নিয়ম হচ্ছে, নামাযের জামাতে সিপাহ সালার ইমাম হন। ফযরের নামাযের পর সিপাহসালার খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে মুজাহিদদের তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে দু'চারটি কথা বললেন। তিনি প্রায়ই একথা বলেন, "আল্লাহ্‌র রাজত্বের কোন সীমা নেই। জিহাদ আল্লাহর নামে হওয়া চাই। আল্লাহই তার বিনিময় প্রদান করবেন।" মাঝে মাঝে একথাও বলেন, 'আমল ছাড়া দু'আ এবং দু'আ ছাড়া আমলের অবস্থা ঐ উদ্ভিদের ন্যায় যা মাটি ভেদ করে ঝলমলে দুনিয়ায় এসেছে। কিন্তু পানি না পাওয়ার কারণে শুকিয়ে মরে গেছে।

খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) সরাসরি মুজাহিদদের কিছু বলতে চাইলে ফজরের নামাযের পর বা অন্য কোন নামাযের পর বলেন। তিনি মুজাহিদদের সদা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, যে কোন সময় যে কোন মুহূর্তে আবার আক্রমণ হতে পারে। সুতরাং আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি এ তথ্য পেয়েছেন আহত খ্রিস্টান যোদ্ধাদের থেকে। তারা বলেছে, আবার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। তারা আরো বলেছে, শহরে খাদ্যশস্যের দারুণ সংকট। আর কিছুদিন পরই শহরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। তিনি একথাও জেনেছেন, শহরের লোকেরা দ্রুত অবরোধ ভেঙে ফেলতে চাচ্ছে। শহরে এমন মানুষও রয়েছে যারা মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিতে রাজী আছে। আলেপ্পো শহরের ভিতরের অবস্থা জানার পর খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) ও ইয়ায ইবনে গানাম (রা.) এর জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরী করা সহজ হয়ে গেল।

এদিকে কেল্লার মাঝেও আত্মরক্ষামূলক আক্রমণের আলোচনা চলছে। আন্তোনীস ও রূতাস দু'তিন দিন পর একেবারে প্রত্যুষে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল। যারা জখমী হয়েছিল তাদের অনেকেই সুস্থ হয়ে উঠেছে। পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী লোক আক্রমণে অংশগ্রহণ করবে। তারা এখন পূর্ণ প্রস্তুত। আন্তোনীসের ইচ্ছা হল, এ আক্রমণ হবে চূড়ান্ত। তাই এবার আর দু'দরজায় নয়, চার দরজা দিয়ে বেরিয়ে আক্রমণ করতে হবে। কেল্লার চারদিক দিয়ে হবে এ আক্রমণ।

আন্তোনীস ও রূতাসকে না জানিয়ে ইউকেলিস এক দুর্ধর্ষ জানবাজ অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তুলছিল। এ বাহিনীর সবাই অসম সাহসী, বীর বিক্রম। তারা সিদ্ধান্ত করেছে, তারা মুসলমানদের সিপাহ সালারের উপর বিদ্যুৎ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাকে জীবিত বা মৃত শহরে তুলে নিয়ে আসবে। তারা এ সিদ্ধান্তও করেছে যে, তারা অন্য কোথাও যুদ্ধ করবে না। শুধু সেখানেই যুদ্ধ করবে যেখানে সিপাহসালার অবস্থান করছে।

যুদ্ধের আর একদিন একরাত বাকি। ইউকেলিস তার মায়ের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার আগে বলে গেছে, আমি একটি দুর্ধর্ষ জানবাজ বাহিনী তৈরী করেছি। যে বাহিনীর কথা আন্তোনীস বা রূতাস কেউ জানে না। আমার এ বাহিনী মুসলমানদের সিপাহ সালারকে জীবিত বা মৃত তুলে আনবে। সে তার মাকে বলেছে, সে এখন তার সেই বিশেষ বাহিনীর নিকট যাচ্ছে। যুদ্ধে বিজয়ের পর ফিরে আসব। মায়ের নিকট দু'আ নিয়ে সে চলে গেল।

আন্তোনীস দারুণ ব্যস্ত। কাজের যেন শেষ নেই। চিন্তার যেন সীমানা নেই। কখনো সে কেল্লার উঁচু পাঁচিলের উপর গিয়ে উঠে। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে

চারদিক দেখে। তারপর ছুটে এসে কবিলার সর্দারদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং অবস্থার পর্যালোচনা করে। যুদ্ধের চিন্তায় যেন সে পাগলপারা হয়ে গেছে।

* * *

দ্বিপ্রহর। আকাশে মেঘলা মেঘলা ভাব। গোটা প্রকৃতি মেঘমেদুর। এ সময়ে রূতাসকে তার খুব দরকার। আন্তোনীস কাউকে না পাঠিয়ে নিজেই তার তালাশে বেরিয়ে পড়ল। তার ধারণা, রূতাস কেল্লার পাঁচিলের কোথাও আছে। কিন্তু না। তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। সবশেষে সে রূতাসের বাড়িতে গেল। রূতাস একাই এ বাড়িতে থাকে। তাই আন্তোনীস ডাকাডাকি না করে সোজা ভিতরে চলে গেল।

উঠানে পৌঁছে রূতাসকে ডাক দিল। এক কামরা থেকে রূতাসের আওয়াজ শুনতে পেল। সে বলছে, জ্বী! আমি কাপড় পরিবর্তন করে আসছি। আন্তোনীস ভাবল, সে তো একা থাকে। তাই তার কামরার দিকে গেল। দরজা বন্ধ। দরজার একটি কপাটে হাত রাখতেই তা খুলে গেল। তারপর আন্তোনীস কামরায় যা দেখল তাতে তার মাথার রক্ত টগবগ করে উঠল। দেখল, কামরার বিছানা থেকে লীজা উঠে যাচ্ছে। প্রায় বিবস্ত্রা। কাপড় টানতে টানতে সে দ্রুত আড়ালে চলে গেল। রূতাসকেও সে বিবস্ত্র দেখতে পেল। আন্তোনীসের মস্তিষ্কে লেলিহান আগুন। সবকিছু সে মুহূর্তে ভুলে গেল। সাথে সাথে তলোয়ার কোষমুক্ত করে চিৎকার করে রূতাসকে লক্ষ্য করে বলল, হারামজাদা! তলোয়ার নিয়ে উঠানে চলে আয়। যে বেঁচে থাকবে সেই লীজাকে পাবে।"

সাথে সাথে রূতাস চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে উন্মুক্ত তরবারী হাতে উঠানে লাফিয়ে পড়ল। আন্তোনীস আর রূতাস। উভয়ের হাতে ঝকঝকে তরবারী। তারা একে অপরের রক্ত পিপাসু। উভয়ে যেন ক্ষুধার্ত শার্দূল। বাড়ির উঠানে তরবারী নিয়ে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তরবারীর আঘাতে আঘাতে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ ঝরে পরতে লাগল। ইতিমধ্যে লীজা কাপড় পরে দৌড়ে উঠানে এল। দেখল, উভয়ের চোখে আগুনের গোলক। আঘাতের পর আঘাত হানছে একে অপরকে। মুহূর্তে লীজা দৌড়ে উভয়ের মাঝে এসে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে একে অপরের উপর আবারো আঘাত করে বসেছে। কিন্তু সে আঘাত প্রতিপক্ষকে ঘায়েল না করে লীজার শরীরে লেগেছে। দু'দিক থেকে দুই তরবারী লীজার পেটে বিদ্ধ হয়ে বেরিয়ে গেল। উভয়ে তলোয়ার বের করে আনার পূর্বেই চিৎকার করে লীজা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। উভয়ে লীজার দিকে তাকাল। তারপর আবার প্রতিপক্ষের দিকে দৃষ্টি দিল। আন্তোনীস একটু পিছিয়ে এল। সে আবার রূতাসের উপর আক্রমণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে।

রূতাস তার তরবারী জোড়ে উঠানোর এক কোণে নিক্ষেপ করল। সশব্দে তরবারীটি গিয়ে মাটিতে পড়ল। রূতাস চিৎকার করে বলল, আন্তোনীস! সাবধান! এক নারীকে নিয়ে আমরা আমাদের কর্তব্যের কথা ভুলে গেছি। আমরা কি ঈসা মাসীহ এর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করিনি? আমাকে যদি মারতে হয় মেরে ফেল। কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুললে চলবে না। যে মারা গেছে সে এক বদকার নারী। এ নারীর কারণে আমাদের একে অপরের দুশমন হওয়া অনুচিত।

আন্তোনীস থমকে দাঁড়াল। চমকে উঠল তার স্নায়ু। হ্যাঁ তাইতো! আন্তোনীস তার তরবারী কোষাবদ্ধ করে ফেলল। উঠানে পড়ে থাকা রূতাসের তরবারীটি তুলে তার হাতে দিল। বলল, যা ঘটেছে তা ভুলে যাও। আমরা বিজয় লাভ করতে পারলে নারীর অভাব হবে কি!

ইউকেলিস তার দুর্ধর্ষ জানবাজ বাহিনীর নিকট চলে গেছে। সে তার মাকে বলে গেছে, আক্রমণের পর বিজয়ী বেশেই সে ফিরে আসবে। কিন্তু তাকে এ সংবাদ দেয়ার কেউ ছিল না যে, তার মা রূতাসের বাড়ির উঠানে মরে পরে আছে। এদিকে আন্তোনীস ও রূতাস পূর্বের মত একজোট হয়ে গেছে। যেন তাদের মাঝে কখনো কোন দ্বন্দ্ব হয়নি।

* * *

এখনো প্রভাতের বিমল আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েনি। উদ্ভাসিত হয়ে উঠেনি পৃথিবী। চারদিকে আবছায়া। ঠিক তখন শহরের চারদিকের চারটি দরজা খুলে গেল। দরজা দিয়ে অসংখ্য অগণিত যোদ্ধা তীব্র গতিতে বেরুতে লাগল। এ চারটি দরজা ছাড়া পঞ্চম আরেকটি দরজা খুলে গেল। সে দরজা দিয়ে ইউকেলিস তার দুর্ধর্ষ একশত অশ্বারোহী যোদ্ধাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এ দরজা ইউকেলিসের নির্দেশে খোলা হয়েছে। আন্তোনীস শুধুমাত্র চারটি দরজা খোলার নির্দেশ দিয়েছিল আর বলেছিল, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যেন দরজা বন্ধ করা না হয়।

এবার খ্রিস্টান যোদ্ধাদের যুদ্ধ পদ্ধতি ভিন্ন ধরনের। তারা ডানে বামে হামলা না করে সোজা চলে গেল। মুজাহিদরা তা প্রতিহত করতে প্রস্তুত হল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল। এ যুদ্ধে মুজাহিদরাও ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছে। তারা খ্রিস্টান যোদ্ধাদের আক্রমণ প্রতিহত করছে কিন্তু আগে বেড়ে আক্রমণ করছে না। ক্রমেই তারা পিছিয়ে যাচ্ছে। খ্রিস্টান যোদ্ধারা বুঝতে পারেনি, খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) কতো দূরদর্শী, কতো বিজ্ঞ সিপাহ সালার। মুজাহিদ বাহিনী যখন ক্রমে পিছু হঠে যাচ্ছে তখন খ্রিস্টান যোদ্ধারা মনে করেছে,

মুসলমানরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তারা দ্বিগুণ উৎসাহে তাদের উপর আক্রমণ করতে করতে শহর থেকে দূরে চলে এসেছে। আন্তোনীস ও ব্লতাসও মুজাহিদ বাহিনীর যুদ্ধ-কৌশল বুঝতে পারেনি। তারা ধারণাও করতে পারেনি, তারা কেল্লা থেকে এতো দূরে চলে এসেছে যেখান থেকে শত্রুবেষ্টনি ভেদ করে ফিরে যাওয়া কঠিন।

শহরের উভয় পার্শ্বের খ্রিস্টান যোদ্ধারা যুদ্ধ করতে করতে যখন শহর থেকে অনেক দূরে চলে এল, ঠিক তখন শহরের আশে পাশে পাহাড় ও টিলার পশ্চাতে লুকায়িত একদল অশ্বারোহী বেরিয়ে বিদ্যুৎ বেগে শহরের দিকে ছুটে গেল। তারা শহর ও খ্রিস্টান যোদ্ধাদের মাঝামাঝি অবস্থান নিল। এরা ঐ অশ্বারোহী বাহিনী যারা অবরোধ তুলে চলে গিয়েছিল এবং পাহাড় টিলা ও ঝোঁপ ঝাঁড়ের আড়ালে আত্মগোপন করেছিল। এদিকে আন্তোনীস ও শহরের নেতৃস্থানীয় লোকেরা প্রবঞ্চনায় পরে ভেবেছিল যে, মুসলমানরা অবরোধ তুলে নিয়েছে। অশ্বারোহী এই বাহিনী এতদিন পর্যন্ত সিপাহ্ সালারের ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল। আজ ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তারা নিখুঁতভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে।

শহরের দিকে ছুটে আসা এই অশ্বারোহী মুজাহিদদের কিছু অংশ সোজা শহরে প্রবেশ করল। অন্যরা খ্রিস্টান যোদ্ধাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদিকে মুজাহিদ বাহিনীও থমকে দাঁড়াল। এবার তারা পিছু না হটে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। খ্রিস্টান যোদ্ধারা চারদিক থেকে মুজাহিদ বাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেল। খ্রিস্টান যোদ্ধাদের মাঝে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। চারদিক থেকে বাঁচাও বাঁচাও রব উঠল। কিন্তু সবদিক অন্ধকার। মুজাহিদদের তলোয়ারের আঘাতে খ্রিস্টান যোদ্ধারা লুটিয়ে পড়তে লাগল। চারদিকে রক্ত আর রক্ত। খ্রিস্টান যোদ্ধাদের লাশ আর লাশ।

যে সব মুজাহিদ শহরে প্রবেশ করেছিল তারা ছোটখাট বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু তা মুহূর্ত কালের জন্য। মুজাহিদ বাহিনী প্রায় যুদ্ধ ছাড়াই শহর দখল করে নিল। তারপর ঘোষণা করে দিল, পুরুষরা যেন ঘরের বাইরে চলে আসে। মেয়েরা ঘরে থাকবে। যদি কোন পুরুষকে ঘরে লুকায়িত পাওয়া যায় তবে তাকে হত্যা করা হবে। মহিলাদের কোন ভয় নেই। কেউ তাদের দিকে অশুভ দৃষ্টিতেও তাকানোর সাহস পাবে না। কোন বৃদ্ধ, বালক ও অসুস্থের উপর অত্যাচার করা হবে না। বয়োবৃদ্ধ, অসুস্থ লোকেরাও ঘরের বাইরে আসবে না।

মুজাহিদদের এই ঘোষণা খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করতে পারল না। তারা স্ত্রীদের, যুবতী কন্যাদের ঘরের গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখে দুরু দুরু হৃদয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। মহিলারা ভয়ে আতঙ্কে একেবারে জড়োসড়ো হয়ে রইল। তারা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে থরথর করে কাঁপছে। কেউ জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি

দেয়ারও সাহস পাচ্ছে না। যদি বিজয়ী এই বাহিনী রোমান, ইরান বা অন্য কোন অমুসলিম জাতি হত, তাহলে এতক্ষণে লুটতরাজ শুরু হয়ে যেত। ঘরে ঘরে ঢুকে নির্বিচারে নির্দয়ভাবে হত্যালীলা চালাত। যুবতী নারীদের কৌমার্য নিয়ে উল্লাস করা হত। কোন যুবতী তাদের লোলুপতা থেকে রেহাই পেত না। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনী কারো বাড়িতে ঢুকে উঁকি পর্যন্ত দেয়নি।

শহরের সকল মানুষ এক উন্মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হল। এদিকে শহরের বাইরে খ্রিস্টান যোদ্ধারা একের পর এক ধরাশায়ী হয়ে চলছে। তারা সিপাহ সালার খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-এর পাতানো ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে।

ইউকেলিস তার একশত জানবাজ যোদ্ধা নিয়ে মুজাহিদ বাহিনীর সিপাহ সালারকে খুঁজে ফিরছে। চোখে তার শাহীনের দৃষ্টি। সে জানে না, মুসলমানদের সিপাহ সালার বাদশাহ হয় না, যে রণক্ষেত্র থেকে দূরে অবস্থান করে যুদ্ধ পরিচালনা করে। যুদ্ধ চলাকালে খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) এক স্থানে স্থির রইলেন না। তার সাথে থাকে রক্ষীবাহিনী। ইউকেলিস তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে তার সঙ্গী যোদ্ধাদের নিয়ে মুজাহিদ বাহিনীর আবেষ্টনীতে চলে এল। তারা একে একে আহত হয়ে ঘোড়া থেকে লুটিয়ে পড়তে লাগল। ঘোড়ার পায়ে পদদলিত ও পিষ্ট হতে লাগল।

কে একজন চিৎকার করে বলে উঠল, "রোমান সালার দু'জন নিহত হয়ে গেছে। একে একে কয়েকজনে এ আওয়াজ দিল। মুহূর্তে গোটা রণাঙ্গনে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। সাথে সাথে খ্রিস্টান যোদ্ধারা নিরাশার অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে লাগল। যেন তারা আলো থেকে হঠাৎ নিকষ অন্ধকারে ডুবে গেছে। তারা তলোয়ার, বর্শা ও তীর-ধনুক ফেলে দিল। চিৎকার করে বলতে লাগল, আমরা যুদ্ধ চাই না। আমরা শান্তি চাই। যারা ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল, তারা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। সবাই আত্মসমর্পণ করে অস্ত্র ফেলে দিল।

খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। নির্দেশ দিলেন, যারা আত্মসমর্পণ করেছে তারা যেন তাদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে শহরের উন্মুক্ত প্রান্তরে শহরবাসীদের সাথে সমবেত হয়। নির্দেশ মোতাবেক খ্রিস্টান যোদ্ধারা অস্ত্র ফেলে নতশিরে শহরের উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে সমবেত হল। কিছুক্ষণ পর খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) ও ইয়ায ইবনে গানাম (রা.) শহরের প্রধান দরজা দিয়ে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করলেন। এটা ছিল শামের সর্বশেষ কেল্লা। সেটিও আজ মুজাহিদ বাহিনীর পদানত হল। গোটা শাম এখন মুসলমানদের দখলে। যে উন্মুক্ত প্রান্তরে শহরের লোকেরা একত্রিত হয়েছে খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) সে প্রান্তরে গেলেন। চারদিকে দেখে কি যেন বুঝলেন। তারপর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন ঃ

"আরব খ্রিস্টান ভাইয়েরা! আমরা যুদ্ধ করে এ শহর পদলিত করেছি। আমাদের অনেকে নিহত হয়েছে। অনেকে আহত হয়েছে। বহু বন্ধুকে হারানোর ব্যথা আমাদের মনে। তোমাদের আঘাতে তারা শহীদ হয়েছে। তাই তোমাদের সাথে ব্যবহার করা উচিত অন্যরকম। কিন্তু আমি সে পথে যাব না। আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.)-এর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হব। আমাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী তোমাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলব। আর তারপরও আমাদের অধিকার আছে, আমরা তোমাদের থেকে ক্ষতি পূরণ দাবী করব।

কিন্তু বনু তাগলিব রণক্ষেত্রে যখন অস্ত্র সমর্পণ করেছিল। তখন আমীরুল মু'মিনীন নির্দেশ দিয়েছিলেন, কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে না। তার বিনিময়ে তাদের থেকে জিযিয়া-কর নেয়া হবে। এই জিযিয়া কর প্রত্যেকের সামর্থানুযায়ী হবে। তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রোমানদের সাথে যোগ দিয়েছিলে। সেজন্য তোমাদের কঠিন শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু আমরা তোমাদের কোন শাস্তি দেব না। শহরের কোন বাড়িতে লুট তরাজ হয়েছে? কোন মুসলমান কি কারো ঘরে প্রবেশ করেছে?"

সমবেত জনতার সাঝ থেকে উত্তর এল, না, না, সিপাহ সালার! গোটা শহরের কোথাও সামান্য দুর্ঘটনাও ঘটেনি।

খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) বললেন, "আমরা তোমাদের মান-ইজ্জত, ধন-সম্পদের হিফাজতকারী। কিন্তু এরপর যদি কেউ বিন্দু পরিমাণ গাদ্দারী করো তাহলে আর ক্ষমা নয়। তাকে হত্যা করা হবে।"

উল্লেখ্য যে, আলেপ্পা বাসীদের হৃদয় জুড়ে যে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে ছিল তা নিমিষে দূর হয়ে গেল এবং খালিদ (রা.)-এর আবেগময় হৃদয়স্পর্শী অগ্নিঝরা বক্তৃতায় তখনই অনেকে ইসলাম গ্রহণ করল।

* * *

সূর্য অস্তমিত হওয়ার এখনো অনেক সময় বাকি। মুজাহিদরা তাদের আহত সাথীদের ও শহীদদের লাশ রণাঙ্গন থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম নারীরা রণাঙ্গন জুড়ে আহতদের পানি পান করাচ্ছে। যারা হাটতে পারছে তাদের ধরে ধরে যেখানে চিকিৎসা করা হচ্ছে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রচুর আহত মুজাহিদ। একের পর এককে ব্যাণ্ডেজ করা হচ্ছে। মুসলিম নারীরা তাদের সেবা-শুশ্রূষা করছে।

রণাঙ্গনের অবস্থা আরো করুণ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাশের মাঝ থেকে ক্ষীণ করুণ কণ্ঠ ভেসে আসছে। "পানি", "পানি", "এক ঘোট পানি", কখনো

শোনা যাচ্ছে আহতের আর্তনাদ। নারীরা পানির পাত্র নিয়ে রণাঙ্গনে আহতদের পানি পান করাচ্ছে। এদিকে সেদিকে ছুটে যাচ্ছে। হঠাৎ সে এক আতহকে দেখে থমকে দাঁড়াল। বিস্মিত হতবাক হয়ে তার পাশে বসে পড়ল। এ এক আহত যুবক। চেহারায় কোন আঘাত না লাগলেও সারা শরীরে তার ক্ষতের দাগ। রক্তে রক্তে একেবারে একাকার হয়ে গেছে গোটা দেহ। উৎলে উৎলে যেন শরীর থেকে রক্ত ঝরছে।

শারীনার কণ্ঠে সন্দেহ। বলল, তুমি কি ইউকেলিস? সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পুত্র এখানে কেন?

আহত যুবকের ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, শারীনা! আমি ইউকেলিস। আমি তোমাকে দেখে বিস্ময়াভিভূত। তুমি এখানে এলে কিভাবে?

ইউকেলিসের কণ্ঠ অস্পষ্ট। স্পষ্ট করে বলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। জীবনীশক্তি তার নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

শারীনা বলল, ইউকেলিস! চুপ থাক। এখন জীবন কাহিনী বলার বা শোনার সময় নয়। এই নাও পানি। পান কর। আমি তোমাকে তুলে এক্ষুণি মলম পট্টি লাগানোর ব্যবস্থা করব। আমার সাথে চল।

ইউকেলিস বলল, না, শারীনা! আমার জীবন প্রদীপ এখনই নিভে যাবে। একটু পরই আমি অনন্তলোকে হারিয়ে যাব। আমি এখনো কিভাবে জীবিত আছি তা ভেবে পাচ্ছি না। এখানেই আমাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দাও।

ইউকেলিস কাঁপা কাঁপ হাতে শারীনার হাত ধরল। কি জানি বলতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না।

শারীনা ইউকেলিসকে বলল, আমি কয়েকজন মুজাহিদকে ডেকে আনছি। তারা তোমাকে শহরে নিয়ে যাবে। ইউকেলিস শারীনার হাত আরো শক্ত করে ধরল। বারবার মাথা দুলিয়ে বলছে, না, না, শারীনা! আমি মলম পট্টি লাগাব না। তাতে আমার কোন উপকার হবে না। আমি এখন জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি।

দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাশের মাঝে আরেকজন যুবতী ইউকেলিসকে খুঁজে ফিরছে। সে রোজী। মহিলাদের জন্য বাইরে বেরুনো নিষেধ থাকা সত্ত্বেও রোজী লুকিয়ে লুকিয়ে শুধু ঘর থেকেই নয়, শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এবং রণাঙ্গনে পৌঁছে তন্ন তন্ন করে ইউকেলিসকে খুঁজে ফিরছে। হয়তো কেউ তাকে বলেছে, ইউকেলিস আহত হয়ে পড়ে আছে বা নিহত হয়েছে।

উন্মাদিনীর ন্যায় রোজী আহত ও নিহতদের মাঝে ঘুরে ফিরছে। ছুটে ছুটে গিয়ে আহত আর নিহতদের চেহারা দেখছে। মাঝে মাঝে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছে। আবার উঠে এদিক সেদিক ছুটছে। অবশেষে সে শারীনা ও ইউকেলিসের

নিকট পৌঁছল। ইউকেলিসকে দেখে উন্মাদিনীর ন্যায় তাকে জড়িয়ে ধরল। তার চোখে মুখে হাত বুলাতে লাগল। সে নির্বাক।

শারীনা ইউকেলিসের এক হাত ধরে বলল, ইউকেলিস! উঠার চেষ্টা কর। আমরা দু'জন তোমাকে তুলে নিতে পারব। তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।

রোজীর কাঁপা কাঁপ কণ্ঠ। বলল, ইউকেলিস! উঠ।

ইউকেলিস রোজীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল,রোজী! আমি তোমার অপেক্ষায় এখনো বেঁচে আছি। আমার মাকে বলবে....... এরপর আর কিছু বলতে পারল না। তার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এল। ওষ্ঠাধর মৃদু কেঁপে কেঁপে স্থির হয়ে গেল।

রোজী চিৎকার করে কেঁদে উঠল। ইউকেলিসের লাশ জড়িয়ে ধরে পাথর হয়ে রইল। শারীনার হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বেদনা-বিধূর শারীনা অশ্রু মুছতে মুছতে সেখান থেকে চলে গেল। রোজীকে সে জিজ্ঞেসও করল না, তুমি কে হে যুবতী! ইউকেলিসকে তুমি কিভাবে চিন?

* * *

দু' অপরাজেয় শক্তি। দু' পরাশক্তি। রোম সাম্রাজ্য আর ইরান সাম্রাজ্য। এই দুই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একই সময়ে জিহাদ করছে আরবের মুসলিম মুজাহিদরা। মাত্র এক যুগ পূর্বে যাদের পৃথিবীর কেউ চিনত না। ধিক্কার আর লাঞ্ছনা ছিল যাদের কপালের লিখন। আত্মকলহ আর রক্তারক্তি ছিল যাদের নেশা। হাতে তৈরী মূর্তিপূজায় যারা বুদ হয়ে থাকত তারা আজ বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। প্রায় অর্ধেক পৃথিবী তাদের পদতলে।

ইরানের সম্রাটকে মানুষ খোদার পুত্র মনে করে। যার অস্ত্রশস্ত্র আর ধন-সম্পদের কোন পরিমাপ নেই। কিন্তু আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের অনুসারীগণ যখন কালিমার দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়লেন, তখন তথাকথিত আল্লাহ্র পুত্র ইরান সম্রাট ইয়াযদগির্দ রাজধানী মাদায়েনে সমস্ত ধন-সম্পদ, হিরা-জওহার ফেলে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। গোটা ইরান সাম্রাজ্য মুসলমানরা দখল করে নিল। দুনিয়ার বুক থেকে পারস্য সাম্রাজ্যের চিত্র চিরদিনের জন্য মুছে গেল। পালিয়ে ইয়াযদগির্দ তুর্কিস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করল। সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার আশায় সুযোগের সন্ধানে রইল। তার আশা ছিল, একদিন না একদিন ইরানের লোকেরা বিদ্রোহ করবে আর সেই সুযোগে সে তার সাম্রাজ্য ফিরে পাবে। মুসলমানদের নিরস্ত্র করে তবে ক্ষান্ত হবে।

বৎসরের পর বৎসর দীর্ঘ অপেক্ষার পরে হযরত ওসমান (রা.)-এর সময় সে সুযোগ পেল। খোরাসানে বিদ্রোহ হল। ইয়াযদগির্দ এ সুযোগকে সুবর্ণ মনে করে

তুর্কিস্থান থেকে মারিতে পৌঁছল। বিভিন্ন কবিলার সর্দারদের সাথে যোগাযোগ করে বিদ্রোহের আগুনে তৈল ঢালল। শুরু হল প্রচণ্ড বিদ্রোহ। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনী দ্রুত তা দমন করে ফেলল।

ইয়াযদগির্দের অনুসারীরা পালিয়ে গেল। ইয়াযদগির্দ আবার তুর্কিস্তানে ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু ভাগ্যের লিখন কে খণ্ডাতে পারে। সে আর ফিরে যেতে পারল না। সিপাহ্ সালার সংবাদ পাওয়ার পর ইয়াযদগির্দকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেন।

ইয়াযদগির্দ পালিয়ে ফিরতে লাগল। মুজাহিদ বাহিনী তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। একদিন সে এক খরস্রোতা নদীর তীরে এক পানচাক্কির কামরায় গিয়ে লুকাল। পানচাক্কির মালিক ইয়াযদগির্দকে চিনতো না কিন্তু তার বাদশাহী পোশাক ও ভয় ভয় ভাব দেখে তার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল যে, সে ইয়াযদগির্দ। পানচাক্কির মালিক তার কামরার দরজা বন্ধ করে মারি শহরে গিয়ে শাসককে বলল, ইয়াযদগির্দ তার কামরায় লুকিয়ে আছে। শাসক সাথে সাথে এক সালারকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, ইয়াযদগির্দকে হত্যা করে তার শির নিয়ে এস। পানচাক্কির মালিক এ নির্দেশ শুনে আর দেরি করেনি, সাথে সাথে দৌড়ে চলে এসে নিজ হাতেই ইয়াযদগির্দকে হত্যা করে তার শির কেটে ফেলল। সালার এলে তাকে ইয়াযদগির্দ এর শির দিয়ে দিল এবং তার লাশ নদীর অথৈ পানিতে ভাসিয়ে দিল। এভাবেই পারস্য সাম্রাজ্যের অপরাজেয় শক্তির কর্ণধার সম্রাট ইয়াযদগির্দ পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিল। অহংকারের চির পরাজয় ঘটল।

* * *

এদিকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়ার্সের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ। যাকে শক্তি দেবতা মনে করা হয়, যার ভয়ে পৃথিবী থর থর করে কাঁপে। সে আজ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে ফিরছে। কিন্তু কোথাও আশ্রয় পাচ্ছে না। আলেপ্পা নগরী শামের শেষ কেল্লা। তাও মুজাহিদ বাহিনী দখল করে নিয়েছে।

মুজাহিদ বাহিনী যখন শামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং একের পর এক শহর দখল করে নিচ্ছে তখন সম্রাট হিরাক্লিয়াস শামের নিরাপদ শহর ইন্তাকিয়ায় আশ্রয় নিল। সিপাহ সালার আবু উবায়দা (রা.) মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন। ভয়ে হিরাক্লিয়াস সেখান থেকে পালিয়ে রাহা শহরে আশ্রয় নেয়। মুজাহিদ বাহিনী এবার রাহা শহরে পৌঁছে গেল। সে এবার শাম থেকে বহু দূরে দুর্গময় শহর কনস্টান্টিনোপলে আশ্রয় নিল। চিরদিনের জন্য শাম ছেড়ে পালিয়ে গেল। এভাবে পরাজয় ঘটল আরেক অহংকারী বাদশাহর।

সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ভাগ্য প্রসন্ন যে, মুজাহিদ বাহিনী যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিল হঠাৎ তাদের গতি থামিয়ে দেয়া হল। যদি তাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত থাকত তাহলে ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.) ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। নিকট ও দূর ভবিষ্যতে কি ঘটবে বা ঘটতে পারে তা তিনি অনুমান করতে পারতেন এবং সেভাবেই পদক্ষেপ নিতেন।

মদীনায় বসে তিনি দেখলেন, মুজাহিদ বাহিনী সুবিস্তৃত এলাকা পদানত করে ফেলেছে। শাম থেকে পালিয়ে গেছে সম্রাট হিরাক্লিয়াস। রোমানদের জুলুম অত্যাচারে নিষ্পেষিত শামের অধিবাসীরা স্বাধীনতা লাভ করেছে। সুতরাং তাদের মাঝে এখন সুশাসন কায়েম করতে হবে। ইসলামের সুমহান আদর্শ তাদের মাঝে বিকশিত করতে হবে। তা না করে যদি মুজাহিদ বাহিনী সামনেই অগ্রসর হতে থাকে তাহলে প্রচণ্ড আশংকা হচ্ছে যে, রোমান গুপ্তচরদের উস্কানীতে শামের লোকেরা চারদিক থেকে বিদ্রোহ করবে। রোমান বাহিনী আবার রুখে দাঁড়াবে। তাহলে মুজাহিদদের এ অভাবনীয় বিজয় পরাজয়েও রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি সিপাহ সালারের নিকট নির্দেশ পাঠালেন। আর সামনে অগ্রসর নয়। এবার বিজিত এলাকায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার পালা। শাসন ব্যবস্থা দৃঢ় ও মজবুত করা এখন বিজিতদের প্রধান দায়িত্ব।

শাম পদানত করার পর সিপাহ সালার আবু উবায়দা (রা.) নামাযের পর মুজাহিদদের লক্ষ্য করে যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়েছেন তা আজো ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। যার প্রতিটি ছত্র আল্লাহ্‌র রাহের মুজাহিদদের চিরদিন অমূল্য পাথেয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেছিলেন ঃ

"আল্লাহ্ কুরআনে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমরা সে প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। আরেকটি বাতিল শক্তিকে ধূলিস্মাৎ করে ইসলামী খিলাফতের সাফল্য বিস্তৃত করেছি। আসলে ইসলামী খিলাফতের কোন সীমানা নেই। আমরা আমাদের রাজত্ব কায়েমের জন্য নয় বরং আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করার জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করছি। এ ভূপৃষ্ঠ আল্লাহ্‌র। এ ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর বিধানই চলবে। শহীদরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায় আল্লাহ্‌র রাহে জীবন কুরবান করে দিয়েছে। আল্লাহ্ শহীদদেরকে নিজের নিকট আশ্রয় দেন। তবে যারা জিহাদ করে দুই হাত, পা বা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে তাদের কুরবানী ও আত্মোত্যাগের কথা স্মরণ কর। তারা সারাটি জীবন বিকলাঙ্গ প্রতিবন্ধী হয়ে থাকবে। তবে সে কারো মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহই তার সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা ও পরিজনের রিযিকের জিম্মা নিয়ে নিয়েছেন। রক্ত দিয়ে তারা যে জমিন আযাদ করেছে সে জমিন তাদের জন্য ফসল উৎপন্ন

করবে। নিজেকে কখনো তুচ্ছ ভেবো না। তোমাদের সম্পর্ক আল্লাহ্র সাথে। তোমরা তো প্রত্যহ কুরআন পড়। তোমরা কি একথা পড়নি বা শোননি যে, আল্লাহ্ তোমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে ঘোষণা করেছেন! আর তোমাদের গর্বের বিষয় হল, তিনি তোমাদেরকে বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য এবং মানুষকে অন্যায় অমঙ্গল থেকে রক্ষার জন্য নির্বাচিত করেছেন। তোমরা নিপীড়িত মানুষকে যালিম বাদশাহদের কবল থেকে উদ্ধার করবে। মানুষকে মিথ্যার অন্ধকার থেকে সত্যের আলো উদ্ভাসিত পথে নিয়ে আসবে। সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে নিঃসঙ্গ বন্ধুহীন মনে করবে না। আল্লাহ্ সর্বদা আমাদের সাথে আছেন।"

* * *

আলেপ্পা শহরের পতন ঘটেছে। মুজাহিদরা শহরে প্রবেশ করেছে ও করছে। শহরের চতুর্পার্শ্বে খ্রিস্টান যোদ্ধাদের লাশ ছড়িয়ে আছে। বহু দূর পর্যন্ত তাদের লাশ দেখা যাচ্ছে। মহিলারা শিশু কিশোররা শহরের বাইরে চলে এসেছে। সবার চোখে স্বজন হারানোর অশ্রু। দুঃখ বেদনার ছাপ। তাদের আহাজারি আর আর্তচিৎকারে হৃদয় কেঁপে উঠে। তারা স্বজনদের লাশ খুঁজছে। এক মহিলা চিৎকার করে বলছে, হায়! কার জন্য তোমরা যুদ্ধ করলে? কার জন্য তোমরা প্রাণ দিলে? রোমান দুই সালারই আমাদের সর্বনাশ করল। ওই দুই সালারই আমদের ধ্বংস করল।

মহিলার এই কথা এক কান দু'কান হয়ে অনেকের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই তা বলাবলি করতে লাগল।

অপর এক মহিলা বলল, আরে শুধু দুই সালারই নয় তাদের সাথে ছিল এক ডাইনী। খুব সুরত ডাইনী। সে মহিলাদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করত।

আরেক মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল। বলল, ডাইনী মহিলা এখন কোথায় লুকিয়েছে?

অন্য এক মহিলার রোষ কষায়িত কণ্ঠ শোনা গেল। বলল, তাকে জীবিত পেলে কেটে দু'টুকরো করব।

এক মহিলা বলল, ঐ ডাইনী মহিলার স্বামী মারা গেছে। তার ছেলের কোন সন্ধান নেই।

আরেকজন বলল, আরে! আরেকজন সালার কি যেন নাম সেও মারা গেছে। আমি তার লাশ দেখেছি।

কয়েকজন মহিলার সমবেত ক্ষুব্ধ কণ্ঠ শোনা গেল। বলল, আরে ঐ ডাইনীকে পেলে সাত-পাঁচ ভেবনা। খঞ্জরের আঘাতে শেষ করে দাও। তাদের কারণেই আমাদের এই দশা, এই সর্বনাশ।

ধীরে ধীরে অনেক মহিলা এসে সেখানে সমবেত হয়েছে। আরেক মহিলা বলল, আরে! তোমরা সেই ডাইনীর কথা বলছো! সে তো ঐ দ্বিতীয় সালারের বাড়িতে মরে পড়ে আছে। বেশ কিছু মহিলা এবার সে দিকে ছুটল। তারা দেখল, উঠানে লীজার লাশ পড়ে আছে। রক্তে রক্তে একাকার। রক্তের ধারা নীচু জায়গা দিয়ে এদিক সেদিক চলে গেছে। মহিলারা নাকে কাপড় দিয়ে ঘৃণা আর ক্ষোভ প্রকাশ করতে করতে চলে এল। কেউ বলল, লাশ টেনে নিয়ে বাইরে ফেলে এস। আরেকজন বলল, তা করে আর লাভ কি, এখানেই পড়ে থাকুক। পঁচে গলে নিঃশেষ হয়ে যাক। বাড়িটি বিরাণ হয়ে থাক।

আহত ও জখমীদের তুলে তুলে শহরে আনা হচ্ছে। আহতদের সেবার জন্য একটি ফৌজী চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সেখানে সবার চিকিৎসা চলছে। মুসলমান, খ্রিস্টান সবার জন্য তার দরজা উন্মুক্ত। মুসলমান নারীরা আহতদের ক্ষতস্থানে মলম পট্টি লাগিয়ে দিচ্ছে। সেবা-শুশ্রূষা করছে। শারীনা একাজে নিয়োজিত ছিল। অত্যন্ত যত্নের সাথে দীর্ঘক্ষণ এ কাজ করছে।

শহরের এক গলি দিয়ে যাওয়ার সময় শারীনা কিছু সমবেত মহিলাকে আলোচনা করতে শুনল। তারা বলছে, ঐ বাড়িতে এক রোমান সালারের স্ত্রীর লাশ পড়ে আছে। শারীনার অনুসন্ধিৎসু মনে দোলা লাগল। সে হাঁটতে হাঁটতে সেই বাড়িতে উপস্থিত হল। গিয়ে দেখল, এখনো দু'চারজন মহিলা লাশটি দেখছে।

শারীনা লাশ দেখে একেবারে হতবাক। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে কাঁপতে লাগল। আরে! এতো লীজার লাশ! সম্রাট হিরাক্লিয়াসের স্ত্রী লীজা। সে এখানে এলো কিভাবে। তাকে হত্যা করল কে? মুসলমানরা তো কোন মহিলাকে হত্যা করে না, বরং কোন মহিলার দিকে তাকানোও তাদের নিকট মহাপাপ।

শারীনা যখন শুনেছিল যে, দু'জন রোমান সালার মারা গিয়েছে। সে তখন তাদের লাশ দেখেছিল। আন্তোনীসকে সে চিনত। আন্তোনীসের লাশ দেখে সে দারুণ বিস্মিত হয়েছিল। তারপর রূতাসের লাশ দেখে তো সে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। সে চিন্তা করেছিল, হয়তো সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাদের দু'জনকে আলেপ্পা নগরীতে বিদ্রোহ সৃষ্টি করার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু হিরাক্লিয়াস তার স্ত্রীকে কেন পাঠাবে? চিন্তার যোগসূত্র সব ছিন্নভিন্ন করে যাচ্ছে। কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছে না।

যে দু'চারজন মহিলা লীজার লাশের পাশে ছিল তারা চলে গেল। শারীনা একাকী লাশের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। এক আকাশ চিন্তা তার মাথায়। সবকিছুই ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

হঠাৎ শারীনা একটি মিহি সুরেলা নারী কণ্ঠ শুনতে পেল। না.....না তা হতে পারে না। সবকিছু মিথ্যা। মিথ্যা। মিথ্যা।

শারীনা সচকিত হয়ে ফিরে তাকাল, দেখল, সেই খুবসুরত রূপসী যুবতীটি যাকে সে ইউকেলিসের লাশের সামনে পেয়েছিল। ইউকেলিস তাকে আদর করে রোজী নামে ডাকত। শারীনা তাকে ইউকেলিসের লাশের পাশে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে চলে এসেছিল। তাকে এতটুকুও জিজ্ঞেস করনি যে, সে কে? কি তার পরিচয়? এখন হয়তো সে কারো মুখে শুনেছে যে ইউকেলিসের মায়ের লাশ অমুক স্থানে পরে আছে। তাই সে এখানে ছুটে এসেছে। সে এসে লীজার মাথা ধরে এমনভাবে নাড়া দিচ্ছে যেন কোন ঘুমন্ত মানুষকে জাগ্রত করছে। সে বলছে, মা! আপনি মরতে পারেন না। মা! আপনি বলতেন, আমাকে ইউকেলিসের বধূ বানাবেন। উঠুন মা! উঠুন! ইউকেলিসের নিকট চলুন! সে তো আপনার অপেক্ষা করছে।

শারীনার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। হৃদয় চিরে কান্নার গমক বেরিয়ে আসতে লাগল। সে বুঝতে পারল, এই যুবতী ইউকেলিসের বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেনি। সে ভারসাম্য হারিয়ে আধা পাগলিনী। শারীনা তার কাঁধে হাত রেখে তাকে পাশে দাঁড় করাল। তারপর বলল, রোজী! আমি তাকে তুলে নিব। সে তো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সে তোমার কি হয়?

রোজী উত্তরে বলল, সে ইউকেলিসের মা! আমার কিছু হয় না। তবে আমার সবকিছুই ইনি। আমাকে ইউকেলিসের পাশে দেখে তিনি খুব আনন্দিত ও বিমুগ্ধ হতেন। বলতেন, আমি আমার পুত্রের জন্য তোমার মত কনেকেই দীর্ঘদিন যাবৎ খুঁজছি।

এ মেয়ের দুঃখে শারীনার হৃদয় হাঁহাকার করে উঠে। সে ভেবেই পাচ্ছে না যে, সে কিভাবে তাকে বুঝাবে যে, ইউকেলিস মারা গেছে আর তার মাও মারা গেছে। এরা দুনিয়াতে আর ফিরে আসবে না। শারীনা তার হাত ধরে তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছে। কথার মাঝে মাঝে তাকে শান্ত্বনা দিচ্ছে, তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করছে।

ইতিমধ্যে একজন বয়সী মহিলা ছুটে এসে উপস্থিত হল। সেও যুবতী মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। মহিলাটিকে দেখে মনে হল সে রোজীর মা। মহিলা রোজীকে মমতার সাথে বলছে, রোজী! চল! বাড়িতে ফিরে যাই।

রোজী পরিষ্কার কণ্ঠে বলছে, মা! তুমি ফিরে যাও! আমি ইউকেলিসকে ডেকে আনছি। সে তার মাকে ঘুম থেকে তুলে ঘরে নিয়ে যাবে।

শারীনা রোজীর মাকে ইশারা করল, যেন তিনি এখন রোজীকে মুক্ত থাকতে দেন। শারীনা রোজীর মাকে একটি কামরায় নিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, আপনার মেয়ের কি হয়েছে?

রোজীর মা বলল, ইউকেলিসের সাথে রোজীর প্রেম ছিল। তারা একে অপরকে হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিল। ইউকেলিস বলেছিল, তার পিতা সম্রাট হিরাক্লিয়াস। কিন্তু তার এক ভাই নাম কুসতুনীন-সে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। আন্তোনীস তাঁকে রক্ষা করেছে। ফলে আন্তোনীসের সাথে সে ও তার মা পালিয়ে এসেছি। ইউকেলিস রোজীকে একথাও বলেছিল, সে প্রকৃতপক্ষে আন্তোনীসের সন্তান। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নয়।

রোজীর মুখে শোনা সব কথা তার মা শারীনাকে বললো। শারীনা এ কথা শুনে বিস্মিত হল না যে ইউকেলিসের মা সম্রাট হিরাক্লিয়াসের স্ত্রী হলেও ইউকেলিস সম্রাটের পুত্র নয়। বরং আন্তোনীসের পুত্র। কারণ এ ধরনের ঘটনা রাজা-বাদশাদের হেরেমে প্রচুর ঘটে থাকে।

তারপর রোজীর মা বলল, আন্তোনীস মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজেই একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিল। সে তার স্বপ্নের সাম্রাজ্যকে 'ঈসা মাসীহের' সাম্রাজ্য বলত।

রোজীর মা ও শারীনা যখন ঘরে বসে কথা বলছে ঠিক তখন তারা বাইরে রোজীর চিৎকার ধ্বনি শুনতে পেল। চিৎকার করে রোজী বলছে, ইউকেলিস ও তার মাকে হিরাক্লিয়াসই হত্যা করিয়েছে। আমি হিরাক্লিয়াসকে হত্যা করতে যাচ্ছি। তার পরই রোজীর দৌড়ে যাওয়ার পদধ্বনি শোনা গেল। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। কাল বিলম্ব না করে রোজীর মাও পিছনে পিছনে ছুটল। শারীনাও বেরিয়ে এল। দেখল, রোজী শহরের সদর দরজার দিকে ছুটে চলছে। তার পিছু পিছু তার মা চিৎকার করে বলছে, 'তাকে ধর, তাকে ধর, যেতে দিয়ো না ..... দিয়ো না...... ।

শহরের অবস্থা তখন এমন, একজনের দিকে অন্যের ফিরে তাকাবার সুযোগ নেই। সবাই স্বজনদের লাশ বয়ে চলেছে। কেউ কেউ রক্তাক্ত জখমীকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে মৃত্যুর হাহাকার। স্বজন হারানোর হৃদয় বিদারক কান্না। তাই কেউ আর রোজী ও তার মায়ের দিকে ফিরে তাকাল না।

* * *

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর নির্দেশ সবাই মেনে নিল যে, সামনে আর অগ্রসর নয়। এবার বিজিত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে মনযোগী হওয়া জরুরী। কিন্তু একজন সালারের উত্তপ্ত রক্ত এখনো

টগবগ করছে। তিনি আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ হৃষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারলেন না।

সিপাহ্ সালার হযরত আবু উবায়দা (রা.) যখন আলেপ্পায় পৌঁছেছিলেন এবং সকল মুজাহিদকে একত্রিত করে আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.)-এর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে এক সংক্ষিপ্ত ও মূল্যবান ভাষণ দিয়েছিলেন, তখন সে সালার সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি অন্যত্র ছিলেন। পরে তিনি আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ শুনেও চুপ থাকলেন না। তিনি এ নির্দেশের ব্যাপারে একমত হতে পারলেন না। তিনি হলেন হযরত আমর ইবনে আস (রা.)। তার দ্বিমতের কথা সিপাহ্ সালার আবু উবায়দা (রা.)-এর কানে পৌঁছল। তিনি দুঃখ পেলেন। এর কিছুদিন পর আমর ইবনে আস (রা.)-এর সাথে দেখা হলে প্রথমে তিনি বললেন, হে আমর ইবনে আস! এমন দুঃখজনক আচরণ কেন করছো? এতে তো মুজাহিদদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। বিভেদ সৃষ্টি হয়।

আমর ইবনে আস (রা.)-এর দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠ, বললেন, রোমানদের পশ্চাদ্বাবন করা উচিৎ ছিল। আমি রোমানদের পিছু পিছু মিশর পর্যন্ত পৌঁছতে চাই। রোমানরা এখন ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে ভেড়া বকরীর ন্যায় দিগ্বিদিক ছুটে পালাচ্ছে। এ সময় যদি আমরা তাদের পশ্চাদ্বাবন করে মিশরে গিয়ে পৌঁছি তাহলে মিশর খুব সহজে আমাদের দখলে চলে আসবে।

সিপাহ্ সালার আবু উবায়দা (রা.) বললেন, ইবনে আস! তোমার কথা শুনে আমি দারুণ বিস্মিত, অত্যন্ত আশ্চান্বিত। এতো তাড়াতাড়ি তুমি ভুলে গেলে যে, বিভিন্ন গোত্রের খ্রিস্টানরা শুধুমাত্র এ কারণে শহরে শহরে বিদ্রোহ করছে যে, সেখানে মুজাহিদের সংখ্যা অনেক কম। তারা প্রশাসন সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। এটা তো আল্লাহ্র অশেষ রহমত যে, আমরা অতি সহজে বিদ্রোহ দমন করতে পেরেছি। এবার একটু চিন্তা করে দেখ, আমাদের বাহিনী এসব শহর ছেড়ে সামনে অগ্রসর হলে এই সুযোগে তারা কি বিদ্রোহ করবে না? নিশ্চয় করবে।

আমর ইবনে আস (রা.) কোন সাধারণ সালার ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী, বিচক্ষণ, চৌকস ও হুঁশিয়ার। মিসরকে ইসলামী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করা ছিল তার এক ইস্পাত কঠিন শপথ। মনে হত আল্লাহ্ যেন তাকে মিসর বিজয়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই তাকে এই আকাঙ্ক্ষা ও চেতনা দান করেছিলেন।

* * *

বিকালের কোমল বায়ুর গায়ে হালকা দুরন্তপনা। পত্রপল্লবে মৃদু ঝাপটা দিয়ে দিয়ে অনন্তে মিশে যাচ্ছে। সূর্যের আলোর প্রখরতা কমে এসেছে। সবার মনে প্রশান্ত প্রশান্ত ভাব। কিন্তু আমর ইবনে আস (রা.) এর মাথায় দারুণ চিন্তা। মিশর বিজয়ের চিন্তায় তিনি বিভোর। বাইতুল মুকাদ্দাসে এসেছেন খলীফা উমর (রা.)। একটি বিষয় নিয়ে সরাসরি তাঁর সাথে আলোচনা করতে এলেন হযরত আমর ইবনে আস (রা.)। বললেন, আমি আপনার সাথে একটি জরুরী বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছি।

উমর (রা.) বললেন, কিসের আলোচনা, বলুন।

হযরত আমর ইবনে আস (রা.) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর শপথ করে বলছি। আপনি রোমান সালার আতরাবুনকে এমনিভাবে চিনেন যেমনিভাবে আপনি আপনার ডান হাতকে চিনেন। আমি কখনো একথা বিশ্বাস করব না যে, আমাদের খলীফা এ আত্মঅহমিকায় বিভোর হয়ে আছেন আর ভাবছেন, রোমান সালার আত্‌রাবুন ভয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস ছেড়ে মিশরে চলে গেছে। আমাদের প্রত্যয় ও বিশ্বাস, আমরা স্বপ্নে বিভোর থাকি না। আর নিজেকে নিজে প্রবঞ্চিত করা মুজাহিদদের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

হযরত উমর (রা.) হযরত আমর ইবনে আস (রা.)-কে থামিয়ে দিয়ে বললেন, হে ইবনে আস! তুমি যে কথার ভূমিকা রাখছো সরাসরি তা বলে ফেলাইতো ভাল। আমি তোমার কথা মনযোগ সহকারে শুনছি।

হযরত আমর ইবনে আস (রা.) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি বলতে চাচ্ছি, আত্‌রাবুনের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত।

উমর (রা.) বললেন, ইবনে আস! আমরা যে বিশাল বিসৃত অঞ্চল পদানত করেছি, তাকি তুমি যথেষ্ট মনে করছো না?

হযরত আমর ইবনে আস (রা.) বললেন, আপনার নির্দেশ শিরধার্য। কিন্তু আমরা যদি আতরাবুনকে কোথাও দাঁড়ানোর সুযোগ দেই তাহলে নিঃসন্দেহে একদিন সে ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ বাহিনী তৈরী করে আবার আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হিরাক্লিয়াস আর আতরাবুন এক ইবলিসের দুই নাম। আতরাবুনের মাথায় এতো কূট-কৌশল ও বুদ্ধি রয়েছে যে, সে ফিলিস্তিন ও আরবের খ্রিস্টানদের বিদ্রোহের জন্য উসকে দিতে পারে। মিসরে সে এ জন্যই গিয়েছে। তাই আমাদের উচিত, তাকে স্থির হয়ে কোথাও দাঁড়াতে না দেয়া। আপনার অনুমতি হলে আমি মিসর আক্রমণের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত আছি।

উমর (রা.) বললেন, হে ইবনে আস! শুধু আত্‌রাবুনের প্রতিই তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করো না। তুমি কি দেখছো না, আমি কিসরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। শামেও রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে। যদি আমরা আবার সুদূর

মিসরে আরেকটি যুদ্ধ ফ্রন্ট খুলি তাহলে হয়তো ইরান ও রোমে আমাদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে।

আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর সাথে হযরত আমর ইবনে আস (রা.)-এর আলোচনা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। বরং তিনি মিসরের ইতিহাস তার সামনে তুলে ধরলেন। কুরআনের যে সব আয়াতে মিসরের আলোচনা এসেছে তা পাঠ করে শুনালেন। বনী ইসরাইল আর মূসা (আ.)-এর কথাও আলোচনা করলেন। মূসা (আ.) আর ফেরআউনেরও আলোচনা করলেন। কিভাবে আল্লাহ্ মূসা (আ.)-এর জন্য সাগরের মাঝে পথ করে দিলেন আর ফেরআউন তাতে নিমজ্জিত হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হল। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথাও আলোচনা করলেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.) নিরবে হযরত আমর ইবনে আস (রা.)-এর কথা শুনে যেতে লাগলেন। এসব কথা উমর (রা.)-এর অজানা নয়। কিন্তু তিনি হযরত আমর ইবনে আস (রা.)-কে থামিয়ে দেননি। তিনি বুঝতে চেষ্টা করছেন, কোন নিয়তে, কোন উদ্দেশ্যে আমর ইবনে আস (রা.) মিসর আক্রমণ করতে চাচ্ছেন। তিনি কি নিজের জন্য একটি রাজত্ব কায়েম করতে চাচ্ছেন, না এ কারণে মিসর আক্রমণ করতে চাচ্ছেন যে, মিসর ছাড়া ইসলামী খেলাফতের পরিধি অপূর্ণ থেকে যায়!

তিনি আরব বিশেষভাবে হিজাজের অধিবাসী ও মিসরের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কের কথাও আলোচনা করলেন। তিনি আরো বললেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) আরবদের পূর্বপুরুষ। আর তার মাতা হাজেরা ছিলেন মিসরের অধিবাসী। হযরত ইসমাঈল (আ.) জুরহুম গোত্রের এক সতীসাধ্বী মেয়েকে বিয়ে করেন। তার বারটি সন্তান হয়। এ বারজনই আরবদের পূর্ব পুরুষ। সুতরাং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর নানার বাড়ি মিশর হওয়ার কারণে মিসরের সাথে আরবদের নাড়ীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

তিনি বললেন, মিসরকে নিয়ে রোম ও পারস্য সম্রাট যুদ্ধে নিপতিত হল। দীর্ঘ যুদ্ধের পর ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে মিসরে ইরানীরা রোমানদের পরাজিত করল এবং নয় বৎসর তারা শাসন করল।

রোমে তখন হিরাক্লিয়াসের উত্থান হল। সে ইরানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল এবং মিসর ও শামকে ইরানীদের থেকে মুক্ত করে নিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে পূর্বেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, রোমানরা শীঘ্রই ইরানীদের উপর বিজয় লাভ করবে। প্রিয় নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

ষষ্ঠ হিরজীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরণ করেন। ইরান সম্রাট, রোম সম্রাট, হীরার শাসক, গাসাসানের শাসকের সাথে মিসরের শাসক মুকাউকিসের নিকটও ইসলাম গ্রহণের আহবানসহ পত্র প্রেরণ করেন। হাতিব (রা.) এ পত্র নিয়ে মিসরে গিয়েছিলেন।

মিসরের বাদশাহ মুকাউকিস রাসূলের পত্র অত্যন্ত আদবের সাথে গ্রহণ করেছিলেন ও মনোযোগের সাথে পাঠ করেছিলেন। রাতে বাদশাহ মুকাউকিস হযরত হাতিব (রা.)-কে একাকী নির্জনে ডাকলেন। অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে বসালেন। বললেন, আমাকে আপনার রাসূল সম্পর্কে কিছু বলুন। হাতিব (রা.) রাসূল (সা.)-এর গুণাবলী বর্ণনা করলেন এবং বিশ্বাসযোগ্য কিছু প্রমাণও উপস্থাপন করলেন।

সবকিছু শোনার পর মুকাউকিস বললেন, আমি জানি, একজন নবীর আগমনের সময় হয়ে গেছে। তবে আমার ধারণা ছিল তিনি শামে আত্মপ্রকাশ করবেন। কারণ ইতিপূর্বে প্রায় সব নবীই শামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এখন দেখছি এ নবী এক ভয়াবহ মরুর বুকে জন্মলাভ করেছেন। আমি যদি এ নবীকে গ্রহণ করে নেইও তবে মিসরীরা কিন্তু তাকে গ্রহণ করে নিবে না। শোন, এ কিন্তু তোমার ও আমার মাঝে একান্ত আলাপচারিতা। কেউ যেন তা জানতে না পারে। তবে আমার বিশ্বাস, এ দেশও তোমাদের নবীর পদানত হবে। তোমাদের নবীর অনুসারীরা মিসরে পদার্পণ করবেন। মিসর পদানত করবেন। তুমি কিন্তু মিসরবাসী কারো নিকট এ সম্পর্কে কোন আলোচনা করবে না।

সেদিন রাতে আর মুকাউকিসের চোখে ঘুম আসেনি। দুগ্ধফেনলিভ সুকোমল বিছানায় শুতেই তার মাথায় বিভিন্ন চিন্তা এসে ভীড় করল। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তাকে অস্থির করে তুলল। প্রতিশ্রুত নবী সম্পর্কিত আলোচনাগুলো একে একে তার চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল।

পরদিন সকালে মিসরের বাদশাহ মুকাউকিস আবার হাতিব (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। একেবারে পাশে বসালেন এবং আরবী ভাষায় একটি চিঠি লিখে তাঁর হাতে দিলেন। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন ঃ

"আব্দুল্লার পুত্র মুহাম্মদের প্রতি মিসরের বাদশাহ মুকাউকিসের সালাম। আমি আপনার পত্র পাঠ করেছি। আপনি যা কিছু তাতে লিখেছেন এবং যার দাওয়াত দিয়েছেন তা বুঝেছি। আমি জানতাম, একজন নবী সমাগত। তবে আমার ধারণা ছিল, সে নবী শামে আত্মপ্রকাশ করবেন। আমি আপনার দূতের যথাযোগ্য ইহতেরাম করেছি। আর আপনার খেদমতে দুই মিসরী যুবতী পাঠালাম। তাঁরা মিসরের উঁচু খান্দানের মেয়ে, আর আপনার আরোহণের জন্য একটি উন্নত জাতের খচ্চর উপহার পাঠালাম।"

এই দুই যুবতীর একজনের নাম মারিয়া কিবতিয়া। তাঁকে রাসূল (সা.) স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা মিসরীদের সাথে ভাল আচরণ করবে। তোমাদের উপর তাদের দাবী আছে। তাদের সাথে তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে।

আমর ইবনে আস (রা.) আরো বললেন, মিসরীরা খ্রিস্টান। কিন্তু তারা একটি ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আছে। রোমান সাম্রাজ্যে এ ধরনের অনেক খিস্টান উপদল রয়েছে। এরা প্রায়ই একে অপরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসও খ্রিস্টান। সে মিসরীয়দের ও অন্যান্য উপদলের ঘোর বিরোধী। সম্রাট হিরাক্লিয়াস বিভিন্ন দল উপদলের আলাদা বিভিন্ন আকীদা বিশ্বাসকে সমন্বয় করে একটি রাষ্ট্রীয় ধর্ম উদ্ভাবন করেছিল। সবাইকে সে ধর্ম মানতে বাধ্য করত। মিসরের রাজধানী ইস্কান্দারিয়ার প্রধান পুরোহিত কীরসকে এ কাজের জন্য দায়িত্ব দেয়া হল। তাকে অধিকার প্রদান করা হল, সে যে কোন প্রকারে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও খ্রিস্টানদেরকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম মানতে বাধ্য করবে।

সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ভয়ে সকল দল উপদলের হৃদয় চুপসে গেল। তাদের আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেল না। তবে মিসরীয়রা হিরাক্লিয়াসের চাপিয়ে দেয়া খ্রিস্ট ধর্মকে মেনে নিল না। কীরস তাদের উপর নির্মম নির্যাতন শুরু করল। হিংস্রতায় কীরস পশুকেও ছাড়িয়ে গেল। প্রায় দশ বৎসর যাবৎ মিসরীয়রা ধর্মের নামে নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করছে। তাদের কোন আশ্রয়দাতা ছিল না। সমবেদনা জানানোর মতও তাদের কেউ ছিল না।

আমর ইবনে আস (রা.) বললেন, এই নিপীড়িত নির্যাতিত মিসরবাসীদের রক্ষার দায়িত্ব কাদের? নিশ্চয় আমাদের।

তারপর আমর ইবনে আস (রা.) মিসরের অপরিসীম ধন-সম্পদ, মহামূল্যবান পাথর, মূল্যবান ধাতুর অসংখ্য খনি ইত্যাদির সবিস্তারিত আলোচনা করলেন। বললেন, আল্লাহ্র জমীন থেকে উৎসারিত এ সকল সম্পদ রোম সম্রাটের প্রাসাদে চলে যায়। অথচ সাধারণ জনগণ ক্ষুৎ-পিপাসায় হাড্ডিসার হয়ে ধুকে ধুকে মরছে। শ্রমজীবীরা সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সামান্য রুটি রুজীর ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাদের শ্রমের সকল ফসল চলে যায় শাহী প্রাসাদে।

আমর ইবনে আস (রা.)-এর কণ্ঠ এবার আবেগাপ্লুত হয়ে উঠল। বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমার হৃদয় বলছে, নীল নদীর দেশ মিসর আমাদের ডাকছে। আমিরুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে আমার এক ব্যক্তিগত ঘটনা শুনাতে চাই। যে বিষয়টিকে আমি আল্লাহ্র ইঙ্গিত মনে করি—

তখন ছিল রোমানদের রাজত্ব। মিসরের শাসক ছিল তারাই। আমি ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে বাইতুল মুকাদ্দাস গেলাম। একদিন কাফেলার উট চড়ানোর দায়িত্ব আমার উপর এসে পড়ল। আমি উট নিয়ে দূরের এক চারণভূমিতে গেলাম। আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে ঘটনাটি আপনাকে বলছি।

আমি উটগুলোকে চারণভূমিতে ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে এক গাছের ছায়ায় বসে ছিলাম। তখন পাহাড়ের গাত্র বেয়ে এক খ্রিস্টান নেমে এল। পিপাসায় প্রায় অর্ধমৃত। আমি তাকে পানি দিলাম। সে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল। তার নাম ছিল শাম্মাস। পানি পানের পর সে অদূরে এক গাছের ছায়ায় গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পরে রইল। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, এক বিষাক্ত সাপ তার দিকে ছুটে যাচ্ছে! আমার হাতে ছিল তীর ধনুক। আমি সাথে সাথে তীর ছুড়ে মারলাম। সাপটি মরে গেল। ঘুম ভেঙ্গে শাম্মাস সব শুনে হতবাক। বিস্ময়াবিভূত। সে আমাকে তখন ছাড়ল না। সাথে করে মিসরে নিয়ে গেল। সে ছিল মিসরের রাজধানী ইস্কান্দারিয়ার অধিবাসী। রাজ পরিবারের সাথে তার গভীর সখ্যতা ছিল। তখন মিসরে এক রাজকীয় আনন্দানুষ্ঠান ছিল। শাম্মাস আমাকে সে অনুষ্ঠানে নিয়ে গেল। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে আমি দেখলাম, এক পাদ্রীর হাতে একটি স্বর্ণের বলয়। সে চোখ বন্ধ করে তা উপরে ছুঁড়ে মারছে। বলয়টি ঘুরতে ঘুরতে কারো মাথায়, পিঠে বা অন্য কোন অঙ্গে পড়ছে।

আমি শাম্মাসকে এর রহস্য জিজ্ঞেস করলাম। শাম্মাস বলল, এ ধরনের উৎসবে ঐ পাদ্রি চোখ বন্ধ করে স্বর্ণের এ বলয়টি নিক্ষেপ করে। নিক্ষিপ্ত বলয়টি যার বাহুতে গিয়ে পড়বে সেই পরবর্তীতে মিসরের বাদশাহ হবে।

আরো কয়েকবার বলয়টি নিক্ষেপ করার পর হঠাৎ তা আমার বাহুতে এসে পড়ল। সাথে সাথে সবাই হর্ষধ্বনী দিয়ে উঠল। অনেকে হাত তালি দিল। রাজপরিবারের লোকেরা আমার পরিচয় জানতে চাইলে শাম্মাস বলল, এর নাম আমর ইবনে আস। আরবের মক্কা নগরীর অধিবাসী। সাথে সাথে চারদিক থেকে ঠাট্টা মশকরা আর বিদ্রূপের আওয়াজ ভেসে আসল। বাহ্ বাহ্ দেখ, এ বামন নাকি মিসরের বাদশাহ হবে! ভারি চমৎকার কথা! সেদিন এ ধরনের অনেক বিদ্রূপ আমি শুনেছিলাম।

এ ঘটনা শোনানোর পর আমর ইবনে আস (রা.) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার মাথায় কখনো এ ধরনের চিন্তা আসেনি যে, সেই বলয়টির কারণে আমি একদিন না একদিন মিসরের বাদশাহ হব। রাজত্ব তো আল্লাহ্র। তবে আমার ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা আমি মিসরে আল্লাহ্র রাজত্ব কায়েম করব। আমি এখন আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছি।

হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে মনোযোগ সহকারে আমর ইবনে আস (রা.)-এর কথাগুলো শুনলেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন যে, মিসর বিজয়ের জন্য আমর ইবনে আস (রা.)-এর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ পাঠাতে হবে। কিন্তু তখনই কিছু বললেন না।

মদীনায় ফিরে এসে হযরত উসমান (রা.) ও আরো অনেকের সাথে পরামর্শ করলেন। কিন্তু কেউ মিসর আক্রমণের পক্ষে মত দিলেন না। সবাই বললেন, এতো দূরে আরেকটি বিশাল যুদ্ধের সামর্থ কি এখন আমাদের আছে!

দূরদর্শী উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)। তিনি আমর ইবনে আস (রা.)-কে নিরাশ করলেন না। তার মনোবল ভেঙে দিলেন না। তাকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় খোঁজ খবর ও তথ্য সংগ্রহের পরামর্শ দিলেন। বিভিন্নভাবে উৎসাহও প্রদান করলেন। কথার এক ফাঁকে বললেন, আচ্ছা, আমর ইবনে আস! শুনলাম মিসরের খ্রিস্টানরা নাকি এক লোমহর্ষক রেওয়াজ পালন করে আসছে। তারা বিশ্বাস করে, নীল নদী মাঝে মধ্যে পানি প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে মিসরবাসীদের নিকট ভোগ চায়। সে ভোগ হল কুমারী নারী বলীদান। আর তখন মিসরের লোকেরা একজন কুমারী নারীকে অপরূপা সাজে সুসজ্জিত করে নীল নদীতে নিক্ষেপ করে। আর তারপরই নদীতে পানি-প্রবাহ শুরু হয়। তাদের এই রেওয়াজ এমন আকার ধারণ করেছে যে, এখন তারা প্রত্যেক বৎসরই একজন কুমারী নারীকে এভাবে নদী বক্ষে নিক্ষেপ করে হত্যা করে। আর তারা এটা ধর্মীয় উৎসবের ন্যায় মহাসমারোহে পালন করে।

আমর ইবনে আস (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর কথা স্বীকার করলেন। বললেন, মানুষ সত্য ধর্মচ্যুত হলে নানা কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়ে। বাতিল ও অবাস্তব বিষয়কে আঁকড়ে ধরে আর সত্যকে অবজ্ঞার সাথে পরিহার করে। তবে আমার বিশ্বাস, মিসরীয়রা সত্যের সন্ধান পেলে সাথে সাথে তা গ্রহণ করবে। ইসলাম গ্রহণে তারা জড়তায় ভুগবে না। ফলে তাদের কুসংস্কার আর মিথ্যা রোসম-রেওয়াজ চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে যাবে।

* * *

আলেপ্পো নগরীর পতনের পরে সিপাহ সালার আবু উবায়দা (রা.) নগরীতে এলেন। খ্রিস্টান কবীলার সর্দারদের সাথে আলোচনা করলেন। সর্দাররা অকপটে স্বীকার করল যে, তারা মারাত্মক ভুল করেছে। সে ভুলের যথপোযুক্ত শাস্তিও তারা পেয়েছে। সর্দাররা বলল, দুই রোমান সালারের নেতৃত্বে তারা বিদ্রোহ করেছিল। তারাই তাদেরকে বিদোহে উস্কানী দিয়েছিল। ইতিপূর্বে আবু উবায়দা (রা.) শারীনার স্বামী হাদীদ ইবনে মু'মিনের থেকে শুনেছে, রোমান সালার

আন্তোনীস ও রূতাস খ্রিস্টান কবীলার লোকদের বিদ্রোহে উৎসাহিত করেছিল। হাদীদ আরো বলেছে, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের এক স্ত্রী ও তার এক যুবক পুত্রও পালিয়ে এসেছিল। তারাও এ বিদ্রোহে শামিল হয়েছিল।

সিপাহ সালার আবু উবায়দা (রা.) বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। পরক্ষণে উদ্বেলিত কণ্ঠে বললেন, রোমান সাম্রাজ্য ছিল এক বিশাল মহীরুহ। এখন তার নিঃশেষের সময় এসে গেছে। দেখ কিভাবে তার ডালপালাগুলো ভেঙে ভেঙে চারদিকে পড়ছে। এক রোমান সালার বিদ্রোহ করে চলে এসেছে। তার সাথে এসেছে সম্রাটের এক স্ত্রী ও তার পুত্র। তারা একটি নতুন সাম্রাজ্য গড়ার জন্য এসেছিল। তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। এভাবে রোম সাম্রাজ্যের সকল ডালপালা ভেঙে পড়বে আর পানির অভাবে তার শীকড় শুকিয়ে যাবে।

সিপাহ সালার আবু উবায়দা (রা.) কিছুদিন আলেপ্পা নগরীতে থাকার পর হিমসে চলে এলেন। তিনি শামের একেকটি অঞ্চল একেকজন সালারের দায়িত্বে অর্পণ করেছেন। তারা সেখানে প্রশাসন সুবিন্যস্ত করে সাজাচ্ছেন। জননিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছেন। জিযিয়া সহ অন্যান্য কর আদায়ের সুব্যবস্থা করছেন। এভাবে দ্রুত শামের প্রশাসনিক কাঠামো সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় ভিত্তি পায়।

আলেপ্পা ও ইন্তাকিয়ার মাঝে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইলের ব্যবধান। এ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মাঝে মাঝে ঝোঁপঝাড় ঘন গাছগাছালী। মাঝে মাঝে বিস্তৃত উঁচু-নীচু টিলা। কোথাও খা খা মরুভূমি। পানি আর সবুজের কোন চিহ্ন সেখানে নেই। রোম সাগরের তীরে ইন্তাকিয়া শহর। বাণিজ্যিক জাহাজগুলো এখানেই এসে নোঙর করে। মালামাল নামায়। আবার নতুন মাল বোঝাই করে বিভিন্ন বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। মিসরের ইস্কান্দারিয়া বন্দরের অনেক জাহাজ এখানে আসে। এখানের জাহাজও ইস্কন্দারিয়ায় যায়। আলেপ্পা আর ইন্তাকিয়ার মাঝের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন মুসলমানদের দখলে। এখানে দু'চারটি ক্ষুদ্র কবিলা থাকলেও দূরে দূরে তাদের অবস্থান। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

আলেপ্পা বিজয়ের কিছুদিন পরের ঘটনা। যারা আলেপ্পা থেকে ইন্তাকিয়ায় গিয়েছে বা ইন্তাকিয়া থেকে আলেপ্পায় এসেছে তারা বলেছে যে, শহরের বাইরে ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়ে ভরা এলাকায় ডাইনী বদরূহ দিশেহারা হয়ে ঘুরছে। মাঝে মাঝে সে চিৎসার করে উঠে আর দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলে। লোকেরা তার আওয়াজ শুনে দ্রুত পালিয়ে যায়।

একদিন এক মুসাফির আলেপ্পা শহরে এসে এক সরাইখানায় উঠল। তার চেহারায় ভয়-ভীতি আর আতঙ্ক। সে স্পষ্টভাবে কথাও বলতে পারছে না। সরাইখানার সবাই বুঝল, লোকটি পথে ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছে। তারা তাকে হিম্মৎ দিল। সান্ত্বনা দিল। অভয় দিল। তারপর লোকটি বলল, আমি আমার গ্রাম থেকে

এক খচ্চরে চড়ে আলেপ্পায় আসছিলাম। এক ঝোপের পাশ দিয়ে আসার সময় একেবারে নিকট থেকে শুনতে পেলাম, কে যেন বলছে, "আমি তার খুন পান করব। সে আমার খুন ঝড়িয়েছে।" তারপরই আমি এক ভয়ঙ্কর চিৎকার ধ্বনি শুনতে পেলাম। সে চিৎকার নিঃসন্দেহে কোন মহিলার।

ঝোপঝাড় খুব ঘন ছিল। মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু টিলাও ছিল। তাই আমি কিছুই দেখতে পাইনি। ভয়ে আমার সারা শরীর কাটা দিয়ে উঠল। আমি দ্রুত খচ্চর চালিয়ে চলে আসতে চাইলাম। কিন্তু খচ্চর তো আর ঘোড়া নয়, সে ধীর লয়ে চলতে লাগল।

আমি একটি টিলার পাশ দিয়ে আসার সময় হঠাৎ দেখলাম, এক যুবতী মেয়ে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। অগোছালো চুল। ভারী সুন্দরী। জায়গায় জায়গায় তার কাপড় ছিঁড়ে গেছে।

ভয়ে আতঙ্কে আমার মরণ দশা। ভাবলাম, এ বিজন প্রান্তরে এ যুবতীর তো থাকার কথা নয়। নিশ্চয় সে কোন মৃত যুবতীর বদরূহ বা কোন ডাইনী হবে। মানুষের রূপ ধরে আমার নিকট এসেছে। আমি ভয়ে খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে পড়লাম। ডাইনীর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ালাম। একেবারে বিনীত কণ্ঠে বললাম, আমি এক গরীব মুসাফির। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের খাবারের সন্ধানে ব্যস্ত থাকি। আমাকে বলুন, আমি আপনার কি খেদমত করতে পারি। দয়া করে আমার কোন ক্ষতি করবেন না।

ডাইনী কোন কথা বলল না। সে সোজা খচ্চরের নিকট গেল। খচ্চরের কাঁধের সাথে বাঁধা এক থলেতে আমার কিছু খাবার ছিল। আর একটি মসকে কিছু পানি ছিল। সে খাবারের থলে আর মশকটি নিয়ে আমার সামনে এগিয়ে এল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, হিরাক্লিয়াস কোথায়?

আমি কাঁপতে কাঁপতে বললাম, আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে এতটুকু শুনেছি যে, মুসলমানদের সাথে পরাজিত হয়ে শাম থেকে পালিয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় গেছে তা বলতে পারি না। তবে মনে হয় সে মিশর গেছে। মিশরে এখনো তার বাদশাহী আছে। ইস্কান্দারিয়াতে তার একটি প্রাসাদও আছে। হয়তো সেখানেই চলে গেছে।

ডাইনী দাঁতে দাঁত পিষে বলল, আমি তাঁর খুন পান করতে যাচ্ছি। সে আমার খুন ঝরিয়েছে। সে আমাকে হত্যা করেছে। বল্ সে কোথায় আছে? অন্যথা আমি এখনই তোর খুন পান করব।

ভয়ে আমার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আমার মাসুম সন্তানদের আপনি এতীম বানাবেন না। আমি একজন গরীব মানুষ। রাজা

বাদশাদের খবর আমি কী জানব। যদি আপনি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন তাহলে তাঁর উসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দিন।

তারপর আর ডাইনী কিছু বলল না। খাবারের থলে আর পানির মশক নিয়ে চলে গেল। ঝোঁপ-ঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি আর দেরি করলাম না। খচ্চরের উপরে লাফিয়ে উঠে চলে এলাম।

এর কিছুাদন পর ইন্তাকিয়াতে দুই মুসাফির পৌঁছল। তাদের অবস্থাও ঐ মুসাফিরেরই মত। ভয়, ভীতি আর আতঙ্কে তারা শেষ হয়ে গেছে। তারা লোকদের বলেছে, অমুক পথ দিয়ে যেন কেউ না যায়। কারণ সে পথে এক ডাইনী হন্যে হয়ে ঘুরছে। মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর চিৎকার দিচ্ছে। ডাইনী বলছে, সে হিরাক্লিয়াসের খুন পান করতে যাচ্ছে। কারণ হিরাক্লিয়াস তার খুন ঝড়িয়েছে।

বাতাসের আগে আগে এ সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সবাই বিশ্বাস করে নিয়েছে, নিশ্চয় হিরাক্লিয়াস কোন যুবতীকে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করেছিল। এটা তারই বদরূহ। তবে কেউ এমন কথা বলেনি যে সেই বদরূহ কারো কোন ক্ষতি করেছে। বা কাউকে কোন ভয় দেখিয়েছে। সে যে মুসাফিরের সামনেই আত্মপ্রকাশ করেছে তার খাবার ও পানীয় নিয়ে গেছে।

এ অঞ্চলে যে ছোট ছোট দু'চারটি কবিলা বাস করে তারাও এ চিৎকারের আওয়াজ শুনেছে। কিন্তু কেউ তাকে কোন বস্তীতে প্রবেশ করতে দেখেনি। ভয়ে লোকেরা সন্ধার পর ঘরের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। সে শুধু মুসাফিরদের সামনেই আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তাদের খাবার ও পানীয় নিয়ে গেছে। যারা তাকে দেখেছে, সবাই বলেছে সে দারুণ সুন্দরী, তার মাথার চুল অবিন্যস্ত। গায়ের কামিছটি ময়লা ও শত ছিন্ন।

বিভিন্ন মুসাফিরের মুখ থেকে যা শোনা গেছে তাতে অনুমান হয়েছে যে, সে ইন্তাকিয়ার দিকে যাচ্ছে।

* * *

সে যাই হোক, বদরূহ হোক, ডাইনী হোক বা পাগল যুবতী হোক-ইন্তাকিয়ার আশেপাশে তার সংবাদ পৌঁছে গেছে। তারপর যখন লোকেরা শুনতে পেল যে, সে ইন্তাকিয়ার নিকটে এসে পৌঁছেছে, তখন চারদিকে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। রাতে ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মুসাফিররা তাদের যাত্রা মুলতবী করে দিল।

একদিন ইন্তাকিয়ার তিন চারজন খ্রিস্টান অধিবাসী মুসলমান সালারের নিকট গিয়ে বলল, বেশ কিছুদিন যাবৎ এক বদরূহ বা ডাইনীর কথা শহরের ঘরে

ঘরে আলোচিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে মানুষ শুনতে পেয়েছে, সে নাকি শহরের অতি নিকেট এসে পৌঁছেছে। ভয়ে এখন মানুষ সন্ধ্যার পর ঘরের বাইরে বেরোয় না। অনেকে সফরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

সেই প্রতিনিধি দলের বর্ষিয়ান লোকটি বলল, আমরা ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। আমরা জানি, জ্বীন, বদরূহ বা ডাইনীর সামনে মানুষ একেবারে দুর্বল। কোন মানুষ তার মুকাবিলা করতে পারে না। তবে মুসলমানদের কিছু আলেম আছেন যাঁরা অলৌকিক শক্তি বলে তাদের বশে আনতে পারে। তাই আমরা আপনার শরণাপন্ন হলাম।

প্রতিনিধি দলের কথা শুনে সালার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর তার শির দুলে উঠল। বললেন, হ্যাঁ, তুমি সত্য বলেছো। ইসলামে এমন শক্তি রয়েছে যা জ্বীন, বদরূহ ও ডাইনীদের সহজে কাবু করতে পারে। আসল কথা হল, মুসলমানরা বিশ্বাস করে, যে মারা যায় সে আর কখনো ফিরে আসে না। আর ডাইনী নামে কোন বস্তু পৃথিবীতে নেই। ইসলাম গ্রহণ কর, তোমার মাঝেও ঐ শক্তির সৃষ্টি হবে। তুমিও তখন নির্ভয়ে দৃঢ়তার সাথে ঐ বদরূহ বা ডাইনীর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে পারবে, তুমি কে? কি তোমার পরিচয়?

প্রতিনিধি দলের কথা শুনে ও চেহারা দেখে সালার বুঝতে পারলেন, এরা এ সূক্ষ্ম বিষয়টি বুঝবে না। সহজে মেনেও নিবে না। এত গভীর জ্ঞান তাদের নেই। তাই তিনি একজন মুজাহিদ বাহিনীর সাহসী অফিসারকে ডেকে পাঠালেন। নির্দেশ দিলেন, তুমি তোমার সাথে যে কয়জন মনে চায় মুজাহিদ নিয়ে যাও এবং এই যে বদরূহ বা ডাইনী যার আলোচনা শহরে ছড়িয়ে গেছে তার রহস্য উৎঘাটিত করো।

প্রতিনিধি দলের একজন বলল, মহামান্য সালার! আপনার ধর্ম ও বিশ্বাস সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। এ ব্যাপারে কিছু বলার অধিকারও আমার নেই। তবে আমার একটি অনুরোধ, আপনি আপনার অধিনস্তের কোন ক্ষতি করবেন না। হতে পারে, আপনার প্রেরিত সৈন্যদের দেখে তা অদৃশ্য হয়ে যাবে। আর যদি অদৃশ্য হয়ে না যায় তাহলে নিশ্চয় আপনার লোকেরা তাকে ধরতে গেলে তাদের ভীষণ ক্ষতি হবে। তাদের নিমিষে হত্যাও করে ফেলতে পারে।

সালার তার দুর্বল বিশ্বাসের কথা শুনে নির্বাক রইল। চেহারায় নির্ভিকতার আভা ফুটিয়ে তাদের আশ্বস্ত করতে চাইল। তারপর অফিসারদের বলল, যাও যে করেই হোক তাকে খুঁজে বের কর। যদি তোমাদের দেখে পালিয়ে যায় তাহলে তো কিছু করার নেই। আর যদি তোমরা তার নাগাল পাও, তাহলে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসো।

সেনা অফিসারটি নির্ভাবনায় এ দায়িত্ব নিজ জিম্মায় নিয়ে নিল। প্রথমে সে খোঁজ খবর নিল, এ বদরূহটি কোথায় কোথায় দেখা গেছে। অনেকে তিন চার জায়গার কথা বলেছে। তবে দু'জন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট জায়গার কথা বলেছে।

অফিসারটি বেশ কিছু সাহসী মুজাহিদ সাথে নিয়ে শহরের বাইরে চলে গেল। মুজাহিদদের চার পাঁচজন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে যে সব স্থানে ঝোঁপ ঝাড় রয়েছে, টিলা রয়েছে তার চারদিকে ছড়িয়ে দিল।

সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছে তার আলোক রশ্মি। ঠিক তখন মুজাহিদদের একটি দল ঝোঁপের আড়ালে চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পেল। বলছে, "আমি হিরাক্লিয়াসের খুন পান করতে যাচ্ছি।" এ দলটি আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র দলকে তাদের কাছে ডাকল। তারা ঝোঁপের চারদিক ঘিরে ফেলল। সামনে অগ্রসর হতে লাগল। তাদের অধিনায়ক বলে দিল, অন্তরে আল্লাহ্‌র দৃঢ় বিশ্বাস আর কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকবে। এভাবে চারদিক থেকে মুজাহিদ বাহিনী সামনে অগ্রসর হতে লাগল। তারা বারবার সেই চিৎকার ধ্বনি শুনতে পেল। মনে হচ্ছে, সে হেঁটে হেঁটে এক দিক থেকে অন্য দিকে যাচ্ছে।

তাদের অবরোধ একেবারে ছোট হয়ে এলে তারা দর্শকদের বর্ণনা মতই এক নারীকে দেখতে পেল। নারীটি তাদের দেখে ধীরে ধীরে পিছু হটে যাচ্ছিল। মুজাহিদদের অধিনায়ক আরো অগ্রসর হয়ে চিৎকার করে বলল, খবরদার! এক কদম লড়বে না! তারপরই বর্শা উঁচু করে তুলে ধরল। বলল, তুমি জ্বীন, বদরূহ বা ডাইনী হলে অদৃশ্য হয়ে যাও। আর যদি মানুষ হও তাহলে আত্মসমর্পণ করে চলে এসো। তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হবে না। আমরা তোমাকে ভয় পাচ্ছি না। তুমিও আমাদের ভয় পেয়ো না।

নারী চিৎকার করে বলল, আমাকে হিরাক্লিয়াস পর্যন্ত যেতে দাও। হিরাক্লিয়াস আমার খুন ঝড়িয়েছে। আমি তার খুন পান করব।

নেতৃস্থানীয় মুজাহিদ বলল, আমরা তোমাকে হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌঁছে দেব। তুমি জান,আমরা হিরাক্লিয়াসের দুশমন। আমরাও তাকে হত্যা করতে চাই। আমরা তোমার সাথে লোক পাঠাব। সে তোমার সাথে হিরাক্লিয়াসের নিকট যাবে, তারা তোমার ইচ্ছা পূরণে সহায়তা করবে।

মুজাহিদ অধিনায়ক ঘোড়া থেকে নামলেন, বর্শা হাতে ধীর পদবিক্ষেপে সামনে অগ্রসর হলেন। কথার তালে তালে তিনি একেবারে মেয়েটির কাছে পৌঁছে তার বাহু শক্ত করে ধরে বললেন, "আমাদের সাথে এসো। আমরা তোমার ইজ্জত আবরু রক্ষা করব।"

যুবতী কোন প্রতিবাদ করল না। কোন শক্তিও প্রয়োগ করল না। সুবোধের মত অধিনায়কের সাথ চলে এল। মুজাহিদ অধিনায়ক একেবারে তার ঘোড়ার নিকট চলে এল এবং যুবতীকে তার ঘোড়ায় বসিয়ে দিল। ঘোড়ার লাগাম ধরে চলতে লাগল। ইতিমধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল মুজাহিদ সমবেত হয়ে গেছে। তারা সারি বেঁধে অধিনায়কের পিছনে পিছনে চলছে। তারা দেখল, যুবতী অত্যন্ত সুন্দরী। অনেকে আশংকা করছিল, যে কোন মুহূর্তে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে উধাও হয়ে যাবে। কিন্তু না, সে ঘোড়ার পিঠেই বসে রইল।

* * *

সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। চারদিকে আবছা আবছা অন্ধকার ক্রমেই ঘনিভূত হতে শুরু করছে। সালারের দুশ্চিন্তা ক্রমেই উদ্বেগের আকার ধারণ করতে লাগল। নানা দুশ্চিন্তা তাকে পেয়ে বসল। ভাবছে, যদি এ কোন জ্বীন বা অন্য কিছু হয় তাহলে তো তাদের ক্ষতিও করতে পারে। আর হতে পারে এ সময় পর্যন্ত তারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইত্যাদি নানা দুশ্চিন্তায় তিনি যখন ঝিম খেয়ে বসে আছেন, ঠিক তখন প্রহরী এসে সংবাদ দিল, প্রেরিত অফিসার এক যুবতীকে গ্রেফতার করে এনেছেন। সালার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। হতবুদ্ধিতার রেশ কাটতে না কাটতেই অফিসারটি সেই যুবতীকে নিয়ে সালারের কক্ষে প্রবেশ করলেন।

ইতিমধ্যে শহরে এ সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। সবাই দৌড়ে এল ডাইনীকে দেখতে। সালারের কক্ষের সামনে মানুষের ভিড়। সালারকে বলা হল, লোকেরা তার কামরার সামনে ভিড় করে আছে। তারা দেখতে চায় কাকে মুজাহিদরা গ্রেফতার করে এনেছে। কেমন সেই ডাইনী। ইতিমধ্যে সালার বুঝে ফেলেছেন, ডাইনী বদরূহ বা জ্বীন কিছুই নয়, সে একজন মানুষ। এক যুবতী নারী। সালার বললেন, যে নেতৃস্থানীয় লোকেরা এ সংবাদ নিয়ে এসেছিল তাদের ডেকে এ কক্ষে নিয়ে এসো। নেতৃস্থানীয় আরো কেউ থাকলে নিয়ে এসো।

দশ বারজন নেতৃস্থানীয় লোক সালারের কামরায় প্রবেশ করল। সবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যুরতীর উপর। অথচ যুবতী নির্বিকার নিশ্চুপ! পিট পিট করে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে। ভাব লেশহীনভাবে বসে আছে।

সালার জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি?

যুবতী উত্তর দিল, আমার নাম ইউকেলিস।

কামরায় বসা লোকেরা কানাঘুষা করতে লাগল। একজন বলল, এতো পুরুষের নাম। এ ধরনের নাম রোমানরা রাখে।

যুবতী বলল, আমি ইউকেলিস। আর ইউকেলিস হল রোজী। ইউকেলিস জীবিত আছে আর রোজীকে হত্যা করে ফেলেছে।

সালার জিজ্ঞেস করল, রোজীকে কে হত্যা করেছে?

যুবতী উত্তরে বলল, হিরাক্লিয়াস। আমি হিরাক্লিয়াসকে হত্যা করতে যাচ্ছি। আমি তার খুন পান করব। তোমাদের কেউ পারলে আমাকে ঐ পথ দেখিয়ে দাও যে পথে গেলে আমি হিরাক্লিয়াসকে পাব।

সালার জিজ্ঞেস করল, তুমি কি মৃত মানুষের রূহ, না জীবিত মানুষ?

যুবতী বলল, ইউকেলিস আমার রূহ। ইউকেলিসের রূহ আমার মাঝে নিহিত রয়েছে।

সালার জিজ্ঞেস করল, তুমি কার মেয়ে? তোমার পিতার নাম কি? কোথা থেকে এসেছো? সে আর কিছু বলতে পারল না, যা কিছু বলল তা অর্থহীন। সালার বুঝে ফেললেন, এই যুবতীর বিবেক-বুদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। উন্মাদনা তাকে আরষ্ট করে রেখেছে।

* * *

সালার দারুণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। যুবতী নারী, ঠিকানা বলতে পারে না। নিকটাত্মীয় কেউ নেই। তা ছাড়া এ ধরনের রোগীর কোন চিকিৎসকও তার জানা নেই। কি করা যায়। আর এ কথা তো চিন্তাও করা যায় না যে,একজন যুবতী নারীকে পাগল জেনে তাকে ঘর থেকে বের করে দিবে।

মানুষের সামনে যুবতীকে উপস্থিত করার কারণে শহরবাসীদের মাঝে যে ভয় ও আতঙ্ক বিরাজমান ছিল তা দূর হয়ে গেল। সবাই জানল, আসলে কোন জ্বীন, বদরূহ বা ডাইনী নয়। একজন পাগলী যুবতী এ কাণ্ড ঘটিয়েছে। যদি যুবতী তার নামধাম ও ঠিকানা বলতে পারত তাহলে সালার তাকে তার পিতামামার নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারত। এ অবস্থায় যদি মুসলমান সালার না হয়ে কোন রোমান সালার হত তাহলে উন্মাদিনী ও পাগলিনী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাকে হত্যার নির্দেশ দিত। তারপর তার লাশ কোথাও ফেলে দিত। কিন্তু ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় কোন সালার বা অফিসারের কথা চলে না। বরং ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাদের চলতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাদের কোন ত্রুটি প্রকাশিত হলে তাদেরও শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়।

সালার রোজীকে তার সাথে তার বাড়িতে নিয়ে গেল এবং মহিলাদের হাতে তুলে দিয়ে বললো, একে গোসল করিয়ে ভাল কাপড় পরাও এবং খেতে দাও।

সালার ফিরে এসে শহরের সমবেত লোকদের মাঝে উপস্থিত হলেন।

সালার বললেন, আপনারা শহরের গণ্যমান্য মানুষ। আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন, আমি এখন কি করতে পারি। আমি এ যুবতী নারীকে ঘরেও

রাখতে পারছি না। আবার তাকে বাইরেও বের করে দিতে পারছি না। তার দেখাশুনা ও তার ইজ্জত আব্রুর হিফাজত করা আমাদের কর্তব্য। আমি তাকে কোন মুখলিস হামদর্দ ব্যক্তির নিকট অর্পণ করতে চাচ্ছি যে তাকে তার বাড়িতে রাখবে। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। হতে পারে সে ভাল হয়ে যাবে। ভালো হয়ে উঠলে সে তার পিতামাতার নামধাম বলতে পারবে। তখন একটা ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে।

সালারের কথার পর মজলিসে নিরবতা নেমে এল। টু শব্দটি পর্যন্ত নেই। তার অর্থ কেউ এ উন্মাদিনীর দায়িত্ব নিতে রাজী নয়। সে মজলিসে সবার পিছনে তিন ব্যক্তি বসে ছিল। তারা কানাঘুষা করে কি যেন বলছে।

তাদের একজন হামদর্দীর সাথে বলল, জনাব আমীর! আমরা তিনজন মিশর থেকে এসেছি। কাজ শেষে এখন আমরা ফেরার পথে। লোকমুখে শুনতে পেলাম, এক বদরূহকে ধরে আনা হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু মন ধরে রাখতে পারলাম না। দেখতে এলাম। বদরূহের জায়গায় এক উন্মাদিনীকে দেখতে পেলাম। আমরা নিশ্চিত এ যুবতী মুসলমান নয়। কোন খ্রিস্টান কবিলার মেয়ে। আমরা মিসরের খ্রিস্টান। যদি আপনি আমাদের বিশ্বাস করেন, তাহলে আমরা একে আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারি। আমরা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। ভাল হলে তাকে তার পিতামাতার নিকট পৌঁছে দিব। আর যদি সে শাদী করতে চায় তাহলে মিশরে তার শাদীর ব্যবস্থা করব। যুবতী নারী নিয়ে চলা ভারি বিপদ জেনেও আমরা পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলছি, যুবতীটি খ্রিস্টান আর আমরাও খ্রিস্টান। তাই তাকে আমরা আমাদের জিম্মায় নিতে চাচ্ছি। আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমরা তার দেখাশোনা ও চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করব।

উপস্থিত লোকদের তিন চারজন খ্রিস্টানের কথা সমর্থন করল। অন্যরাও মৌন সমর্থন দিল। ফলে সালারও এই ফয়সালাই করলেন। যুবতীকে তাদের নিকট সমর্পণ করার হুকুম দিলেন।

সালার জিজ্ঞেস করলেন, তবে যদি মেয়েটি তোমাদের সাথে যেতে না চায়, তাহলে কি হবে?

লোকটি বলল, মহামান্য আমীর! মেয়ের মাথায় কোন বুদ্ধি নেই। কল্যাণ অকল্যাণ কিছুই সে বুঝে না। তার মাথায় এ কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে যে, সে হিরাক্লিয়াসকে হত্যা করতে যাচ্ছে। আমি তাকে বলব, তুমি আমাদের সাথে চল, আমরা তোমাকে আমাদের সাথে রাখব। তারপর আমরা সবাই মিলে হিরাক্লিয়াসকে হত্যা করব।

তার কথা শুনে সবাই প্রীত হল। বুঝল, লোকটি দারুণ বুদ্ধিমান ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।

সালারের নির্দেশে যখন মেয়েটিকে আবার সালারের কামরায় আনা হল, তখন সে গোসল করে খেয়ে দেয়ে সুন্দর কাপড় পরিধান করে এসেছে। এবার তাকে দেখা মাত্র সবার চোখ স্থির হয়ে গেল। যেন রাজকুমারী, অপরূপ তার দেহলতা। মন কাড়া তার রূপ সুষমা। চেহারায় নিষ্পাপ ভাব প্রকট হয়ে আছে। সালার মেয়েটিকে বলল, আমি তোমার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনজন লোক তৈরী করেছি, এরা তোমার সাথে থাকবে এবং হিরাক্লিয়াসকে হত্যা করবে।

সালারের কথা শুনে যুবতীর অবয়বে দ্বিতীয়ার চাঁদের ন্যায় ক্ষীণ সরু এক হাস্যরেখা ফুটে উঠল। খ্রিস্টান লোকটি তার সাথে মমতাভরা ভাষায় কথা বলল। যুবতী তাদের সাথে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেল।

সালার বললেন, আজ রাতে সে আমার বাড়িতে মহিলাদের সাথে থাকবে। আগামীকাল ফজরের নামাযের পরই তাকে খ্রিস্টান লোকটির নিকট অর্পণ করা হবে। তারপর সে তাকে নিয়ে মিসর চলে যাবে।

* * *

ফজরের নামাযের পর সালার মসজিদে বসে কুরআন তিলাওয়াত করেন। ইশরাকের নামায শেষে বাড়িতে পৌঁছে দেখেন, খ্রিস্টান সেই তিন লোক তার অপেক্ষায় দহলিজে বসে আছে। সালার মেয়েটিকে তাদের নিকট সমর্পণ করে দিলেন। তারা তাকে নিয়ে চলে গেল। ইন্তাকিয়া থেকে ইস্কান্দারিয়া যাওয়ার পথ দু'টি। স্থল পথ ও সমুদ্র পথ। তারপর দিনই ইস্কান্দারিয়ার উদ্দেশ্যে একটি জাহাজ ইন্তাকিয়া ছেড়ে চলে গেল। সে জাহাজেই তারা রোজীকে নিয়ে মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা দিল।

রোজীর কথার মাঝে একটি প্রতিজ্ঞাই বার বার ফুটে উঠছে। সে হিরাক্লিয়াসকে হত্যা করে তার খুন পান করবে। খ্রিস্টানরা তাকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিল। তার মন মতই তার সাথে আচরণ করতে লাগল।

রোম সাগরের বুক চিরে জাহাজটি ছুটে চলছে। চারদিকে পানি আর পানি। পানির জগত। মাঝে মাঝে পাল তোলা জাহাজের সমাগম। সকালে মনে হয় পানির বুক থেকে আগুন ছড়িয়ে সূর্য আকাশে উঠে আসছে। আর সন্ধ্যায় মনে হয়, ক্লান্ত সূর্য বিষণ্ন মুখে আবার পানির বুকেই আত্মবিসর্জন দিচ্ছে। দিগন্তের দিকে দৃষ্টি ফেললে মনে হয়, আকাশ আর পানির অপূর্ব মাখামাখি। দৃষ্টিনন্দন মিলন।

রাতে রোজী ঘুমিয়ে পড়লে খ্রিস্টান তিনজন জাহাজের ছাদে চলে যায়। গল্পগুজব করে। তারপর ঘুমায়। একদিন তাদের একজন অপরজনকে বলছে, বন্ধু হোরশীছ! আমার তো বিশ্বাস, তোমার মেয়ে এ যাত্রায় বেঁচে যাবে। মনে হয় এ মেয়েটি কুমারী।

হোরসীছ বলল, আমারও তাই মনে হয়। আমি তো নিজেকে নিরূপায় ভেবে এ মর্মান্তিক আঘাতের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছিলাম। মানসিক প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম যে মেয়েটিকে নীল নদে বিসর্জন দিব। খোদার খাস মেহেরবানীতে এ যুবতীকে পেয়ে গেলাম। যদি ধর্মীয় গুরু এ মেয়েকে কবুল করে নেন তাহলে কঠিন কষ্ট থেকে বেঁচে যাব।

অন্য সাথী বলল, তুমি বেঁচে যাবে। নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্‌র সাহায্য পেয়েছো। তুমি বড়ই ভাগ্যবান।

রোজীকে পেয়ে হোরশীছের এক বিরাট বিপদ কেটে গেছে। এ ছিল তার এক অসহনীয় মসীবত। মুসলমানদের সালার ইন্তাকিয়ার আমীর একটুও সন্দেহ করতে পারেনি যে, এ খ্রিস্টানরা মানবতার নামে, হামদর্দীর নামে তাকে ধোঁকা দিয়ে রোজীকে নিয়ে গেল।

মিসরের খ্রিস্টানদের প্রথা ছিল, তারা প্রত্যেক বৎসর এক নির্দিষ্ট রাতে নীল নদীতে একজন কুমারী যুবতীকে অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত করে নদী বক্ষে বিসর্জন দিত। পিতামাতার সন্তুষ্টচিত্তেই ধর্মীয়গুরু তা পালন করত। কখনো কোন মেয়েকে জোর জবরদস্তি করে নদী বক্ষে নিক্ষেপ করা হত না।

পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক কবিলা থেকে একজন কুমারী যুবতীকে বিসর্জন দেয়া হত।

এ বৎসর যে কবিলার জিম্মায় বিসর্জনের পালা পড়েছে সে কবিলায় শুধুমাত্র হোরশীছেরই একমাত্র যুবতী কুমারী মেয়ে আছে। আর কারো নেই। হয় বিয়ে হয়ে গেছে, নয়তো অল্প বয়সী। ধর্মীয়গুরু হোরশীছকে ডেকে জানিয়ে দিয়েছে, এ বৎসর তার মেয়েকে বিসর্জন দিতে হবে। হোরশীছের একমাত্র সন্তান তার এ মেয়ে। মেয়েটিকে সে হৃদয়ভরা মমতা দিয়ে বড় করে তুলেছে। এ কথা সত্য, তার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ছাড়া মহাপাদ্রী তার মেয়েকে বিসর্জন দিতে পারবে না। তবে হোরশীছের পক্ষে মহাপাদ্রীর নির্দেশ অমান্য করাও সম্ভব নয়। এ সংবাদ শোনার পর হোরশীছের স্ত্রীর মাতম শুরু হয়ে গেছে। খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ। দিনরাত শুধু কান্না আর কান্না। এই সুখী পরিবারটিতে নরকের অশান্তি নেমে এল। এদিকে হোরশীরের মেয়েও আত্মবিসর্জনে নারাজ। পরিশেষে হোরশীছ সিদ্ধান্ত করল, সে গীর্জায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবে, তার মেয়ের শাদী না হলেও সে কুমারী নয়। সে মহাপাপী। তাই তাকে নীল নদে বিসর্জন দিয়ে নীল নদের পবিত্রতা সে নষ্ট করতে পারে না।

হোরশীছ ও তার স্ত্রী-মেয়ে কঠোর ভাষায় বলে দিয়েছে, সাবধান! আমরা যা বলি তাতেই তুমি অবিচল থাকবে। এতে আমাদের পরিবারের কবিলার ইজ্জত হানী হলে হোক তাতে কোন পরোয়া নেই।

মিসরের খ্রিস্টানদের এ বিশ্বাস ছিল অমূলক। নীল নদের পানি প্রবাহের সাথে যুবতী বিসর্জনের কোন সম্পর্ক ছিল না। সম্রাট হিরাক্লিয়াস যে রাষ্ট্রীয় খ্রিস্ট ধর্মের প্রচলন করেছিল তাতে এ ধরনের যুবতী বিসর্জন ছিল মারাত্মক অপরাধ। এ অপরাধ মানব হত্যার মতই গুরুতর। তাই মিসরের খ্রিস্টানরা তাদের প্রথা দিনে পালন না করে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি করত।

এখনো বিসর্জনের দু'তিন মাস বাকি। হোরশীছ ব্যবসার উদ্দেশ্যে দু'জন সাথীর সাথে ইন্তাকিয়ায় গিয়েছিল। ইন্তাকিয়ায় সব কাজকর্ম শেষ করে ফেরার পথে শুনতে পেল, নগরের আমীর এক বদরূহকে গ্রেফতার করে এনেছে। তাই সে তাকে দেখতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

* * *

হোরশীছ ব্যবসায়িক কাজ শেষ করে মিসরে ফিরে যাওয়ার জন্য জাহাজের অপেক্ষা করছে। অকস্মাৎ শুনতে পেল, ইন্তাকিয়ার শাসক এক বদরূহ প্রেতাত্মা বা ডাইনীকে গ্রেফতার করেছে। হোরশীছ তার অনুসন্ধিৎসু মনকে দমন করতে পারেনি। সাথীদের নিয়ে ইন্তাকিয়ার শাসকের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছে।

ইন্তাকিয়ার শাসক যখন জিজ্ঞেস করল, এ মেয়েটিকে কে তার বাড়িতে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত? তখন, হোরশীছের মাথায় এক নব চিন্তার স্ফূরণ ঘটল। সে ফিস্ ফিস্ করে তার সাথীদের সাথে পরামর্শ করল। সাথীরা তার মতে সায় দিল। বলল, মেয়েটিকে নিয়ে নাও। এটি দিয়ে এবার কাজ সেরে দিব। তারা মেয়েটিকে সাথে নিয়ে নিল।

সমুদ্রের বুক চিরে জাহাজটি মিসরের দিকে ছুটে চলছে। সাঁ সাঁ রব তুলে ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছে আবার দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। শীতল বাতাসে প্রচুর জলজ গন্ধ। দিনের বেলা গাং চিলগুলো জাহাজের পাশে পাশে উড়ে। বেশ কিছুক্ষণ উড়ার পর আবার হারিয়ে যায়।

ফেরার পথে একদিন রাতে হোরশীছ ও তার সাথীরা রোজীকে জাহাজের ছাদে নিয়ে গেল। তার মনকে আকৃষ্ট করার জন্য সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে তারা কথাবার্তা শুরু করল। রোজীও তাদের সাথে খোলামেলা কথাবার্তা বলছে। সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে হত্যার বিভিন্ন কৌশল নিয়েও তারা আলোচনা করল। তাদের আলোচনায় রোজী অত্যন্ত উচ্ছসিত হল। উল্লাসে তার চেহারা চিক্ চিক্ করে উঠল।

কথার এক ফাঁকে হোরশীছ রোজীকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা রোজী, তুমি কি কুমারী?

উত্তরে রোজী বলল, হ্যাঁ। তারপরই তার কণ্ঠ একটু কঠিন শোনা গেল। বলল, মাতা মেরী যিনি হযরত ঈসা (আ)-কে জন্ম দিয়েছিলেন আমি তারই মত কুমারী। কিন্তু..... কিন্তু এ কথা কেন আমাকে জিজ্ঞেস করছো?

হোরশীছ মোলায়েম কণ্ঠে বলল, না, না। আমরা কোন সন্দেহ করছি না। তবে পূর্বপুরুষদের কাছে শুনেছিলাম যদি নিপীড়িত কুমারী নারী কোন জালিমকে হত্যা করে, তাহলে তার কোন পাপ হয় না। হিরাক্লিয়াসের চেয়ে জালিম শাসক এ দুনিয়ায় আর কে আছে?

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর একদিন জাহাজ মিসরের ইস্কান্দারিয়া বন্দরে এসে থামল। সে কী বিরাট বন্দর। জাহাজের পর জাহাজ বন্দরে নোঙর করে আছে। একের পর এক যাচ্ছে আবার একের পর এক আসছে। সর্বত্র হাট বাজারের মত মানুষের ভিড়। স্রোতের ন্যায় মানুষের যাত্রা প্রবাহ লেগেই আছে। মুসাফিররা একের পর এক নেমে যার যার গন্তব্যে চলে গেল। ইস্কান্দারিয়া থেকে দূরেই হোরশীছের বাড়ি। তারা একটি উট ভাড়া করে নিয়ে সন্ধ্যার পর বাড়িতে পৌঁছল।

পরদিন সকালে হোরশীছ তার সাথী দু'জনকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে গেল। সে গ্রামে তাদের অঞ্চলের সবচেয়ে বড় পাদ্রীর গীর্জা। গীর্জার পাশেই তার আলীশান কামরা। সে কামরায় তিনি সব সময় থাকেন। তারা গিয়ে সোজা পাদ্রীর কামরায় পৌঁছল। লোকটি সাদা ধবধবে শ্মশ্রুমণ্ডিত সুঠাম দেহের অধিকারী। চোখ দু'টি ছোট ছোট, পিট পিটে। ধুরন্ধরীর গন্ধ আসে তার চোখ থেকে। পাদ্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে কুশলাদি বিনিময় করল। ইন্তাকিয়া থেকে আনা কিছু উপঢৌকন তার পদপ্রান্তে রাখল। তারপর হোরশীছ তার কণ্ঠে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরশীলতা এনে বলল, বাবাজী মহাশয়! আমরা যখন ইন্তাকিয়ায় ঠিক তখন আমাদের সাথে এক মিসরী খ্রিস্টান ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ। আমাদের পেয়ে সে দারুণ আপ্যায়ন করল। তারপর যীশুর কসম দিয়ে বলল,আমি ব্যবসায় মার খেয়েছি। এখন প্রায় নিঃস্ব অবস্থা। অন্ন সংস্থান করাই দায় হয়ে পড়েছে। দুশ্চিন্তায় আকাশ ভেঙে পড়েছে আমার মাথায়। দিশেহারা হয়ে ছুটে গেলাম গির্জায়। চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ জপতপ করলাম। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে গেছি স্মরণে নেই। হঠাৎ দেখলাম, যীশু আমার সামনে উপস্থিত। চারদিক আলোতে উদ্ভাসিত। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছেন। আমি ভড়কে গেলাম। তিনি আরো খানিকটা এগিয়ে এসে বললেন, শোন, হে মিশরী! তোমার ঐ কুমারী কন্যাকে নীল নদীতে উৎসর্গ কর। তোমার ব্যবসায় উন্নতি হবে। নীলের অববাহিকায় বসবাসরত লোকদের আশীর্বাদ পবে। আবার তোমার সুদিন ফিরে আসবে।

হোরশীছের সাথী দু'জন তাকে সমর্থন করল। বলল, লোকটি তার কুমারী কন্যাকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। বলেছে, এ বৎসরই যেন তাকে নীল নদে উৎসর্গ করা হয়।

হোরশীছের কণ্ঠ একটু দৃঢ় শোনা গেল। বলল, এ বৎসরই তাকে নীলে উৎসর্গ করতে হবে। সে একটি আমানত। কিছুতেই আমরা তার খেয়ানত করতে পারি না।

পাদ্রী দু'চারটি কথা জিজ্ঞেস করার পর বলল, মেয়েটিকে আমার সামনে নিয়ে এসো।

পরদিন সকালে তারা রোজীকে পাদ্রীর নিকট নিয়ে এল। পাদ্রী আপাদমস্তক রোজীকে দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল। তুমি কি স্বেচ্ছায় এসেছো, না তোমাকে জোর করে আনা হয়েছে।

রোজী পাদ্রীর কথার আগাগোড়া কিছুই বুঝল না। বলল, আমি ইচ্ছে করেই এসেছি। রোজী তখনো অসুস্থ। চিন্তাশক্তি তার বিকল। ভালমন্দ কিছুই সে অনুধাবন করতে পারছে না। তবে পাদ্রীর সামনে বসে সে হাসল। বুদ্ধিমানের মত দু'চারটি কথা বলল। পাদ্রীর সকল সন্দেহ দূর হয়ে গেল। সে তাকে নীল নদে উৎসর্গ করার নির্দেশ দিয়ে দিল।

* * *

হোরশীছ ও তার স্ত্রী রোজীকে সীমাহীন আদর যত্ন করতে লাগল। তার কথার তালে তারা কথা বলে। তাকে সান্ত্বনা দেয়। প্রবোধ দেয় এবং বলে, শীঘ্রই হিরাক্লিয়াসকে হত্যার পরিকল্পনা করা হবে। তোমাকেই তাকে হত্যার দায়িত্ব দেয়া হবে। রোজীকে নীল নদে উৎসর্গের দিন এসে গেল। সন্ধ্যায় তাকে গীর্জায় নেয়া হল। আজ তাকে হোরশীছের স্ত্রী অপরূপ সাজে সজ্জিত করে দিয়েছে। মূল্যবান ঝলমলে কাপড় তার গায়ে। হোরশীছের মেয়ে সকল অলঙ্কার তাকে পরিয়ে দিয়েছে। যেন সে এক সাক্ষাৎ স্বর্গের অপ্সরী।

আজ থেকে দশ বার বৎসর পূর্বে নীল নদে কুমারী উৎসর্গ করার সময় চারদিকে ঘোষণা করা হত। দলে দলে লোক সমবেত হত। যে যুবতীকে উৎসর্গ করা হবে তারা তাকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করত। লাইন ধরে তার হাতে চুমু খেত। কিন্তু সম্রাট হিরাক্লিয়াস এ ধরনের উৎসর্গকে দণ্ডনীয় অপরাধ ঘোষণা করেছে। তার আইনে এটা হত্যাকাণ্ড। যাকে এ ধরনের কাজের সাথে জড়িত পাওয়া যাবে তাকেই মানব হত্যার শাস্তি ভোগ করতে হবে। সম্রাটের এ নির্দেশের পর প্রকাশ্যে আর কাউকে উৎসর্গ করা হয় না। তবে গোপনে রাতের অন্ধকারে তারা এ প্রথা পালন করে থাকে।

রাতের অন্ধকারে তারা রোজীকে জনবসতি থেকে দূরে নীল নদের তীরে নিয়ে গেল। হোরশীছ তাকে বলেছে, নদীতে একটি নৌকা রাখা আছে। সে নৌকা দিয়ে তাকে ইস্কান্দারিয়া নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই হিরাক্লিয়াসকে হত্যা করা হবে। সেখানে প্রধান পাদ্রী ছিল। কবীলার গণ্যমান্য কিছু লোকও ছিল।

পাদ্রী তার শরীরে সুগন্ধি পানি ছিটিয়ে দিল। বিড়বিড় করে কি কি সব মন্ত্র পাঠ করল। তারপর তার দুই কাধের উপর হাত রাখল। বিড়বিড় করে আরো কি যেন পাঠ করল। বাহু ধরে তাকে নদীর তীরে নিয়ে গেল। সেখানে তীর বেশ উঁচু ছিল। পাদ্রী পিছন দিক দিয়ে ধাক্কা মেরে রোজীকে নীল নদীর পানিতে ফেলে দিল। রোজী কোন কিছু বুঝার আগেই ঝুপ্ করে পানিতে পড়ে গেল।

চারদিক অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। পাদ্রী আর উপস্থিত লোকেরা সুর দিয়ে একটি ধর্মীয় আমেজের কবিতা আবৃতি করতে করতে চলে এল। যদিও নদী অত্যন্ত গভীর কিন্তু সেদিন স্রোত তেমন প্রবল ছিল না। নদী ছিল অনেকটা শান্ত।

রোজী কবিলার সর্দারের মেয়ে। দারুণ চঞ্চল আর চটপটে। তাদের পল্লীর পাশ দিয়েই বয়ে গেছে প্রবাহমান ফুরাত নদী। রোজী তার দু'তিনজন সখীকে নিয়ে প্রায়ই নদীতে নাইতে যেত। জলকেলী করত। পানি ছুড়াছুড়ি করত। সাঁতার কাটত। বয়স একটু বাড়লে রোজীর দৌরাত্মও বেড়ে গেল। সাঁতার কেটে কেটে সে মাঝ নদীতে চলে যায়। স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতার কেটে চলতে থাকে। উঁচু তীর থেকে ঝাঁপিয়ে নদীতে পড়ে। তার এই সাঁতার দক্ষতার কারণে সখীরা তাকে হাঁসী বলে ডাকত।

রোজীকে নীল নদীতে নিক্ষেপ করা হলে পানিতে পড়েই তার প্রথম আত্মরক্ষার চিন্তা এল। যে করেই হোক তাকে জীবনে বাঁচতে হবে। পানিতে পড়েই সে ভেসে উঠল না। পানির নীচ দিয়ে সাঁতার কেটে কেটে সে খানিক দূর চলে গেল। দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলেই সে পানির উপর ভেসে উঠল এবং নদীর অন্য পারের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল। অন্ধকারে কেউ তাকে দেখতে পেল না। তাছাড়া তাকে নদীতে ফেলে দিয়েই সবাই সুর দিয়ে কবিতা পাঠ করতে করতে চলে এসেছে।

রোজী এক রকম ভাসতে ভাসতে নদীর অপর পারে চলে এল। অন্ধকারে সে নদীর তীরে বসে হাঁপাতে লাগল। চারদিকে সে উদ্বিগ্ন ও ভীত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। তার মনে হচ্ছে যেন সে স্বপ্নের জগত থেকে হঠাৎ জাগ্রত হয়েছে। ইতিমধ্যে তার চিন্তাশক্তি ফিরে এসেছে। সে ভেবেই পাচ্ছে না, তার শরীরে এতো মূল্যবান অলঙ্কার এলো কোত্থেকে!

সেখানে বসেই সে চিন্তা করতে লাগল, এখন তার কি হবে? সে তার বাড়ি থেকে কোথায় চলে এসেছে তা ঠিক করতে পারছে না। তবে কি এটা ফুরাত নদী। কিন্তু এমন স্থান তো সে কোথাও কখনো দেখেনি।

তার চিন্তাশক্তি আরো স্বচ্ছ, আরো পরিচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল। ধীরে ধীরে তার যুদ্ধের কথা স্মরণ হল। রক্তাক্ত সে যুদ্ধ। তারপরই হঠাৎ তার মানস পটে ইউকেলিসের চেহারা ভেসে উঠল। রক্তাক্ত মুমূর্ষু ইউকেলিস। সাথে সাথে তার শরীরে কম্পন সৃষ্টি হল। তার মনে হল, শতে শতে লাশের মাঝে সে ইউকেলিসকে খুঁজছিল। তার আরো মনে এল, ইউকেলিসের লাশের পর সে ইউকেলিসের মায়ের লাশও দেখেছিল। তার মনে হল, এরপরই সে এক স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গিয়েছিল।

প্রচণ্ড মানসিক আঘাতের কারণেই রোজীর স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবে একেবারে উন্মাদ হয়ে যায়নি। অন্ধকারের মাঝে বসে সে উন্মুক্ত নির্মল আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। ধীরে ধীরে তার স্মৃতি শক্তি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে আসতে লাগল। হিরাক্লিয়াসের কথা স্মরণ হল। সে যে হিরাক্লিয়াসকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে ছিল তাও মনে পড়ল। মানুষ তাকে ডাইনী বা প্রেতাত্মা মনে করে ভয় করত। সে কারো সামনে এলেই সে ভয় পেত। সে মানুষের খাবার ও পানীয় নিয়ে নিত। এভাবেই সে বেশ কিছুদিন মরুভূমি আর ঝোঁপঝাড়ের মাঝে কাটিয়েছিল।

তারপর তার ঐ ব্যক্তির কথাও মনে এল, যে তাকে জাহাজে করে মিসর নিয়ে এসেছে। মনে এল তাকে দু'মহিলা নতুন কাপড় পরিয়ে অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে। বলা হয়েছে যে, হিরাক্লিয়াসকে হত্যা করার জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইউকেলিসের খুনের প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে এই ভেবে সে আনন্দিত ও বিমুগ্ধ ছিল। ধীরে ধীরে তার নিকট সবকিছুই তার মানসপটে ভেসে উঠল। সবকিছুই যেন সে বুঝতে পারল। কিন্তু তাকে কেন নদীতে ফেলে দেয়া হল এর কোন কারণ সে খুঁজে পেল না।

* * *

নিরব নিস্তব্ধ এই অন্ধকার রজনীতে ইউকেলিসের কথা স্মরণ হতেই অঝোর ধারায় তার চোখ দিয়ে অশ্রু নেমে এল। কিন্তু এখন তার প্রেমিক হারানোর বেদনা এমন তীব্র নয় যে, চিন্তাশক্তি বিকল হয়ে যাবে। সে এখন নিজেকে নিয়েই দারুণ চিন্তায় পড়ে গেল। একতো তার সাথে রয়েছে মূল্যবান অলঙ্কার। তার চেয়ে আরো বেশী মূল্যবান তার কুমারিত্ব।

অলঙ্কার না হয় লুকিয়ে রাখল কিন্তু নিজেকে, নিজের যৌবন আর রূপ শোভাকে কিভাবে লুকাবে! ভাবনার এক পর্যায়ে সে তার সকল অলঙ্কার খুলে ফেলল। যেন কোন ডাকাতের খপ্পরে না পরে। ভাবল, অলঙ্কারগুলো নদীতেই ফেলে দিবে। কিন্তু পরক্ষণেই বিদ্যুতের মত চমকে উঠল। ভাবল, না, এভাবে ফেলে দেয়া যায় না। বরং এগুলো দিয়ে কারো সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

অলঙ্কারগুলো কীভাবে লুকিয়ে রাখবে তা-ই ভাবছে। ঘাগড়ার মত এক প্রকার পোষাক তার গায়ে ছিল। সে জামার নিজের দিকের কিছু অংশ ছিঁড়ে তাতে অলঙ্কারগুলো বাঁধল। তারপর তা পুটলির মত বানিয়ে কাপড়ের নিচে বেঁধে নিল।

অর্ধরাত পেরিয়ে গেছে। সে অত্যন্ত ক্লান্ত। তার ভীষণ ঘুম পেয়েছে। নিকটে একটি বৃক্ষ। সে বৃক্ষের নিচে গিয়ে বসে পড়ল। তারপর ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেল।

* * *

ঘুম ভেঙ্গে গেল। তবুও ঘুমের আবেশে চোখ দু'টি তার লেগে আছে। মনে হচ্ছে, যেন তার চারপাশে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল। দেখল, তার চারপাশে বহু মানুষ জমায়েত হয়েছে। সবার চোখে রাজ্যের বিস্ময়।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? এখানে কেন পড়ে আছ?

রোজী বলল, সব বলব। তবে আমাকে আগে এমন এক বাড়িতে নিয়ে চল, যেখানে মহিলা আছে। আমি প্রবঞ্চিত হয়ে এখানে এসেছি। আমি নদী থেকে উঠে এসেছি।

রোজী বুঝল, এরা শ্রমিক ও নীচু শ্রেণীর মানুষ। পাপাচারী বা বদলোক নয়। যদি তেমন লোক হত তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু তামাশা দেখত না এখনো।

এক ব্যক্তি বলল, আমাদের বাবাজ্বী আসছেন। তিনি বলবেন, তোমাকে কোথায় নিতে হবে। তোমার ধর্ম কি?

রোজী বলল, আমি খ্রিস্টান।

সে লোকটি বলল, তাহলে ভয়ের কিছুই নেই। আমরাও সবাই খ্রিস্টান। মিসরী খ্রিস্টান।

রোজীও তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, আমিও মিসরী খ্রিস্টান।

একটু পরেই ঘোষণার মত একটু উঁচু কণ্ঠে একজন বলল, ভাইয়েরা! সরে দাঁড়াও। সরে দাঁড়াও। বাবাজ্বী আসছেন। সাথে সাথে সবাই পিছনে সরে এসে রাস্তা করে দিল। এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি রোজীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার চেহারা,

পোষাক, আর পদবিক্ষেপে মনে হয়, তিনি একজন উঁচু মর্যাদার লোক। রোজীকে দেখেই সে ভূত দেখার মত ভয় পেয়ে দু'কদম পিছিয়ে গেল। তারপর তার চেহারার রং এমন পরিবর্তিত হয়ে গেল যা লুকাবার নয়।

বাবাজ্বী বলল, আমি তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। সেখানে আমার স্ত্রী আছে, দু'মেয়ে আছে আর পুত্রবধূ আছে।

রোজী বলল, আমি এমন বাড়িতেই যেতে চাই যেখানে মহিলা আছে।

বাবাজ্বী তাকে সাথে করে নিয়ে গেল। রোজী চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল। একদিকে নীল নদী। যার তীরে ছোট বড় নৌকা বাঁধা আছে। আরো একটু দূরে পালতোলা বেশ কিছু নৌকা নোঙর করে আছে। কিছু নৌকা থেকে লোকেরা নামছে। আবার কিছু নৌকায় লোকেরা আরোহণ করছে। রোজী বুঝল, এটা নৌঘাট। এখান থেকে নৌকায় চড়ে লোকেরা দূরে দূরে যায়।

নদী থেকে আধমাইল দূরে একটি লম্বা গ্রাম। সেখানে ছোট ছোট ঝোঁপড়ির মত বাড়ি দেখা যাচ্ছে। কিছু কিছু ইট পাথরের নির্মিত বাড়িও আছে। এ গ্রামের অধিকাংশ মানুষই মৎসজীবী, জেলে বা মাঝি মাল্লা। এটা খ্রিস্টান পল্লী। ইতিমধ্যে গ্রাম থেকে নৌঘাটে মানুষের যাতায়াত শুরু হয়ে গেছে।

বাবাজ্বী গোত্রের সর্দার। মিসরী খ্রিস্টানদের নিকট সে এক উঁচু মর্যাদার ব্যক্তিত্ব। রোজীর সাথে কোন কথা না বলেই সে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে এল এবং একটি কামরায় তাকে বসতে দিল। তারপর বাড়ির নারীদের ডেকে রোজীর নিকট থেকে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত জানতে বললো। তারা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? কেন তোমার এ অবস্থা হল, তা তুমি সুস্পষ্ট করে বল।

রোজী মহিলাদের নিকট তার জীবন কাহিনী বিস্তারিত বললো। শোনাল কি মনোভাব নিয়ে সে ইন্তাকিয়ায় পৌঁছেছে। তারপর মিসরে এ স্থানে কিভাবে পৌঁছেছে।

বাবাজ্বী নিরবে সবকিছু শুনল। রোজী তার জীবনের বেদনাতুর কাহিনী শেষ করল। বাবাজ্বী তার স্ত্রীকে বলল, মেয়েটিকে গোসল করাও। নতুন কাপড় পরিয়ে দাও এবং খাবারের আয়োজন কর। তারপর সে রোজীর কাঁধে হাত রেখে নরম কণ্ঠে বলল, এ বাড়িটিকে তুমি নিজের বাড়ি মনে করবে। তোমাকে তোমার ঠিকানায় পৌঁছে দেয়া হবে। তারপর বাবাজ্বী বাইরে চলে গেল। এবং এক ব্যক্তিকে দু'তিনটি নাম বলে তাদের ডেকে আনার নির্দেশ দিল।

* * *

বাবাজ্বীর হাবেলী খুব শানদার ও প্রশান্ত। দেখলেই মনে হয় তিনি তার গোত্রের প্রধান সর্দার। রোজী অন্তঃপুরে চলে গেছে। বাবাজ্বী বাইরে বৈঠক খানায়

বসে আছে। ইতিমধ্যে তিনি যাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন তারা এসে গেছে। অত্যন্ত গুরু গম্ভীর ভাবে বাবাজ্বী তাদের দিকে তাকালেন। তাদের একজন বিস্মিত কণ্ঠে বলল, বাবাজ্বী! শুনলাম এক যুবতীকে একাকী পাওয়া গেছে?

বাবাজ্বী বলল, সে এখন আমার ঘরে। সে জন্যেই তো আমি তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি। তোমরা জান, গতরাতে নীল নদে এক যুবতীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। সে যুবতীই এই। সে মরেনি। জীবিত অবস্থায় নদী থেকে উঠে এসেছে। নীল নদ আমাদের উৎসর্গকে কবুল করেনি। আমাদের উপঢৌকন গ্রহণ করেনি। উগলিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। নীল আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। হয় তার প্রবাহ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে বা দুকূল ছাপিয়ে এমন বন্যা আসবে যা কেউ কখনো দেখিনি। ফলে আমাদের ফসলের জমি ভেসে যাবে। গ্রামগুলো তলিয়ে যাবে। চারদিকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে।

ভাগ্যক্রমে আমি গতকালের উৎসর্গ অনুষ্ঠানে ছিলাম। আর মেয়েটিকে দেখেছিলাম। আজ ভোরে আমি শুনতে পেলাম, এক মেয়ে নীল নদের তীরে ঘুমিয়ে আছে। তাকে দেখে মনে হয় সে নীল নদ থেকে উঠে এসেছে।

উপস্থিত এক ব্যক্তি বলল, এখন আমাদের কি কর্তব্য?

বাবাজ্বী বললেন, আমি কিছু বলতে পারব না। বড় পাদ্রী তা বলতে পারবেন। আমি এখন তার নিকটই যাচ্ছি। তোমাদের কেউ আমার সাথে চল। বড় পাদ্রীই সিদ্ধান্ত দিবেন, এখন আমাদের কী করতে হবে। আমরা কি পুনরায় মেয়েটিকে নীল নদে বিসর্জন দিব, না অন্য কোন মেয়েকে বিসর্জন দিতে হবে।

তবে আমার নিকট একটি বিষয় অস্পষ্ট, বিসর্জন দেয়ার সময় তার গায়ে অনেক অলঙ্কার ছিল। কিন্তু এখন তা দেখতে পাচ্ছি না কেন! হাতের আংটিটিও দেখছি না। আমি তাকে এসব কথা এ চিন্তা করে জিজ্ঞেস করিনি, যেন সে বুঝতে না পারে, আমি তাকে উৎসর্গ করার পূর্বে দেখেছি। তাহলে হয়তো সে বুঝে ফেলবে যে, তাকে আবার নীল নদে উৎসর্গ করা হবে। আর সে পালিয়ে যাবে।

বাবাজ্বী জানতেন না যে, রোজী অন্তঃপুরে তার অলঙ্কার বের করে দেখিয়েছে আর বলেছে, যে তাকে তার পিতামাতার নিকট পৌছে দিবে তাকে এ অলঙ্কার দেয়া হবে।

এক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে বাবাজ্বী বড় পাদ্রীর নিকট গেলেন। বড় পাদ্রী অন্যগ্রামে থাকেন। গ্রামটি বেশ দূরে। তারা ঘোড়া নিয়ে রওয়ানা হল। রাত্রের ক্লান্তি এখনো দূর হয়নি রোজীর শরীর থেকে। তাই গোসল করে নতুন কাপড় পরে খাবার গ্রহণ করা মাত্র তার চোখ জুড়ে নেমে এল রাজ্যের ঘুম।

* * *

সূর্য অস্তমিত হতে এখনো বেশ বাকি। বাবাজ্বী ফিরে এসে শুনতে পেল, রোজী এখনো বিছানায়। বাবাজ্বী তার স্ত্রীকে নির্জনে ডেকে নিয়ে বলল, বড় পাদ্রীর নির্দেশ আজ রাতেই তাকে সেই আগের স্থানে নিয়ে গিয়ে নীল নদে বিসর্জন দিতে হবে। এবার তার হাত বেঁধে বিসর্জন দিতে হবে। যেন সাঁতরে বেঁচে যেতে না পারে।

বাবাজ্বীর স্ত্রী বলল, মেয়েটির নিকট মূল্যবান বহু অলঙ্কার আছে। সে তা লুকিয়ে রেখেছিল।

বাবাজ্বী বললেন, এখনই মেয়েটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে দাও। অলঙ্কারগুলোও পরিয়ে দিবে। এখনই তাকে নিয়ে যেতে লোকেরা চলে আসবে। যাও,আর দেরি করো না।

স্ত্রী বলল, এক্ষুণি আমি তাকে তৈরী করে আনছি। আর কত ঘুমাবে। নীল নদের কোলেই সে চির শান্তির ঘুম ঘুমাবে।

একথা বলতে বলতে সে রোজীর কামরায় প্রবেশ করল। রোজী তখন সজাগ। সে কথাগুলো শুনে ফেলল।

বাবাজ্বীর স্ত্রী বৃদ্ধা। সে রোজীকে জাগ্রত করে সাজিয়ে দিতে লাগল। রোজী জিজ্ঞেস করল, তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে? উত্তরে বৃদ্ধা মহিলা এমন কিছু কথা অসতর্কভাবে বলে ফেলল যা দ্বারা রোজী বুঝে ফেলল যে, তাকে পুনরায় নীল নদে ফেলা হবে। সে বেঁকে বসল।

বাবাজ্বীকে সংবাদ দেয়া হল, রোজীকে অনেকভাবে বুঝানো হয়েছে, ফুসলানো হয়েছে। কিন্তু সে বেঁকে বসে আছে। এবার বাবাজ্বীর আশঙ্কা হতে লাগল, যদি সাম্রাজ্যের কোন অফিসার বা কর্মচারী এ সংবাদ জানতে পারে তাহলে তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে কয়েদখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করবে।

বাবাজ্বী বয়োবৃদ্ধ। জীবনে অনেক জায়গায় ভ্রমণ করেছে। ষোল ঘাটের পানি খেয়েছে। তাই সে কপট স্নেহের জাল ফেলে শিকার করতে চাইল। স্নেহে গদগদ কণ্ঠে বলল, আহা, আহা, মেয়েটি আমার যদি অলঙ্কার পরতেই না চায় তাহলে তাকে কেন তোমরা বিরক্ত করছো, তার অলঙ্কার পরার প্রয়োজন নেই। ওর অলঙ্কার ওর কাছেই থাকুক।

রোজীর কণ্ঠ একটু তীক্ষ্ণ ও শ্লেষে ভরা। বলল, এ অলঙ্কার আমার নয়। এগুলো আমি আমার কাছে রাখতেও চাই না। যার অলঙ্কার তাকে তা পৌঁছে দিন।

সূর্য তামাটে রং ছড়িয়ে পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। রোজীকে বাইরে আনা হল। সারাদিনেই

চারদিকে এ গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে, গতকাল এক মেয়েকে নীল নদে বিসর্জন দেয়া হয়েছিল। তাকে নীল গ্রহণ করেনি। উগলে দিয়েছে। আজ আবার তাকে বিসর্জন দেয়া হবে। নীলের বক্ষে তাকে ডুবে মরতেই হবে। অন্যথায় নীল ক্ষুব্ধ হয়ে, ধ্বংসলীলা শুরু করবে।

অনুসন্ধিৎসু জনতা সন্ধ্যার আগেই জমতে শুরু করেছে। একজন দু'জন করে অনেক মানুষ সমবেত হয়েছে। এ গ্রামের সবাই মিসরী খ্রিস্টান। এরাই সাম্রাজ্যের বিধান উপেক্ষা করে ধর্মের নামে এ বিসর্জন প্রথা আঁকড়ে আছে। প্রত্যেক বৎসর গোপনে তারা এ কাজ করে। তারা রোজীকে অত্যন্ত পবিত্র ও বরকতময় মনে করে দেখতে এসেছে। তারা জানে না যে, দাগাবাজী করে, প্রতারণা করে রোজীকে নীল নদে বিসর্জন দেয়া হচ্ছে। রোজীকে বাইরে আনা হলে লোকেরা তার হাত ও জামায় চুমু খেতে থাকে।

একটু দূরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা একটু উচ্চ কণ্ঠেই বলল, ঐ তো এসে গেছে। যাকে নীলের বুকে বিসর্জন দেয়া হবে সে এসে গেছে।

এ ধরনের আরো কিছু কথা রোজী নিজ কানেই শুনল। তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তাকে ধোঁকা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যে দু'ব্যক্তির হাতে বাবাজ্বী রোজীকে তুলে দিতে চায় রোজী তাদের সাথে যেতে রাজি হল না। তারা রোজীর দুই বাহু ধরে জোর করে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু রোজী শক্ত হয়ে দাঁড়াল। কিছুটা টানা হেঁচড়া হল। মানুষের মাঝে শোরগোল শুরু হল। তারা হয়তো ভিন্ন কিছু চিন্তা করেছে।

বাবাজ্বী এবার হাতের লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে এল। সবাই নিরব হয়ে গেল। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। বাবাজ্বী নির্দেশের সুরে বলল, একে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাও, নৌকায় তুলে মাঝ দরিয়ায় নিক্ষেপ করে এসো। দেরি করো না।

রোজী অসহায়। সে বসে পড়ল। লোক দু'টি তাকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করল। কিন্তু রোজী প্রাণপণে তাদের থেকে বাঁচতে চাচ্ছে।

* * *

হঠাৎ জনতার ভিড় ঠেলে তিন ব্যক্তি এগিয়ে এল এবং ঐ দু'ব্যক্তিকে পিছনে সরিয়ে দিল। রোজী চিৎকার করছিল। তাদের একজন রোজীকে উঠতে বলল। সে লোকটিকে দেখেই রোজী নিরব হয়ে গেল। তার চেহারার রং একেবারে পাল্টে গেল। তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। সে লোকটি এবার যে লোক দু'টি রোজীকে তুলতে চাচ্ছিল তাদের দূরে সরিয়ে দিল। তারপর রোজীর নিকট এগিয়ে এল।

রোজীর কণ্ঠে এক আকাশ বিস্ময়! মৃদু কণ্ঠে বলল, তুমি! তুমি কি রবিন!

লোকটি কানে কানে কথা বলার সুরে বলল, হ্যাঁ, আমি রবিন। তবে আমাকে সবাই ওয়াইস নামে চিনে।

রোজী বলল, প্রতিশোধ নেয়ার উত্তম সময় তুমি পেয়ে গেছো।

তিনজনের একজন বলল, এখন বাজে কথা রাখ। যদি বেঁচে থাকতে চাও নিরবে নির্বিঘ্নে আমাদের অনুসরণ কর।

ওয়াইস বলল, আমার হৃদয়ে কোন দুমশনী নেই। এখনো আমি আমার হৃদয়ের মণি কোঠায় তোমার ভালবাসা সযত্নে লালন করে আছি।

তৃতীয় জন বলল, ওয়াইস! এখন এতো কথা বলার সময় নেই, আগে ওকে এদের কব্জা থেকে মুক্ত কর।

প্রায় কানে কানেই তারা এ কথাগুলো বলল। কেউ তা বুঝল না। আঁচও করতে পারল না।

অনুসন্ধিৎসু সমবেত লোকদের দিকে ফিরে ওয়াইস বলল, ভাইয়েরা আমার! এই যে এই মেয়েটিকে আপনারা দেখছেন, সে কিন্তু স্বেচ্ছায় সানন্দে নীল নদের শীতল বক্ষে নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তবে আপনাদের সাথে নয়, সে আমাদের সাথে যেতে চায়।

বাবাজ্বী লাঠি হাতে এগিয়ে এল, বলল, দাঁড়াও। আমি তোমাদের চিনি না। তবে আমি বিমুগ্ধ যে, তোমরা এ পুণ্যের কাজটি নিজেদের জিম্মায় তুলে নিয়েছো। তবে আমি হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য তোমাদের সাথে আমার দু'ব্যক্তিকে পাঠাতে চাই।

ওয়াইস ও তার সাথীরা দৃষ্টি বিনিময়ে কি যেন বলল। ওয়াইস একটু কেসে বলল, বাবাজ্বী! দু'জন কেন, ছ'জন পাঠান। আমরা মিসরী খ্রিস্টান। আমাদের পক্ষে একে অপরকে ধোঁকা দেয়া কি সম্ভব!

যে দুই ব্যক্তি রোজীকে নেয়ার জন্য টানাটানি করছিল বাবাজ্বীর নির্দেশে তারা ওয়াইস ও তার সাথীদের সাথে রওয়ানা হয়ে গেল। রোজী যেন ওয়াইসের দর্শনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে। এতক্ষণ তাকে নিয়ে যে অস্বস্থিকর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল এখন তা আর নেই। শান্ত সুবোধ বালিকার ন্যায় সে এখন ওয়াইসের সাথে যাচ্ছে। সমবেত লোকেরা ছুটে গিয়ে তার গায়ে ফুল ছুঁড়ে দিয়ে তার সু'নজর অর্জনের চেষ্টা করছে।

নীল নদের তীরে একটি মাঝারি গড়রেন নৌকা ভিড়ানো ছিল। নৌকায় দু'জন মাঝিও ছিল। পাল তোলা নৌকা। তীরে পৌঁছে কবিলার মাঝি দু'জনকে বাবাজ্বীর প্রেরিত লোকেরা বলল, আপনাদের যেতে হবে না। আমরাই নৌকা চালাতে পারি। মাঝিরা নেমে গেল।

রোজী, ওয়াইস ও তার দুই সাথী নৌকায় আরোহণ করল। পাল তুলে দেয়া হল। স্রোতের বিপরীত দিকে তাদের নৌকা চলছে। বায়ু প্রবাহের প্রচণ্ডতা কম। ধীরে ধীরে নৌকা চলছে। তখন রাতের অন্ধকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দূরে দূরে আলোর মৃদু ঝলকানী দেখা যাচ্ছে। ছল্ ছল্ চলাৎ, ছল্ ছল্ চলাৎ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর নৌকাটি যখন নীল নদের মাঝ দিয়ে চলছিল, তখন বাবাজ্বীর প্রেরীত লোক দু'জন নৌকার মাঝে এসে বসল। ওয়াইস, তার দুই সাথী ও রোজী পিছনে বসে আছে। ওয়াইস তার সাথী দু'জনকে ইঙ্গিত করল। তিনজনই কাপড়ের নিচ থেকে ধারালো খঞ্জর বের করল। অন্ধকারেও খঞ্জর তিনটি যেন ঝলমল করে উঠল। তাদের দু'হাত সামনেই বসে আছে তাদের শিকার। সুতরাং দেরি হল না। লোক দু'টি কিছু বুঝে উঠার আগেই তাদের বক্ষদেশ ভেদ করে দু'টি খঞ্জর চলে গেল। আর্তচিৎকার করে একটু বাঁকা হতেই তাদের ধাক্কা দিয়ে নদীবক্ষে ফেলে দিল।

ওয়াইসের কণ্ঠ আবেগে আপ্লুত। বলল, রোজী! এবার বলতো আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো কিনা? না এখনো আমার ব্যাপারে তোমার সন্দেহ আছে?

রোজীর কণ্ঠ কিছুটা শান্ত, বলল হ্যাঁ ওয়াইস। আমার মনে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। তবে তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

ওয়াইস বলল, শামে...... আলেপ্পায়। তোমার পিতামাতার নিকট। রোজী! আমরা মুসলমান। আমরা মানুষের কল্যাণ কামনা করি। কখনো মানুষের অকল্যাণ কিছু করি না।

রোজী জিজ্ঞেস করল, এখানে তোমরা কিসের জন্য এসেছিলে!

ওয়াইস বলল, ব্যবসা করতে। ইস্কান্দারিয়াতে আমাদের পণ্যদ্রব্য পড়ে আছে। একজন ব্যবসায়ীর সাথে সাক্ষাৎ করতে আমরা এখানে এসেছিলাম।

ওয়াইস সত্য বলল না। ব্যবসার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা মুসলিম বাহিনীর মুজাহিদ। মুজাহিদ বাহিনীর গুপ্তচর বিভাগে তারা কাজ করে। ওয়াইস ছিল খ্রিস্টান। প্রচণ্ড শক্তি ছিল তার দেহে। সুশ্রী সুন্দর ছিল তার অবয়ব। দুই আড়াই বৎসর পূর্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে সে অংশগ্রহণ করেছিল। ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছিল। যুদ্ধে এক পর্যায়ে সে জখমী হয়ে রণাঙ্গনে পড়ে রইল। প্রচুর রক্তক্ষণের কারণে সে মৃত্যুর দুয়ারে গিয়ে পৌঁছল। তার সঙ্গী খ্রিস্টান সাথীরা তাকে রেখে পালিয়ে গেল।

যুদ্ধের পর মুজাহিদরা যখন জখমী মুজাহিদদের তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, ওয়াইস তখন এক মুজাহিদের হাতে ধরে বাঁচার নিবেদন করল। মুজাহিদ তাকে পানি পান করাল। তারপর তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়ে চলে গেল। দু'জন

মুসলমান মহিলা এসে দেখল, এক খ্রিস্টান যোদ্ধা আহত। মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে বাঁচার আকুতি জানাচ্ছে। তারা খ্রিস্টান বা দুশমন মনে না করে একজন আহতমানুষ বিবেচনা করে তাকে তুলে নিয়ে গেল। জখমী মুজাহিদদের পাশে রেখেই তার সেবা শুশ্রূষা করা হল।

দু'তিন দিন পরই ওয়াইস দু'পায়ে দাঁড়ানোর শক্তি ফিরে পেল। আরো কয়েকদিন পর সে হাঁটা চলা করতে শুরু করল। মুসলমানদের আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তায় সে বিমুগ্ধ হল। সে প্রায়ই ভাবত, তাকে তার সাথীরা মৃত্যুর গহ্বরে ফেলে চলে গেছে। অথচ দুশমনদের দু'জন নারী সেবা যত্ন করে তাকে সুস্থ করে তুলেছে। এরা কত মহান। জখমী যে-ই হোক তাকে তারা সেবা করবে। চিকিৎসা করবে। জখমী মানুষ, আদম সন্তান। বন্ধু না শত্রু এ পার্থক্য তারা করে না। কতো উদার তাদের ধর্মচিন্তা। চিন্তার পরতে পরতে তার গোমরাহীর স্থান হেদায়েত দখল করে নিচ্ছে। মন তার ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে।

একেবারে সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তার সাথে যুদ্ধ বন্ধীর ন্যায় আচরণ করা দরকার ছিল। কিন্তু সালারের নির্দেশে তাকে মুক্তি দেয়া হল। সালারের এই অচিন্তনীয় আচরণে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। সাথে সাথে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। সালারের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে সে মুসলমান হয়ে গেল। তার নাম রাখা হল ওয়াইস।

এই ওয়াইস ছিল আলেপ্পার অধিবাসী। একই কবিলায় ওয়াইস আর রোজী বেড়ে উঠেছিল। ওয়াইসকে দেখলে রোজীর বেশ ভাল লাগত। রোজীকে দেখলে ওয়াইসের অন্তরে ঝড় উঠত। একে অপরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করত। কথাবার্তা হত। নির্মল হাসি বিনিময় হত। ধীরে ধীরে তা প্রণয়ের দিকে গড়ায়। হৃদয় দেয়া নেয়ার পালা শুরু হল। ঠিক তখন রোজীর জীবনাকাশে ধূমকেতুর ন্যায় ইউকেলিস এসে উপস্থিত হল। রোজী আর ওয়াইসের প্রণয় বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

মুসলমান হওয়ার পর ওয়াইস মুজাহিদদের সাথে যোগ দিল। তার প্রতিভা দেখে সবাই বিমুগ্ধ হল। সবার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। শুধু দুর্বার দুঃসাহসীই নয়। অসি চালনা, বর্শা নিক্ষেপ, তীর নিক্ষেপ, অশ্বারোহণসহ যুদ্ধের যাবতীয় কলাকৌশলে সে অত্যন্ত পারদর্শী। এরপর সবাই অনুধাবন করল, তার বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শীতা, স্বচ্ছ সঠিক চিন্তা এত তীক্ষ্ণ ও বিস্ময়কর যে গুপ্তচর বিভাগে তার মত মানুষ খুবই জরুরী।

* * *

সিপাহ্ সালার আমর ইবনে আস (রা.) আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-কে নানাভাবে মিসর আক্রমণে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। নানা যুক্তিও উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে, তাৎক্ষণিকভাবে আক্রমণের অনুমতি তিনি দেননি। বরং বলেছেন, শাম মাত্র বিজিত হয়েছে এখানে শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও মজবুত করার পর অন্য চিন্তা করা যাবে। এখন আরেকটি নতুন রণাঙ্গন তৈরীতে তার মন সায় দেয়নি। তবে মিসর আক্রমণ করা দরকার ও করতে হবে তা তিনি অস্বীকার করেননি। সময় সুযোগে তা করা হবে এ আশ্বাস তিনি আমর ইবনে আস (রা.)-কে দিয়েছিলেন।

এদিকে মিসর আক্রমণের আগ্রহ আমর ইবনে আস (রা.)-কে চরমভাবে পেয়ে বসেছে। বার বার কেবল মিসর আক্রমণের চিন্তাই তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তিনি প্রায়ই চিন্তা করেন, রোমান সৈন্যরা যারা শাম থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেছে তারা মিসরে গিয়ে আবার একত্রিত হবে। হিরাক্লিয়াস তাদের পুনরায় সজ্জিত করে এক দুর্ধর্ষ বাহিনীতে রূপায়িত করবে। তারপর আবার শাম আক্রমণ করবে।

তাই একটি কাজ করতে হবে, আরব খ্রিস্টান কবিলারা যেমন বিজয়ী মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ঠিক তেমনিভাবে মিসরের নির্যাতিত খ্রিস্টানদেরও হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে। যেন তারা রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। একদিন তিনি তার অধিনস্ত সালারদের নিয়ে এ ব্যাপারে আলোচনায় বসলেন। কিভাবে মিসরীয়দের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে উসকে দেয়া যায় তার পথ ও পন্থা কি হতে পারে।

আমর ইবনে আস (রা.) বললেন, মিসরের খ্রিস্টানরা সেখানে অত্যন্ত নির্যাতিত অবস্থায় আছে। তাদের বিদ্রোহী করে তুলতে হবে।

এক সালার বলল, তাদেরকে আমাদের অনুগত বানাতে হবে। আমাদের সাহায্যের ব্যাপারে তাদের উৎসাহী করে তুলতে হবে। যেন তারা এ ব্যাপারে এক মত পোষণ করে যে, আমরা মিসরে আক্রমণ করলে তারা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। যে সব মিসরী রোমানদের সৈন্য বাহিনীতে আছে তারা যেন যুদ্ধের সময় উদাস থাকে, কৌশলে আমাদের মোকাবেলা এড়িয়ে চলে।

খুঁটি নাটি আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হল। সবশেষে আমর ইবনে আস (রা.) বললেন, আমার তিন চারজন মুজাহিদের প্রয়োজন যারা মিসরে গিয়ে মিসরীয়দের সাথে মিশে তাদেরকে হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে উসকে দেবে। তাদের বিদ্রোহী করে তুলবে।

গুপ্তচর হিসেবে কাজ করাতে অনেক মুজাহিদ প্রস্তুত। কিন্তু মিসরের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাকে তাকে দিয়ে এ কাজ হবে না। তাই সালার

সর্বসম্মতিক্রমে দু'জন মুজাহিদকে এ কাজের জন্য নির্বাচিত করলেন। তারপর তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে সবাই ওয়াইসকে নির্বাচন করল। আমর ইবনে আস (রা.) এ তিনজনকে নিজের নিকট রেখে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিলেন।

প্রশিক্ষণ শেষ হলে তারা মিসরে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তারা ব্যবসায়ীর রূপ ধারণ করে মিসরে যাচ্ছে। মাত্র এক মাস মিসরে থেকে তারা দু'তিনজন নেতৃস্থানীয় মিসরীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব সৃষ্টি করেছে। মিসরী খ্রিস্টানরা তাদেরকে তাদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে।

* * *

গুপ্তচর বৃত্তির কাজে এদিক দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। হঠাৎ ওয়াইসের দৃষ্টি রোজীর উপর নিপতিত হল। রোজীর জায়গায় অন্য কোন মেয়ে হলে ওয়াইস কিছুতেই সে দিকে ফিরেও তাকাতো না। রোজীকে দেখেই সে তার সঙ্গী সাথীদেরকে দূরে নিয়ে তার সাথে রোজীর সম্পর্কে কথা বলল। কিভাবে সুদূর এ মিসরে এসে এ বিপদে সে আটকে গেছে সে কথা ভেবে তারা কোন কূল কিনারা পেলো না।

ওয়াইস সমবেত লোকদের একজনকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, ভাই! এ মেয়েটির কি হয়েছে? লোকটি বলল, এ মেয়েটিকে নীল নদীতে উৎসর্গ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু সে তাতে রাজী নয়। ওয়াইস ও তার সাথীরা এসব কিছু জেনে পরামর্শ করল। কিভাবে রোজীকে উদ্ধার করা যায়। তার পন্থাও বের করল। তারপর ওয়াইস ও তার সাথীরা মিসরী খ্রিস্টানের রূপধরে সমবেত লোকদের ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল এবং যারা রোজীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোর প্রয়োগ করছিল তাদের নিকট থেকে রোজীকে নিজেদের হাতে তুলে নিল।

তারা কৌশলে কামিয়াব হল। তারা মিসরী দু'জনকে হত্যা করে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করল। সেখানে নদী খুব প্রশস্ত। নদীর মাঝ দিয়ে নৌকাটি তর তর করে এগিয়ে চলছে। এখন তাদের সবচেয়ে জরুরী কাজ হল তীরে নৌকা ভিড়িয়ে দ্রুত অন্যত্র চলে যাওয়া। কিন্তু আরবরা তখনো নৌকা চালনায় পারদর্শী হয়ে উঠেনি। দজলা ও ফুরাত নদীতে আরবরা ছোট ছোট নৌকা চালাতে পারত। নৌকা নিয়ে এদিক সেদিক যাতায়াতও করত। কিন্তু পালের নৌকা চালাতে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি।

ওয়াইস ও তার সাথীরা জানে যে, নৌকার গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পিছনে বৈঠা ব্যবহার করতে হয়। বৈঠা ঘুরালেই নৌকার মুখ ঘুরে যাবে। তাদের একজন নৌকার বৈঠা ঘুরিয়ে দিল। নৌকার মুখ তীরের দিকে ফিরে গেলেও

পালের নৌকা ভারসাম্য হারিয়ে এক দিকে হেলে গেল। পালের নৌকা কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় তা তাদের জানা ছিল না। প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটা ও ঢেউয়ের কারণে নৌকায় পানি উঠতে লাগল।

এক মুজাহিদ ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলল, মেয়েটির দিকে খেয়াল রাখ।

রোজী দৃঢ়তার সাথে বলল, আমার চিন্তা করতে হবে না। আমি সাঁতার কাটতে পারি। সাঁতরেই আমি তীরে উঠেছি এবং এখনো বেঁচে আছি।

তারা আর বেশী কথা বলতে পারল না। বাতাসের একটি প্রবল ঝাপটা এসে পালে লাগতেই নৌকাটি এক দিকে কাত হয়ে উল্টে গেল। সবাই সাঁতার জানে। তারা তীরের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল। ওয়াইস উৎকণ্ঠিত হয়ে রোজীকে ডাকতে লাগল। তারা সকলে সাঁতার কেটে তীরে গিয়ে পৌঁছল।

* * *

এখন একটি চিন্তা তাদের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। রোজীকে তারা কোথায় লুকিয়ে রাখবে। কিভাবে তারা তাকে শামে পৌঁছে দেবে। এটা তাদের দায়িত্ব নয়। কিন্তু ওয়াইস স্বেচ্ছায় যেন এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। তারা মিসরী খ্রিস্টানদের সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু ও পাদ্রী বিনইয়ামীনের নিকট যাচ্ছিল।

বিন ইয়ামীন কোন জনবসতিতে বসবাস করে না। কাউস নামক স্থান অতিক্রম করে এক বিস্তৃত বালুকাময় অঞ্চল। তারপর চড়াই উৎরাই ও দুর্গম পথ পেরিয়ে বিন ইয়ামীনের নিকট পৌঁছতে হয়। হিরাক্লিয়াসের রাজকীয় খ্রিস্টধর্মকে যারা মানে না তারা বিন ইয়ামীনকেই তাদের আধ্যাত্মিক নেতা মনে করে। তার আদেশ নিষেধ অম্লান বদনে মেনে নেয়। সম্রাট হিরাক্লিয়াস বিন ইয়ামীনকে হত্যার জন্য পাদ্রী কীরসকে অনুমতি প্রদান করেছিল। গোপন সূত্রে বিন ইয়ামীন সংবাদ জানতে পেরে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে এবং দুর্গম মরু অঞ্চলে আত্মগোপন করেছে। সে বিশ্বস্ত অনুসারীদের মাধ্যমে এখনো তার ধর্মীয় নেতৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

আমর ইবনে আস (রা.) এর প্রেরিত গুপ্তচরদের সফলতা যে, তারা বিন ইয়ামীনের ঠিকানা সংগ্রহ করতে পেরেছে। তারা নিজেদেরকে মিসরী প্রকাশ করত এবং মিসরীয়দের গির্জায় গিয়ে খ্রিস্টানদের মত ইবাদত করত। এভাবে মিসরীয়দের প্রবঞ্চনায় ফেলে তাদের থেকে বিন ইয়ামীনের ঠিকানা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু রোজীকে নিয়ে তারা দারুণ সমস্যায় পড়ল। ওয়াইসের ব্যাপারে তো এ কথা চিন্তাও করা যায় না যে, সে তার দায়িত্ব ফেলে রোজীকে তার মাতাপিতার নিকট পৌঁছাতে শামে চলে আসবে। আবার রোজীকে সাথেও রাখা

বিপদ। আবার তাকে একা ফেলেও যাওয়া সম্ভব নয়। তিনজনে এ বিষয়টি নিয়ে ভাবল। পরামর্শ করল।

তাদের তিনজনের যে আমীর সে বলল, আচ্ছা এমন করলে কি হয় না যে, আমরা রোজীকে আমাদের সাথেই নিয়ে যাই। এবং বিন ইয়ামীনের নিকট রোজীকে সমর্পণ করে বলি, আপনি তাকে আলেপ্পায় প্রেরণের ব্যবস্থা করে দিন।

একজন বলল, যদি সে জানতে পারে যে, তাকে নীল নদীতে বিসর্জন দেয়ার জন্য নেয়া হচ্ছিল, আমরা তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। তাহলে কি হবে?

আমীর বলল, এ ধরনের চিন্তা মনে জায়গা না দেয়াই ভালো। কারণ আমি শুনেছি, বিন ইয়ামীনও নীল নদে যুবতী বিসর্জনের পক্ষপাতী নয়। সে একে পাপ মনে করে। তবে সে এখন মিসরীয় খ্রিস্টানদের সমর্থন ধরে রাখার জন্য এ বিষয়টি নিয়ে কোন কথা বলছে না।

নীল নদের তীরে আর বেশীক্ষণ থাকা ঠিক হবে না ভেবে তারা সেখান থেকে বিন ইয়ামীনের নিকট পৌঁছার পথ ধরে চলতে লাগল।

* * *

মুসলমান গুপ্তচর তিনজন অনেক চিন্তাভাবনা করে দেখেছে যে, মিসরে রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে হলে বিন ইয়ামীনকে ছাড়া সম্ভব নয়। তার সেই শক্তি আছে। সেই জনপ্রিয়তা তার আছে। আর তার দ্বারাই তা করানো যেতে পারে। এর পিছনে আছে এক রক্তাক্ত ইতিহাস। এক মর্মন্তুদ বেদনাময় কাহিনী।

দীর্ঘদিন যাবৎ খ্রিস্টানরা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে বিষ উদগিরণ করে আসছিল। তারা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারত না। পরস্পরে প্রায়ই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস দেখল, ধর্মের নামে এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধ করা দরকার। সে সকল দল উপদলকে ভেঙে চুড়ে খ্রিস্টানদের এক পতাকা তলে সমবেত করার ফর্মূলা খ্রিস্টান জাতির নিকট পেশ করল। তোষামুদে পাদ্রীরা সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে তা গ্রহণ করে নিল। কিন্তু মিসরের খ্রিস্টানরা তা মেনে নিল না। তারা তাদের পূর্ব ধর্মমত ছাড়া নতুন কিছু গ্রহণ করবে না। তারা সম্রাটের সমালোচনা শুরু করল ও রাজকীয় খ্রিস্টধর্ম বর্জন করল। সম্রাট হিরাক্লিয়াস এক শীর্ষস্থানীয় পাদ্রী কীরসকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিয়ে সকল খ্রিস্টানকে রাজকীয় খ্রিস্টধর্ম মেনে নিতে বাধ্য করতে নির্দেশ দিল।

কীরস ইস্কান্দারিয়াতে এক সম্মেলনের আয়োজন করল। রাজকীয় খ্রিস্টধর্ম প্রচারের আয়োজন করল। তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। আল্লাহর কিতাব ইঞ্জিল বাদ

দিয়ে সম্রাটের দেয়া খ্রিস্ট ধর্মকে মিসরের কেউ মেনে নিল না। পাদ্রী ও ধর্মজাযকরা এর প্রবল প্রতিবাদ জানাল। আমজনতা তা প্রত্যাখ্যান করল। সবার শীর্ষে রইল পাদ্রী বিন ইয়ামীন। সে কড়া ভাষায় তার প্রতিবাদ করল। সমালোচনা করল।

সম্রাটের কোপানলে পড়ে গেল বিন ইয়ামীন। সম্রাট তাকে বন্দী করে হত্যার নির্দেশ দিল। বিন ইয়ামীনের নিকট কোন সামরিক শক্তি ছিল না। সম্রাটের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার ক্ষমতাও ছিল না। তারপরও সে খ্রিস্টধর্মকে রক্ষার জন্য সাময়িকভাবে আত্মগোপন করে থাকার কথা ভাবল। এ ছাড়া তার কোন উপায়ও ছিল না। সে কাউস নামক স্থানে দুর্গম এলাকায় তার আস্তানা বানাল। সেখান থেকেই মিসরীয়দের বিভিন্ন ধর্মীয় নির্দেশ দিতে লাগল। মিসরের লোকেরাও সকল বিপদ মসীবতকে উপেক্ষা করে তার নির্দেশ মতে ধর্মাচার পালন করতে লাগল।

বিন ইয়ামীনের কোন সন্ধান না পেয়ে কীর্‌স আরো ক্ষীপ্ত হয়ে উঠল। বিন ইয়ামীনের বড় ভাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে এল। কীরস জানে যে, বিন ইয়ামীনের মিসন তার অবর্তমানে তার ভাই পরিচালনা করছে। তাই কীরস তাকে রাজকীয় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার নির্দেশ দিল।

বিন ইয়ামীনের ভাই তা অস্বীকার করল। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলল, আমি আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান মানতে বাধ্য। মানুষের দেয়া কোন বিধান মানা সম্ভব নয়। আরো বললো, রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াস একজন পাপী বাদশাহ। আসল বাদশাহ আল্লাহ্। তিনি এ দুনিয়ার এবং পরকাল উভয় জাহানের বাদশাহ। আমি শুধু তারই হুকুম মানব, অন্য কারো নয়।

এরপর আর দেরি হয়নি। লোমহর্ষক শাস্তি তার উপর নেমে আসে। তাকে বিবস্ত্র করে তার শরীর মশালের আগুনে পুড়িয়েছে আর বলেছে—বল, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ধর্মমত সত্য। আর বাকী সব ধর্মমত মিথ্যা।

বিন ইয়ামীনের ভাই আগুনে পুড়তে পুড়তে চিৎকার করে বলেছে, লানত ঐ ব্যক্তির উপর সে বিশ্বাস করে হিরাক্লিয়াসের ধর্মমত সত্য। বরং ইঞ্জিলের ধর্মমত চিরসত্য।

আগুনে জ্বলে জ্বলে তার শরীর দিয়ে চর্বি গলে গলে পড়েছে তবুও সে হিরাক্লিয়াসের ধর্মমতকে সত্য বলেনি। তারপর আগুন সরিয়ে নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছে, তুমি যদি বল, বিন ইয়ামীন কোথায় আছে, তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেব।

সে তখন অত্যন্ত ঘৃণাভরে তার দিকে তাকিয়ে বলেছে, যদি আমি জেনেও থাকি তবুও তোমাকে তা কেন বলব?

তখন তার একটি দাঁত তুলে ফেলে পুনরায় জিজ্ঞেস করেছে। সে ঐ একই উত্তর দিয়েছে। তারপর তার আরেকটি দাঁত তুলে ফেলে জিজ্ঞেস করেছে। সে ঐ একই উত্তর দিয়েছে। এভাবে নির্মমভাবে কষ্ট দিয়ে নির্যাতন করে তার সবগুলো দাঁত তুলে ফেলেছে। তার মুখ দিয়ে তখন অবিরাম রক্ত ঝরে পড়ছিল।

এরপর তাকে তিনবার জিজ্ঞেস করা হয়েছির, বল সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ধর্মমত সত্য। কিন্তু প্রত্যেক বার সে উত্তরে বলেছে, সম্রাটের ধর্মমত মিথ্যা, অবাস্তব। ইঞ্জিলের ধর্মমত সত্য। তারপর পাদ্রী কীরাসের নির্দেশে হাত পা বেঁধে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। এভাবে পানিতে ডুবিয়ে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করা হয়।

ধর্মের লেবাসে কীরাস অনেক মানুষের উপর নির্যাতন করেছে। অনেককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। অনেককে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করে দিয়েছে। ধার্মিক মানুষেরা তার হাতে নির্যাতনের শিকার হয়ে ধুকে ধূকে নিঃশেষ হয়ে গেছে। ইতিহাসের পাতায় এ ধরনের নির্যাতনের বহু ঘটনা আজো পাঠকের চোখ থেকে অশ্রু ঝরাচ্ছে।

পাদ্রী সামবীলকে নিয়ে যা ঘটেছিল আজো তা কেউ ভুলেনি। সামবীল ছিল বিন ইয়ামীনের অনুসারী। বিন ইয়ামীনের কথাবার্তা, আচার আচরণ তার ভাল লাগত। তাই সব বিষয়ে তার অনুসরণ করত। তার পরামর্শ নিয়ে চলত।

মিসরী পাদ্রী সামবীল সম্রাট হিরাক্লিয়াসের রাজকীয় খ্রিস্টধর্ম মেনে নিতে পারেনি। পাদ্রী কীরাস এ সংবাদ পেল। রেগে মেগে আগুন হয়ে কীরাস সামবীলের নামে এক ছোট্ট পত্র লিখে পাঠাল। তাকে রাজকীয় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে নেয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাল। পত্রটি এক সালালের হাতে দিয়ে একশত সৈন্যসহ সালারকে সামবীলের নিকট পাঠাল। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলীও দিল। সালার গিয়ে চিঠিটি পাদ্রী সামবীলের হাতে দিলে সে তা খুলে পাঠ করল। চিঠি পড়ে তার মাথায় খুন চড়ে গেল। ধর্ম নিয়ে এ কী খেলা শুরু হল! বিন ইয়ামীন ছাড়া আমাদের ইমাম আর কেউ নয়। এ কথা বলেই চিঠিটি ছিড়ে ফেলল। তারপর বলল, যে এ পত্র লিখেছে তার উপর আল্লাহ্‌র লানত। আর ঐ রোম সম্রাটের উপরও লানত যে আমাদের উপর এক মনগড়া ধর্ম চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে।

সামবীলের এ ধৃষ্টতা দেখে ও উত্তেজক কথাবার্তা শুনে সালার আর দেরি করল না। সাথে সাথে তাকে গ্রেফতার করল। তার হাত পিছমোড়া করে বাঁধল। সালার ঘোড়ায় চড়ে সামবীলকে তার সাথে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলল। লোকেরা এ অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল। হৃদয়ে তাদের বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারল না।

লোকদের দেখে সামবীল বেদনা বিধূর কণ্ঠে চিৎকার করে বলল, ভাইয়েরা আমার! আজ আমি আনন্দিত। ঈসা (আ.)-এর অনুসারী হওয়ার কারণে আজ আমার শরীর থেকে রক্ত ঝরবে। ভাইয়েরা আমার! তোমরা সঠিক ধর্ম আঁকড়ে ধরে থাকবে। কোন রাজা বাদশাহকে ভয় করবে না। তারপর সে কীরাসকে গালি দিতে লাগল।

সৈন্যরা তাকে মারতে মারতে কীরাসের নিকট যখন নিয়ে গেল তখন তার শরীরে জায়গায় জায়গায় জখম হয়ে রক্ত ঝরছে। রক্তে রক্তে তার দেহ লাল হয়ে গেছে।

কীরাস সামবীলকে লক্ষ্য করে বলল, ওহে পাপীষ্ঠ! তোকে কে পাদ্রী বানিয়েছে? আর তোকে কে এই অধিকার দিল যে, আমার অধীনস্থ হয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ করছিস। বল হে নরাধম! এমন করছিস কেন?

সামবীল বজ্র নির্ঘোষ কণ্ঠে বলল, ওহে দাজ্জাল! আল্লাহ্র ইবাদত আর বিন ইয়ামীনের আনুগত্যে রয়েছে নেকী। তুই তো ইবলিসের চেলা। তোর কথা মানা আর তোর ধর্মমতের অনুসরণ করা পাপ। মহাপাপ।

কীরাসের চোখ আগুনের গোলক হয়ে গেল। হুকুম দিল, তার মুখে ঘুষি মারতে মারতে ফুলিয়ে ফেল। ব্যস্ তাই হল। ঘুষি মারতে মারতে তার চেহারা ফুলিয়ে দিল।

তারপর কীরাস জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বলতো, তুমি কেন মিসরের শাসক ও ধর্মীয় গুরুর কথা মানছো না? তুমি কি জান না, তোমার জীবন ও মরণ আমার হাতে?

সামবীল ক্রোধে গর্জন করে উঠল। বলল, হে কীরাস! তুমি কি ইবলিসের কথা জান না? ইবলিস ফেরেস্তাদের সর্দার ছিল। কিন্তু অহংকার তাকে আল্লাহ্র হুকুম মানতে অবাধ্য করল। সে আজ অভিশপ্ত। হে কীরাস! তুমি আজ ইবলিসের চেয়ে অধিক অভিশপ্ত।

কীরাস অহংকারে আগুনের মত জ্বলে উঠল। বলল, যাও এ নরাধমকে নিয়ে তার শির ধর থেকে ছিন্ন করো। তাহলে সব তেজ শেষ হয়ে যাবে।

* * *

জেলে আর মাঝি মাল্লাদের নিয়ে পল্লীর খ্রিস্টান সর্দার বাবাজ্বী সে রাতেই নীল নদের যে স্থানে রোজীকে উৎসর্গ করা হবে নৌকা দিয়ে সেদিকে যাচ্ছিল। নদী পথ অল্প। বাবাজ্বী যেদিকে যাচ্ছিল সে দিকে ছিল পানি প্রবাহ। তর্ তর্ করে তার নৌকা গন্তব্যের দিকে ছুটে যায়। কিছুদূর যেতেই দেখতে পায়, নদীবক্ষে একটা নৌকা উল্টে আছে। একটু দূরেই বৈঠা ভাসছে। কিন্তু কার

নৌকা তা সে বুঝতে পারল না। এ কথা বুঝতে পারল না যে, এটা তাদের লোকদের নৌকা। বুঝতে পারল না, যাকে নদীবক্ষে উৎসর্গ করার জন্য নেয়া হচ্ছিল সে আরেকবার পালিয়ে গেছে।

নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখল, তার আগে অন্যরা সেখানে উপস্থিত হয়ে কি যেন খুঁজছে। কয়েকজন সর্দার, তাদের সাথে একজন নেতৃস্থানীয় পাদ্রীও রয়েছে। বাবাজী পৌঁছতেই পাদ্রী মহাশয় তার দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? যে কুমারীকে উৎসর্গ করা হবে সে কোথায়?

বাবাজ্বীর কণ্ঠে এক আকাশ বিস্ময় ঝরে পড়ল। বলল, আপনি এ কেমন কথা বলছেন। পাঁচজন লোকসহ তো তাকে অনেক আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি!

এ কথা শোনার পর সেখানে হায় হায় রব উঠল। বাবাজ্বী বলল, আমি আসার সময় দেখলাম নদী বক্ষে একটি নৌকা উল্টে আছে। কিন্তু মাঝি দু'জনতো বেশ পারদর্শী। কোন কারণে যদি নৌকা উল্টে গিয়ে থাকে তাহলে মাঝি দু'জন তো সাঁতরে চলে আসবে। আর কুমারী মেয়েটিও তো সাঁতার জানে।

তারপরই বাবাজ্বী বলল, নৌকায় তিনজন অপরিচিত লোক ছিল। তারা না হলে মেয়েটিকে উৎসর্গের জন্য তৈরী করাই মুশকিল ছিল।

পাদ্রী বলল, নীল নদী এ মেয়ের উৎসর্গকে কবুল করেনি। নীল নদের ক্রোধ থেকে বাঁচতে হলে ঐ মেয়েকেই উৎসর্গ করতে হবে যাকে আগে নির্বাচন করা হয়েছিল। হোরসীসের ঐ মেয়েকে নিয়ে আস। তাকে এনে নীলের বক্ষে নিক্ষেপ কর। তাহলেই নীল শান্ত থাকবে।

পাদ্রীর নির্দেশে সাথে সাথে কয়েকজন লোক হোরসীসের বাড়িতে ছুটে গেল। তাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে বলল, আপনার মেয়েকে নিয়ে এক্ষণই যেতে হবে। এটা পাদ্রীর নির্দেশ। হোরসীস এ সংবাদে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। পাদ্রীর নির্দেশ অমান্য করাও সম্ভব নয়। তাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মেয়েকে নিয়ে পাদ্রীর নিকট পৌঁছল। বিগলিত কণ্ঠে বলল, গুরুজ্বী পাদ্রী মহোদয়! আমার এ মেয়ের সমস্ত অলঙ্কার ঐ মেয়েকে পরিয়ে দিয়েছি যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। এখন তাকে পরানোর মত কোন অলঙ্কার নেই। তার আশা ছিল, হয়তো একথা বললে তার উৎসর্গ মুলতবী করে দিতে পারে।

কিন্তু পাদ্রী তার সমস্ত আশা ভরসা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বলল, অলঙ্কার আর সাজগোছ তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। একজন কুমারী মেয়েকে উৎসর্গ দেয়াই হল আসল কথা।

পাদ্রীর নির্দেশ উপেক্ষা করা গেল না। সে রাতেই হোরসীসের মেয়েকে নদীবক্ষে উৎসর্গ করা হল।

ইতিমধ্যে রোজী নীল নদ থেকে উঠে অনেক দূর চলে গেছে। ওয়াইস ও তার সাথীরা ভাড়া করে উট নিয়েছে। তাতে চড়ে তারা কাউস নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছল। কাউস শহর থেকে দূরে হলেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ এলাকা। হিরাক্লিয়াস ও কীরাসের বিপক্ষের খ্রিস্টানদের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র। এখানে বীন ইয়ামীনের প্রভাব খুব বেশী। সবাই বিন ইয়ামীনের ভক্ত। তারা এখানে পৌঁছে নিজেদের খ্রিস্টান বলে পরিচয় দিল। বিন ইয়ামীনের অনুসারী হিসাবে ব্যক্ত করল।

ইতিমধ্যে দিনমনি পশ্চিমাকাশে কাত হয়ে যাই যাই করছে। রাত কাটানোর জন্য তারা একটি সরাইখানায় গিয়ে উঠল। ছিমছাম ছোট অথচ ভাল লাগার মত একটি সরাইখানা। রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে তারা কথাবার্তা বলছিল।

এক মুসলমান গুপ্তচর বলল, আচ্ছা রোজী বলতো, আমাদের ব্যাপারে তো তোমার এখন আর কোন সন্দেহ নেই।

রোজী বলল, না, কোন সন্দেহ নেই।

কোন প্রকার শোবা সন্দেহ না থাকারই কথা। গত রাত থেকে সে তাদের সাথে আছে। যদি তাদের কোন বদ নিয়ত থাকত তাহলে নিশ্চয় এর মধ্যেই তা প্রকাশ পেয়ে যেত। রোজী মনে মনে ওয়াইসকেই বেশী ভয় পাচ্ছিল। ইউকেলিসকে পাওয়ার পর সে তাকে অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করেছে। তার সাথে অনেক দুর্ব্যবহার করেছে। তার মনে অনেক কষ্ট দিয়েছে। এখন যদি সে ওসবের প্রতিশোধ নেয় তবে বলতে হবে তার সে অধিকার আছে। কিন্তু ওয়াইস তার সাথে কোন দুর্ব্যবহার করেনি। কোন কটু কথাও বলেনি। বরং তার সাথে এমন ভদ্র আচরণ করছে যা দ্বারা বুঝা যায় যেন রোজী কোন সুন্দরী রূপসী যুবতী নয়। বরং তাদের সঙ্গী কোন মুজাহিদ।

রোজী বলল, ওয়াইস! তুমি বলেছিলে, মুসলমানরা তোমাকে নতুন জিন্দেগী দিয়েছে। তুমি দেখেছিলে, মুসলমানরা শুধু তেমার প্রতি অনুগ্রহই করেনি, বরং শত্রুর সাথে এমন ব্যবহার করা তাদের ধর্মীয় বিধান। তাই তুমি মুগ্ধ হয়ে তাদের ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছ। এখন তুমি আর তোমার সাথীরা আমাকে নতুন জিন্দেগী দিলে। আমার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, আমার স্বধর্মীয়রা আমার হাত বেঁধে আমাকে নীল নদে নিক্ষেপ করবে। তোমরা না এলে এখন আমার লাশ নদীর প্রাণীরা টেনে টেনে খেয়ে ফেলত।

ওয়াইস বলল, আল্লাহ্‌র হুকুম ছিল তুমি জীবিত থাকবে। তাই আল্লাহ্ তোমাকে মুক্ত করার জন্য আমাদের সেখানে পাঠিয়েছিলেন। যেখানে তোমার জীবন মরণের ফয়সালা হচ্ছিল। তোমাকে আমরা নয় বরং ইসলামী আদর্শ নতুন জিন্দেগী দান করেছে।

রোজীর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। সে বলল, ওয়াইস! তাহলে আমাকেও তোমাদের ধর্মে শামিল করে নাও। আমাকে মুসলমান করে নাও। আমার একটুও বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিবে। এখন আমি তোমার ও তোমার সাথীদের আচরণে এতো প্রভাবিত হয়েছি যে, আমি আমার জীবন তোমাদের আদর্শের জন্য ওয়াক্‌ফ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ওয়াইসের দলপতি বলল, রোজী! এখন নয়। হয়তো পিতামাতার নিকট পৌঁছলে তোমার মনের খেয়াল পরিবর্তন হতে পারে। এখন তোমার মনে বিভিন্ন ভীতি শংকা ভর করে আছে। তাছাড়া তোমার বয়সও কম। কম বয়সীরা সাধারণত আবেগ প্রবণ হয়ে থাকে। আগে তুমি তোমার পিতামাতার নিকট যাও। তারপর তুমি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিও।

রোজী মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে ইসলাম গ্রহণ করবে। তাই এদের কথা শুনে সে কেঁদে ফেলল। রোরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, আমি আমার পিতামাতার নিকট একা ফিরে যাব না। তোমাদেরকে সাথে নিয়ে যাব। ওয়াইস তাকে বলেছিল, ব্যবসার জন্য তারা মিসরে এসেছে। তাই রোজীর দাবী সে তাদের সাথেই ফিরে যাবে। অন্য কারো সাথে নয়।

কিন্তু তাকে তো আর একথা বলা যায় না যে, তারা ব্যবসার জন্য নয়, অন্য মিশন নিয়ে তারা এখন মিসরে আছে। তাই তাদের সাথে তার না থাকাই ভাল। কিন্তু রোজীর একগুঁয়েমী ও আহাজারী বেড়েই চলল। এক পর্যায়ে সে বলেই ফেলল, আমি আর খ্রিস্টান নই, আমি এখন মুসলমান।

রোজী অত্যন্ত সাহসী মেয়ে। কোন প্রকার ভয় ভীতি তার অন্তরে নেই। কঠিন মুহূর্তেও তাকে নিয়ে কোন সমস্যা হবে না ভেবে দলপতি তার সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করল। তাকে ইসলামে দীক্ষা দেয়া হলো। নাম রাখা হলো রাবেয়া। রোজী এখন রাবেয়া। একজন মুসলমান। এখন তার জীবন রক্ষা করা অপর মুসলমানের দায়িত্ব। তাকে এখন আর বিপদের মুখে ফেলে যাওয়া যাবে না। সবদিক বিবেচনা করে তারা রাবেয়াকেও তাদের মিশনের সদস্যা হিসেবে গ্রহণ করে নিল।

তারা রাবেয়ার নিকট তাদের মিসরে আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য খুলে বলল। বলল, তারা এখন মিসরীয় খ্রিস্টানদের অবিসংবাদিত নেতা ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় পাদ্রী বিন ইয়ামীনের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে। তারা তার নিকট একথা কিছুতেই প্রকাশ করবে না যে, তারা মুসলমান। তারা বলবে, আমরা খ্রিস্টান। শামের খ্রিস্টান সর্দারের পত্র নিয়ে আমরা এসেছি।

রাবেয়ার কণ্ঠ অত্যন্ত উৎফুল্ল শোনা গেল। বলল, আমি সুখে-দুখে সর্বদা তোমাদের সাথে থাকব। প্রয়োজনে প্রাণ দিব। তবে এমন নয় তো যে, আমাকে নীল নদে ডুবিয়ে মারা হবে!

* * *

বিন ইয়ামীন আত্মগোপন করে আছে। অত্যন্ত সর্তক অবস্থায় আছে। তাই তার ঠিকানা নেয়া, আর আস্তানা খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ওদুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তারা গুপ্তচর। বার বাজারের তের গলিতে তাদের যাতায়াত। সকল রহস্যের গ্রন্থি উন্মোচন করাই তাদের কাজ। তাই বিন ইয়ামীন কোথায় আছে তা বের করতে তাদের বেগ পেতে হল না। বিন ইয়ামীনের আস্তানা খুব বেশী দূরে নয়। তবে অত্যন্ত দুর্গম। চড়াই উৎরাই আর ঘন বনজঙ্গল পেরিয়ে তবে আস্তানায় পৌঁছতে হয়।

দ্বিপ্রহরের পর তারা সেখানে গিয়ে পৌঁছল। ছোট্ট একটি খেজুরের বাগান। চারদিকে বালিয়াড়ির মাঝে বাগানটিকে মরুদ্যান মনে হয়। একটি ছোট গির্জা। তার চার পাশে কয়েকটি তাঁবু। পাথরের তৈরী গির্জার এক কোণে একটি কামরায় বিন ইয়ামীন থাকে। তাকে সংবাদ জানান হল, তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। বিন ইয়ামীন তাদের ডেকে পাঠালেন।

মুজাহিদদের দলপতি তাদের পরিচয় দিয়ে বলল, আমরা আলেপ্পার অধিবাসী। খ্রিস্টান। আর এ মেয়েটি আমাদের এই বন্ধুর স্ত্রী। কিছুদিন পূর্বে তাদের বিয়ে হয়েছে। তার স্ত্রী মিসর দেখার জন্য ও আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে আশির্বাদ নেয়ার জন্য একেবারে কাতর হয়ে গিয়েছিল, তাই তাকেও সাথে করে এনেছি। সবার গলায় তখন ক্রুশ শোভা পাচ্ছিল। খ্রিস্টানদের নামের মতই তারা তাদের নাম বলল।

বিন ইয়ামীন বলল, তোমরা কি শুধু আমার সাথে সাক্ষাৎ করতেই এসেছো না বলার কোন কথা আছে? শামে খ্রিস্টানরা কি অবস্থায় আছে?

দলপতি বলল, আমরা শুধু আপনার সাক্ষাতের জন্যই এসেছি। তবে আমাদের একটি কথা আছে। শামে রোমানরা খ্রিস্টানদের সাথে গাদ্দারী করেছে। প্রতারণা করেছে। আমরা ত্রিশ হাজার সৈন্য সশস্ত্র অবস্থায় সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট গেলাম। বললাম, আমরা রোমান সৈন্যদের সাথে মিশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কিন্তু সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও তার ছেলে কুস্‌তুনতীন আমাদের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করল। সর্বশেষে যুদ্ধের ময়দানে আমাদেরকে মুসলমানদের তরবারীর নিচে ফেলে পালিয়ে গেল।

এতটুকুতেই তাদের মনের আশা মিটল না। তারা আমাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উস্‌কে দিল। আমরা বিদ্রোহ করলাম। কিন্তু তারা আমাদের সহায়তায় এগিয়ে এল না। আমরা মুসলমানদের মুকাবিলা করতে পারলাম না। অস্ত্র সমর্পণ করলাম। মুসলমানরা আমাদের নির্বিচারে হত্যা করতে পারত। তারা ইচ্ছে করলে আমাদের মেয়েদের ও স্ত্রীদের বাদী বানাতে পারত। আমাদের সন্তানদের গোলাম বানাতে পারত। কেউ তাদের বাধা দেয়ার ছিল না। কিন্তু তারা তা করল না, এমন কি তারা নির্যাতনমূলক কোন কাজও করল না। তারা বিজয়ী আর আমরা পরাজিত। তারা শাসক আর আমরা শাসিত—এমন আচরণ ও তাদের থেকে প্রকাশ পেল না। এমন কি তারা আমাদের ধর্মের ব্যাপারেও কিছু বলল না। কোন হস্তক্ষেপও করল না।

বিন ইয়ামীন বলল, আমি রোমানদের কার্যাবলী সম্পর্কে সজাগ। সবকিছুই জানি। শামে তারা তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়েছে। কিন্তু তাদের শিক্ষা হয়নি। মিসরেও তারা তাই শুরু করেছে। রাজকীয় খ্রিস্ট ধর্মের নামে বর্বর ও নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। তোমরা তো শুনেছো যে, আমি আত্মগোপন করে আছি। এমন অবস্থায় আমি শামের খ্রিস্টানদের জন্য কি করতে পারি?

দলপতি বলল, আমরা আপনার থেকে সাহায্য নেয়ার জন্য আসিনি। আমরা মিসরের খ্রিস্টানদের সহায়তা করতে এসেছি।

বিন ইয়ামীনের কণ্ঠে বিস্ময়ভাব ফুটে উঠল। বলল, তোমরা আমাদের কি সাহায্য করতে পারবে?

দলপতি বলল, আমাদের সর্দাররা আর পাদ্রীরা মিসরের সব খবর জানে। মিসর থেকে কিছু খ্রিস্টান পালিয়ে শামে গিয়েছিল। তারা সেখানে গিয়ে মিসরে খ্রিস্টানদের উপর কি জুলুম-অত্যাচার চলছে তার বিবরণ দিয়েছে। আমাদের সর্দারদের এ সামর্থ নেই যে তারা বাহিনী তৈরী করে মিসর আক্রমণ করবে। তাই তারা এক মুসলমান সিপাহসালার আমর ইবনে আসের নিকট প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিল। তাদের মাঝে দু'জন পাদ্রীও ছিল।

তারা সিপাহসালারের সাথে সাক্ষাৎ করে মিসরের খ্রিস্টানদের দুর্দশা ও নির্যাতন নিপীড়নের অবস্থা তুলে ধরল। তারপর বলল, যদি মুসলমানরা মিসর আক্রমণ করে তবে তারা শাম থেকে ত্রিশ চল্লিশ হাজার যোদ্ধা দিতে পারবে।

দলপতি একের পর এক অনেক কথা বলতে লাগল। আর বিন ইয়ামীন মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল। দলপতির মূল কথা ছিল, যদি মিসরের খ্রিস্টানরা সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে মুসলমানরা মিসরে আক্রমণ করবে। আর যদি তারা বিদ্রোহ করতে সাহস না পায় তাহলে আক্রমণের সময় মুসলমানদের সাহায্য করলেও চলবে। আমর ইবনে আস (রা.)

তাদের যে দায়িত্ব দিয়ে, যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন, ঠিক সে উদ্দেশ্যের কথাই ধীরে ধীরে দলপতি ব্যক্ত করল।

তারপর দলপতি বলল, আমি আপনাকে আরেকটি কথা বলল। এ বিষয়টি দেখে আমাদের খুব কষ্ট হয় যে, খ্রিস্টানরা আজ বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। বর্তমান অবস্থায় এটা আমাদের জন্য দারুণ ক্ষতিকর। আর এ প্রথাও খ্রিস্টানদের খুব ক্ষতি করছে যে তারা ধর্মীয় আমেজে অন্যায়ভাবে প্রত্যেক বৎসর একজন কুমারী যুবতীকে নীল নদে নিক্ষেপ করে হত্যা করে। মিসরের খ্রিস্টানরাই এ গর্হিত কাজটি করে। আপনি কি তা বন্ধ করতে পারেন না?

গম্ভীর কণ্ঠে বিন ইয়ামীন বলল, আমি এ প্রথাকে ভাল মনে করি না। এটা একটা মনগড়া প্রথা। আমাদের লোকেরা এটাকে পাপ কাজ মনে করে। কিন্তু এখন এটা নিয়ে ফাসাদ করার সময় নয়। যারা যুবতীদের বিসর্জন দেয় তারা আমাকে আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে মানে। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে আমরা যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি তার পক্ষে তারা অম্লান বদনে সব কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছে। যদি আমি তাদের ঐ প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলি তাহলে কট্টরপন্থী লোকেরা আর মূর্খ লোকেরা আমাকে ত্যাগ করবে। ফলে আমাদের শক্তি খর্ব হয়ে যাবে। আমরা রাজকীয় খ্রিস্ট ধর্মের কাছে পরাজিত হয়ে যাব। আচ্ছা যাক সে কথা, এখন তোমরা যে জন্য এসেছো সে কথা বল।

দলপতি বলল, আমরা তো আমাদের কথা শেষ করে ফেলেছি। আমরা এখন আপনার উত্তরের আশায় আছি। আমরা তা পেলেই আমাদের সর্দারদের নিকট তা পৌছাব।

বিন ইয়ামীন হাসতে হাসতে বলল, তোমাদের সর্দারদের নিকট নয়, বরং তোমাদের সালার আমর ইবনে আসের নিকট পৌছাবে। তোমরা এতো বেশী কথা বলেছো যে তোমরা নিজেদের উপর যে আবরণ দিয়েছিলে আমি তা উদ্ঘাটন করতে পেরেছি এবং তোমাদের আসল রূপ আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই মেয়েটিকে দেখে আমি বুঝে উঠতে পারছি না, তোমরা তাকে কেন লড়াইয়ের ময়দানে নিয়ে এসেছো। মুসলমানরা তো যুদ্ধ ময়দানে নারীদের আনে না। এবং গুপ্তচর বৃত্তিতেও নারীদের নিয়োগ করে না। কিন্তু তোমরা এটা করলে কী!

রাবেয়া বলল, আমি নও মুসলিম। গতকাল মুসলমান হয়েছি। আমি শামের আলেপ্পা শহরের অধিবাসী। রাবেয়া তার মনের কথা বলে দিল। কিছু কমালোও না, কিছু বাড়ালও না। তারপর বলল, এ মুসলমানরা তাদের দায়িত্ব থেকে কিছুটা সরে এসে আমাকে নতুন জিন্দেগী দান করেছে। আমি তাদের কাজকর্মে এতো

প্রভাবিত হয়েছি যে, সাগ্রহে মুসলমান হয়ে গেছি। তারা আমাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাদের সাথী করে নিয়েছে।

ওয়াইস বলল, আর আমিও নও মুসলিম। আমি আমার জীবনকে ইসলামের সেবার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি। তারপর ওয়াইস তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করল।

বিন ইয়ামীন অত্যন্ত দূরদর্শী, বিচক্ষণ ও চৌকস। ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে লক্ষণ দেখে তা সে অনুমান করতে পারে। মনে হয় আকাশ বাতাস, চাঁদের কিরণ আর সূর্যের আলো তাকে কানে কানে সবকিছু বলে দেয়। সে বেশ কিছুক্ষণ নিরব রইল। কোন কথা বলল না। তারপর ধীরে ধীরে তার মাথা দুলে উঠল। ভেবে চিন্তে যেন কোন কঠিন বিষয়ের সমাধানে পৌঁছতে পারল। বলল, আমি দিব্য দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। মুসলমানরা যদি তাদের বর্তমান আদর্শ ধরে রাখতে পারেন তাহলে খ্রিস্টানরা ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকবে। এক সময় মিসর হবে ইসলামী দেশ। রোমানরা মিসরে থাকতে পারবে না। মিসর ছেড়ে তাদের যেতেই হবে। মুসলমানরা যদি মিসর আক্রমণ করে তাহলে মিসরের খ্রিস্টানরা নিরব দর্শকের ন্যায় তামাশা দেখতে থাকবে। আর এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, রোমানরা খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও মিসরের খ্রিস্টানরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। বরং মুসলমানদেরকেই তারা স্বাগতম জানাবে।

তোমরা ফিরে যাও। রোমানদের বিরুদ্ধে মিসরের খ্রিস্টানদের উস্‌কে দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাই না। আমাদের সে অস্ত্র ও জনবল নেই। আমরা রোমানদের এই ধোঁকায় ফেলে রাখব যে, আমরা তাদের ওফাদারও হিতাকাঙ্ক্ষী প্রজা। আমরা তাদের বিশ্বস্ত শুভানুধ্যায়ী গোলাম।

* * *

মুসলিম গুপ্তচরদের মিশন সফল হল। মিসরের অন্য কোন অঞ্চলে গিয়ে খ্রিস্টানদেরকে রোমানদের বিরুদ্ধে উস্‌কে দেয়ার বা বিদ্রোহ করানোর প্রয়োজন অনুভব করল না। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় নেতা তাদের সে প্রয়োজন পূরণ করে দিয়েছে। ওয়াইস একটু বেশী সফল হল। তারা বিন ইয়ামীন থেকে বিদায় নিয়ে কাউস এলাকায় এসে পৌঁছল এবং সেখানেই রাত কাটাল।

খুব ভোরে যখন দু'একটি কাক কা কা করে উঠেছে তখন তারা ভাড়া করা উটে করে ইস্কান্দারিয়ায় রওয়ানা হয়ে গেল। তারা আশঙ্কা করছিল, যদি কেউ রাবেয়াকে চিনতে পারে তাহলে মহাবিপদ হবে। তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার নীল নদে নিক্ষেপ করবে। ভাগ্য প্রসন্নই বলতে হয়। বন্দরে পৌঁছার সাথে সাথেই তারা একটি জাহাজ পেয়ে গেল।

তারা মিসর থেকে ফিরে এসে শুনল, সিপাহ্ সালার আমর ইবনে আস (রা.) বাইতুল মুকাদ্দাসে আছেন। তারা বন্দর থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। আমর ইবনে আস (রা.) যখন শুনতে পেলেন যে, মিসরে প্রেরিত গুপ্তচর তিনজন ফিরে এসেছে, তারা আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী। সাথে সাথে তিনি তাদের ডেকে পাঠালেন।

সিপাহ্ সালার তাদের জিজ্ঞেস করলেন, কি করে এলে?

দলপতি তখন মিসরের কার্যাবলী একে একে উপস্থাপন করল এবং পাদ্রী নেতা বিন ইয়ামীনের কথা হুবহু শোনাল।

তারপর দলপতি বলল, এটা তো পাদ্রী বিন ইয়ামীনের কথা। তাছাড়া আমরাও মিসরের সব শ্রেণীর মানুষের সাথে কথাবার্তা বলেছি। গির্জায়, সরাইখানায়, হাটে-বাজারে, শহরে-বন্দরে, সবার সাথে রোমানদের ব্যাপারে আলোচনা করেছি। দেখেছি, তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, অতিষ্ঠ।

আমর ইবনে আস (রা.) বললেন, বিন ইয়ামীন যা বলে দিয়েছে তাই শেষ কথা। এরপর আর কিছু বলার থাকে না।

একজন বলল, সিপাহ সালার মহোদয়! আমার একটি পরামর্শ, যদি মিসরে আক্রমণ করতে হয় তাহলে আর দেরি নয়। এখনই আক্রমণ করতে হবে। রোমান সৈন্য শারীরিক ও মানসিক ভাবে একেবারে ভেঙে পড়েছে। তাছাড়া মিসরের খ্রিস্টান জনতা এখন তাদের দুশমন। এ অবস্থায় আক্রমণ করলে আমরা প্রায় বিনা যুদ্ধেই মিসর পদানত করতে পারব।

গুপ্তচরদের রিপোর্টে আমর ইবনে আস (রা.) দারুণ বিমুগ্ধ হলেন। বললেন, আমি এখন সবার আগে মদীনায় যাব। এবং আমীলুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.) থেকে মিসর আক্রমণের অনুমতি নিয়ে তবে ফিরে আসব।

মূল আলোচনা শেষ হলে তারা রাবেয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করল। রাবেয়া তখন বাইরে বসে ছিল। ওয়াইস বলল, সিপাহ সালার যেন রাবেয়ার সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

আমর ইবনে আস (রা.) রাবেয়াকে ভিতরে ডেকে নিলেন। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কিভাবে ওয়াইসের নিকট এল। রাবেয়া ঐ কাহিনীই শোনাল যা গুপ্তচর সিপাহ সালারকে শুনিয়েছে। আসলে এ প্রশ্ন করে তিনি ঘটনার সত্যতা যাচাই করলেন। আর একথাও বুঝতে চেষ্টা করলেন যে, এ অল্প বয়সী কুমারীর উপর কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে না তো!

রাবেয়ার কথা শুনে আমর ইবনে আস (রা.) নিশ্চিত হলেন। তারপর রাবেয়াও নিজের বিয়ের আগ্রহ প্রকাশ করলে সিপাহ সালার আমর ইবনে আস (রা.) ওয়াইস ও রাবেয়ার বিয়ে সম্পন্ন করে দিলেন।

* * *

আমর ইবনে আস (রা.) মদীনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁর বিশ্বাস, এবার তিনি মিসর আক্রমণের অনুমতি পাবেন। তিন চারদিন পর মদীনা থেকে আমীরুল মু'মিনীনের এক দূত এক চিঠি নিয়ে এল। চিঠি পড়ে তার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে গেল। আমর ইবনে আস (রা.) এর মত সাহসী লোকের হাতও কাঁপতে লাগল। চিঠির মর্ম ভাষা—

আমর ইবনে আস (রা.)! আসসালামু আলাইকুম, তুমি কি আমাকে আমার সাথীদেরকে যারা আমার জিম্মায় রয়েছে তাদের ধ্বংস হওয়া দেখবে? আর তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে জীবিত থাকবে? সাহায্য পাঠাও, সাহায্য, সাহায্য!

আমর ইবনে আস (রা.) দূতকে জিজ্ঞেস করলেন, কি বিপদ এসেছে?

বার্তাবাহক উত্তরে বলল, দুর্ভিক্ষ। আরবের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত সর্বত্র মহা দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। মানুষ আর পশু না খেয়ে না খেয়ে ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করতে করতে মৃত্যুবরণ করছে। আমি বলতে পারব না, ফিরে যাওয়ার পূর্বে আর কতজন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। খাবারের জন্য কোথাও শস্য পাওয়া যাচ্ছে না। পানির অভাবে মানুষ ছটফট করছে। দুধের পশুগুলো হাড়ের খাঁচা হয়ে একের পর এক মরছে। এটা হিজরী ১৮ সাল মুতাবেক ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দের কথা।

এরপর আমর ইবনে আস (রা.) আমীরুল মু'মিনীনের পত্রের উত্তরে লিখলেন ঃ

আমীরুল মু'মিনীনের নামে,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওবারাকাতুহু,

আপনি কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি খাদ্য সামগ্রী সহ এক কাফেলা পাঠাচ্ছি যার শুরু অংশ আপনার নিকট গিয়ে পৌঁছবে আর শেষ অংশ আমার নিকট থাকবে।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এ ধরনে পত্র শামে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিকট এবং আবু উবায়দা (রা.)-এর নিকটও প্রেরণ করেছিলেন। তারা শামের আঞ্চলিক শাসক ও সিপাহ্ সালার ছিলেন। এ ধরনের পত্র ইরাকের গভর্নর ও সিপাহ্ সালার সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (র.)-এ নিকটও প্রেরণ করেছিলেন। আমর ইবনে আস (রা.)-এর মত তাঁরাও উত্তর পাঠালেন।

তারপরই মদীনায় একের পর এক খাদ্য বোঝাই বিশাল বিশাল কাফেলা আসতে শুরু করল। আমর ইবনে আস (রা.) ফিলিস্তিন থেকে আটা ও ঘিয়ে বোঝাই করা এক হাজার উটের কাফেলা স্থল পথে পাঠালেন এবং আকাবা বন্দর

থেকে বহু জাহাজ বোঝাই করে জল পথে খাবার-খাদ্য সামগ্রী পাঠালেন। এ ছাড়া পাঁচ হাজার কম্বলও পাঠালেন।

শাম থেকে হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) আটা ও ঘিয়ে বোঝাই করা তিন হাজার উটের কাফেলা পাঠালেন তা ছাড়া তিন হাজার জামাও প্রেরণ করলেন।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) ইরাক থেকে খাদ্য শস্যে বোঝাই করা এক হাজার উট প্রেরণ করলেন।

শামের এক অঞ্চলের আমীর ও সিপাহ সালার হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.) চার হাজার উটের পিঠে খাদ্য শস্য বোঝাই করা কাফেলা নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলেন।

হযরত উমর (রা.) এতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাকেই এ খাদ্য বন্টনের দায়িত্ব দিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, আবু উবায়দাকে এই পরিশ্রমের জন্য চার হাজার দেরহমা দিয়ে দাও।

আবু উবায়দা (রা.) এ কথা শুনে বিস্মিত হলেন। বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার এ বিনিময়ের প্রয়োজন নেই। আমি তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এ কাজটুকু করেছি। আমার এ কাজকে আপনি দুনিয়ার দিকে ঠেলে দিবেন না।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি তো এর বিনিময় চাও নি। তাই তা নেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমের সাথে আমার এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল। তুমি এখন আমাকে যা বলেছো আমিও তাই রাসূলের নিকট বলেছিলাম। রাসূল আমার কথা কবুল করে নিয়ে আমাকে মূল্য নিতে বাধ্য করেছিলেন।

অবশেষে আবু উবায়দা (রা.) চার হাজার দেরহাম নিয়ে নিলেন এবং আবার শামের সে অঞ্চলে ফিরে গেলেন।

* * *

আকাশ পরিষ্কার। মেঘের কোন চিহ্ন নেই। ক্ষীপ্ত সূর্য পৃথিবীতে শুধু আগুন আর আগুন ঝরাচ্ছে। জমি-জমার মাটি শুকিয়ে চৌচির হয়ে গেছে। আবহাওয়া প্রতিকূল দেখে কৃষকরা জমিনে চাষ করা বন্ধ করে দিয়েছে। চারদিকে যেন আগুন আর আগুন। জমিনের সকল ঘাস পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। শাক-সবজি যা কিছু মাটির উপর ছিল তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

খেজুর বাগানের অবস্থা আরো করুণ। খেজুর গাছে কাঁদির কোন নাম নিশানা নেই। স্তবকের কোন চিহ্ন নেই। বাগানে সবুজের কোন আলামত নেই। পাতাগুলো শুকিয়ে শুকিয়ে মরে গেছে। কচি কোন পাতা দেখা যায় না। শুকনো

কাঠির মত গাছগুলো দাঁড়িয়ে যেন বাঁচার জন্য নিরবে আর্তনাদ করছে। গরু, বকরী, মহিষ আর মেষগুলো দিনে দিনে মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অনাহারে মানুষও মরতে শুরু করেছে। যারা ধন-সম্পদশালী তারাও ভীষণ কষ্টে আছে। কারণ বাজারে খাদ্যই নেই; কিনবে কোথা থেকে। সম্পদের জায়গায় সম্পদ পড়ে রইল। আর অনাহারে সম্পদশালীরা মরতে লাগল।

ইরাক, শাম আর ফিলিস্তিন থেকে যে খাদ্যের কাফেলা এসেছে হযরত ওমর (রা.) সেইসব কাফেলার লোকদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন দুর্দশাগ্রস্থ, ক্ষুধা-আক্রান্ত এলাকায় গিয়ে তা বণ্টন করে দেয়। তিনি নির্দেশ দিলেন, কাফেলার উটগুলোকে যবাই করে তার গোশ্‌ত বিতরণ করে দিবে। কারণ দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চলে একটি উটও জীবিত নেই। সব মরে গেছে। যদিও দু'একটি বেঁচে থাকে তাহলে তা হাড়ের খাঁচা। গোশতের তাতে কোন নাম নিশানা নেই। কাফেলাগুলোর সাথে প্রায় দশ হাজার উট এসেছিল। সবগুলো উট যবাই করে ক্ষুধাপীড়িত মানুষের মাঝে বিতরণ করা হল।

ইসলামী খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র মদীনা নগরী। এ নগরীতে খলীফা বসবাস করেন। খলীফার সহকর্মী পরামর্শদাতা সাহাবায়ে কেরাম বসবাস করেন। এ শহরে রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সমাধী। তাই এ নগরী গোটা আরবের প্রাণকেন্দ্র। গোটা ইসলামী জাহানের হৃদপিণ্ড।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষেরা অনন্যোপায় হয়ে দলে দলে মদীনায় এসে আশ্রয় নিতে লাগল। তাদের চোখে মুখে একটু আশা একটু ভরসা, হয়তো মদীনায় গেলে একমুঠো খাবার মিলবে। ছেলেপুলে নিয়ে জীবনটা ধরে রাখা সম্ভব হবে।

হযরত উমর (রা.) মদীনাবাসীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন প্রতিদিন দ্বিগুণ খাবার তৈরী করে। এবং আশ্রিত ব্যক্তিদের খাবার দান করে। মদীনার লোকেরা অম্লান বদনে তা মেনে নিল। এভাবে কয়েকদিন চলল। কিন্তু শরণার্থীদের সংখ্যা প্রত্যেক বেলায়ই বেড়ে চলছে। হযরত উমর (রা.) অস্থির বেকারার। সারাক্ষণ ঘুরে ঘুরে মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। মানুষের খোঁজ খবর নেন। মদীনার লোকদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও শরণার্থীদের বেশ কিছু লোক ক্ষুধার্ত থেকে যেতে লাগল।

আবার চিন্তিত হয়ে পড়লেন হযরত উমর (রা.)। কী করবেন। কী ব্যবস্থা নিবেন। অস্থির ভাবে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ তাঁর মাথায় এক নতুন চিন্তা এল। ব্যস্ আর দেরি করলেন না। মদীনার লোকদের জানিয়ে দিলেন, এখন থেকে আর কেউ নিজ নিজ ঘরে আলাদাভাবে খাবার তৈরী করবে না। সবার খাদ্য এক স্থানে জমা করে সম্মিলিতভাবে তৈরী করা হবে। সবাই একই দস্তরখানে বসে খাবার খাবে। আমীরুল মু'মিনীন নিজ ঘর থেকে তা শুরু

করলেন। মদীনা নগরীর খাবার এক জায়গায় তৈরী হতে লাগল। সবাই একই দস্তরখানায় বসে খেতে আরম্ভ করল। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.)-এর ঘরেও পাক বন্ধ হয়ে গেল। তিনি তার পরিজনদের নিয়ে সবার সাথে সম্মিলিত দস্তরখানায় খাওয়া দাওয়া শুরু করলেন।

প্রত্যেক দিন দু'বেলা সম্মিলিত খাবারের আয়োজন হয়। প্রত্যেক বেলা দশ হাজরের চেয়ে বেশী লোক এ সম্মিলিত দস্তরখানায় বসে আহার গ্রহণ করে। যারা অসুস্থ, বৃদ্ধ, যাতায়াতে অক্ষম, তাদের খাবার পৌঁছে দেয়া হয়। নারী ও শিশুদের খাবারও পৌঁছে দেয়া হয়। এদের সংখ্যাও পঞ্চাশ হাজারের কম হবে না।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.) সবার সাথে বসে সম্মিলিত দস্তরখানায় খাবার খান। একদিন হযরত ওমর (রা.) খেতে বসলেন। ঘটনাক্রমে তাঁর সাথে এক বেদুইন একই পাত্রে খেতে বসেছে। সেদিন রুটি আর ঘি পরিবেশন করা হয়েছিল। বেদুইন হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ শুরু করল। লোকটি বেশী বেশী ঘি নিয়ে বড় বড় লোকমরা দিয়ে খাওয়া শুরু করল। হযরত ওমর (রা.) বেদুইনের এ কাণ্ড দেখে বিস্মিত হলেন। বললেন, ভাই! তুমি কি ঘি দিয়ে রুটি খাওনি?

বেদুইন বিষয়টি বুঝতে না পেরে হেড়ে গলায় বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! দুর্ভিক্ষ আসার পর থেকে ঘি দেখিনি, রুটিও দেখিনি। তাই ঘি আর রুটি ইচ্ছামত খেয়ে নিচ্ছি।

একথা শুনে আমীরুল মু'মিনীনের চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেল। তিনি কসম করে বললেন, যতদিন পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ শেষ না হবে ততদিন আমি আর ঘি ও রুটি দ্বারা খাবার গ্রহণ করব না। এরপর তার মনে আরো ভাঙন সৃষ্টি হল। সবাই দেখতে লাগল, হযরত ওমর (রা.) গোশত খাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছেন। তার অবস্থা এমন হল যে, সারাক্ষণ শরণার্থীদের অবস্থা দেখছেন। যারা মদীনার বাইরে দূরে দূরে আছে তাদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। প্রয়োজনে গিয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসছেন। জিজ্ঞেস করছেন, তাদের নিকট নিয়মিত খাবার পৌঁছছে কি না?

পেরেশানীর পর পেরেশানী, কষ্টের পর কষ্টের প্রভাব তার শরীরে দেখা দিল। তাছাড়া দৈনন্দিনের খাবারও তিনি কমিয়ে দিয়েছেন। ফলে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে লাগল। রক্তশূন্য হয়ে শরীর ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ক্রমেই শরীর শুকিয়ে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন। তার সঙ্গীরা ও ঘনিষ্ট লোকেরা তাকে নিয়ে দারুণ পেরেশানীতে পড়ে গেল। যদি তিনি রীতিমত প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ না করেন তাহলে তো তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবেন।

বর্ষীয়ান গণ্যমান্য সাহাবীদের কয়েকজন তাঁকে বললেন, আপনি বিশ্রাম করেন না বা না করেন সে ব্যাপারে আমরা আপনাকে কিছু বলব না, কিন্তু প্রত্যেক দিনের পরিমাণ মত খাবারটুকু তো আপনি গ্রহণ করবেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (রা.) তাদের কথা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না। বললেন, মানুষের কষ্টের অনুভূতি আমি এভাবেই অনুভব করি। সুতরাং আমার অবস্থা নিয়ে আপনারা চিন্তা করবেন না।

এদিকে হযরত ওমর (রা.) সময় পেলেই ছুটে গিয়ে জায়নামাজে দাঁড়ান। আল্লাহ্‌র দরবারে লুটিয়ে পড়েন। নামায আদায় করেন। তারপর এক সকরুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। দু'হাত প্রসারিত করে কাঁদতে থাকেন। অবিরাম অশ্রু ঝরতে থাকে তার চোখ থেকে। কেঁদে কেঁদে বলেন, হে আল্লাহ্! যদি এ মহা দুর্ভিক্ষ আমার পাপের কারণে হয়ে থাকে তাহলে তার শাস্তি আমাকে দিন। আমার জাতিকে দিবেন না।

এতো কাঁদছেন, এতো দু'আ করছেন, কিন্তু দু'আ কবুল হচ্ছে না। আকাশে কোন মেঘের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সূর্য আগুনের হলকা বর্ষণ করে চলছে। পৃথিবী জ্বলে পুড়ে তামা হয়ে যাচ্ছে।

* * *

আকাশ যেন আরবদের বৈরী হয়ে গেছে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (রা.)-এর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও দেখা শোনাতে মানুষ অনাহার আর ক্ষুধার জ্বালা থেকে রক্ষা পেলেও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা পেল না। পরিবেশের উত্তাপ ক্রমেই বেড় চলল। সূর্যও নির্মমভাবে অগ্নি বর্ষণ করতে থাকল। বাতাসের গায়ে শুধু আগুনের হলকা।

এদিকে হযরত ওমর (রা.)-এর শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। এতে সাহাবায়ে কেরাম দারুণ চিন্তিত, অত্যন্ত পেরেশান। কারণ তিনি পুষ্টিকর খাবার একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন। ঘি, গোশত এ ধরনের খাবারে হাত পর্যন্ত দেন না। তিনি বলেন, আরবের প্রতিটি লোক যখন এ ধরনের খাবার খেতে পারবে তখনই আমি এ ধরনের খাবার খাব।

একদিন এক ঘটনা ঘটল। হযরত ওমর (রা.) এর কিছু অন্তরঙ্গ লোক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, তাঁকে আজ কিছু ভাল খাবার অবশ্যই খাওয়াবেন। তারা তাকে সাধারণ দস্তরখানা থেকে সরিয়ে একটু দূরে বসালেন। গোশতের সাথে ঘিয়ে ভাজা রুটি তাকে দেয়া হল। তারা বিভিন্ন কথায় মশগুল হয়ে পড়ল। তাদের ধারণা, হয়তো কথার তালে তালে হযরত ওমর (রা.) কি খাচ্ছেন সেদিকে কোন খেয়াল করবেন না। বেখেয়ালে গোশ্‌ত দিয়ে ঘিয়ে ভাজা রুটি

খেয়ে ফেলবেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) দারুণ সচেতন। তিনি কাউকে কিছু বললেন না। হাত দিয়ে খাবারগুলো সরিয়ে রাখলেন। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, ভাইয়েরা! যাও, দস্তরখানায় ঘুরে ঘুরে দেখ। যে ব্যক্তি অনাহারে অর্ধাহারে একেবার শীর্ণকায় হয়ে গেছে তাকে এ খাবার দিয়ে দাও। আমার তো সাধারণ রুটি আর সামান্য তরকারীই যথেষ্ট।

সেদিন সন্ধ্যায় হযরত ওমর (রা.) নির্দেশ দিলেন, যারা সাধারণ দস্তরখানায় খাবার খায় তাদের সংখ্যা গণনা করা হোক। গণনা করে দেখা গেল, সাত হাজারের চেয়ে কিছু বেশী লোক সাধারণ দস্তরখানায় বসে আহার খায়। আর বৃদ্ধ, অসুস্থ, নারী ও শিশুরা যারা দস্তরখানায় উপস্থিত হয় না এবং তাদের খাবার তাদের নিকট পৌঁছে দেয়া হয় তাদের সংখ্যা চল্লিশ হাজারেরও বেশী।

সে রাতেও আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (রা.) সাধারণ মানুষের সাথে বসে সাধারণ খাবার খেলেন। তিনি পানি চাইলে মধু মিশ্রিত পানি তাকে দেয়া হল। এক ঢোক পানি পান করেই তা ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমি এমন কাজ করব না কিয়ামত দিবসে যার জওয়াব দিতে হবে।

আরেক দিনের ঘটনা। হযরত ওমর (রা.) দেখলেন, তার এক ছোট্ট ছেলে একটুকরো তরমুজ খাচ্ছে। সাথে সাথে তার চেহারার রং পাল্টে গেল। কণ্ঠস্বর কঠোর হয়ে গেল। বললেন, 'বাহ্বা, দেখ দেখ আমীরুল মু'মিনীনের ছেলে ফল খাচ্ছে আর রাসূলের উম্মতরা অনাহারে মরছে!'

পুত্র তার পিতার কঠোর স্বভাব জানত। ভয়ে সে কেঁদে ফেলল। এতেই হযরত উমরের ক্রোধ শান্ত হল না। তখন জনৈক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বলল, ছেলেটি কয়েকটি খেজুর দিয়ে তার বিনিয়ে তরমুজের এই টুকরাটি নিয়েছে। এবার হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রোধ শান্ত হতে শুরু করল। ধীরে ধীরে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন।

* * *

দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা বেড়েই চলল। প্রকৃতির রুক্ষতা যেন আর শেষ হয় না। ইরাক আর শাম থেকে কাফেলার পর কাফেলা আসছে। খাদ্যে বোঝাই উট আসছে। সুশৃঙ্খলতার সাথে খাদ্য বণ্টন হচ্ছে। মদীনা, তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ও দূর দূরান্তে তা বিতরণ করা হচ্ছে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (রা.) নিজে তার তদারকী করছেন। দেখাশোনা করছেন। দেখতে দেখতে ছয় সাত মাস কেটে গেল।

একদিন হযরত ওমর (রা.) মদীনা থেকে একটু দূরে এক পল্লী দিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ তার কানে স্বজন হারানোর কান্নার আওয়াজ এল। এক

মহিলার যুবক পুত্র এবং আরেক মহিলার স্বামী মারা গেছে। হযরত ওমর (রা.) গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এরা তো অনাহারে মারা যায়নি? উত্তর পেলেন যে, না তারা অনাহারে মারা যায়নি। হযরত ওমর (রা.)-এর হৃদয় কিছুটা শান্ত্বনা খুঁজে পেল। শুনলেন, এক অজ্ঞাত রোগের কারণে তারা মারা গেছে যা তারা বুঝতেও পারেনি।

সাথে সাথে হযরত ওমর (রা.) বাইতুল মাল থেকে তাদের কাফনের ব্যবস্থা করলেন। নিজেই তাদের জানাযার নামায পড়ালেন ও দাফনের ব্যবস্থা করলেন।

দেখতে দেখতে এ অজানা রোগ চারদিকে ছড়িয়ে গেল। রোগাক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসারও কোন সময় পাওয়া যায় না। এ রোগ মহামারী আকার ধারণ করল। আমীরুল মু'মিনীনের শান্তি দূর হয়ে গেল। একটু আধটু যাও বিশ্রাম নিতেন তাও এখন শেষ হয়ে গেল। গ্রামের পর গ্রাম, পল্লীর পর পল্লীতে তিনি ছুটতে লাগলেন। চিৎিসকদের চিন্তার শেষ নেই। তাদের ঔষধ কোন কাজে আসছে না। ঔষধ প্রয়োগে রোগী সাথে সাথে মারা না গেলেও কয়েকদিন মাত্র বেঁচে থাকে।

চিকিৎসকদের ধারণা, দীর্ঘ খরা, প্রচণ্ড তাপদগ্ধতা আর উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহের কারণে এ মহামারী দেখা দিয়েছে। হযরত ওমর (রা.) হুকুম দিলেন, এ রোগে আক্রান্ত হয়ে যারা ইন্তেকাল করবে তাদের কাফন দাফনের ব্যবস্থা বাইতুল মালের পক্ষ থেকে করা হবে। সম্ভাব্য সকল জায়গায় গিয়ে হযরত ওমর (রা.) মৃতদের জানাযার নামায পড়াতেন ও দাফনে শরীক হতেন।

হযরত ওমর (রা.) জানাযার নামাযে গেলে এখন কারো কারো কাছ থেকে শুনতে লাগলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ক্ষুধার হাত থেকে তো আমরা বাঁচলাম। কিন্তু এখন এ মহামারী থেকে বাঁচার উপায় কি? অথবা কেউ হয়তো বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! রুটির ব্যবস্থা তো আপনি করেছেন, কিন্তু এখন বাঁচবো কোন উপায়ে?

অজ্ঞাত এ রোগের কারণে গোটা আরবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। এর আগে হযরত ওমর (রা.) প্রত্যেক নামাযের পর দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার দু'আ করতেন। এ অজ্ঞাত রোগ আক্রমণ করার পর থেকে তিনি রাতের ঘুম ছেড়ে দিলেন। সারারাত নামায পড়েন আর বিনয় বিগলিত নেত্রে আল্লাহর নিকট দু'আ করেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শিশুর ন্যায় কাঁদেন আর বলেন, হে আল্লাহ্! হে দয়াময় খোদা! হে গাফুরুর রাহীম! আমার পাপের শাস্তি আপনি আপনার রাসূলের উম্মতেদের দিয়েন না। হে আল্লাহ্! আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমাদের এই বিপদ থেকে মুক্তি দিন। কিন্তু আকাশ যেন বন্ধ হয়ে গেছে। দু'আ যেন আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছছে না।

* * *

অবশেষে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (রা.) একেবারে নিরূপায় হয়ে গেলেন। সকল প্রচেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে গেল। মৃত্যুর হাত থেকে তিনি আর কাউকে বাঁচাতে পারছেন না। এ মহামারী যেন আরবকে মানবমুক্ত করে ছাড়বে।

তিনি চারদিকে এ পয়গাম দিয়ে পাঠালেন, যেন সকল অঞ্চলের লোক নিজ নিজ অঞ্চলে একত্রিত হয়ে ইসতেসকার নামায পড়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করে যেন আল্লাহ্ আমাদের এ মহা আযাব থেকে মুক্তি দান করেন। আর যারা রাতেই মদীনায় এসে পৌঁছতে পারে তারা যেন মদীনায় চলে আসে।

দূতরা সাথে সাথে রওয়ানা হয়ে গেল। দূর দূরান্তের দূতরা রাতেও বিরামহীন গতিতে চলতে লাগল। পরদিন দুপুরে মদীনায় ইস্‌তেস্‌কার নামাযের সময় নির্ধারণ করা হল। প্রত্যেক অঞ্চলের লোক সময় নির্ধারণ করে ইস্‌তেস্‌কার নামাযের আয়োজন করল।

পরদিন দুপুরে মদীনার লোকেরা, শরণার্থীরা ও নবাগত লোকেরা মদীনার বাইরে এক বিশাল চত্বরে সমবেত হল। প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার মানুষ দুপুরের অগ্নিঝরা রোদে সারিবদ্ধভাবে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেল। মাটি যেন জ্বলন্ত কয়লা। তাতে খালি পা রাখার কথা চিন্তা করাই যায় না। কিন্তু আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশে সবাই এসে সমবেত হল। হযরত ওমর (রা.) নামায পড়ানোর জন্য সামনে অগ্রসর হলেন। তার শরীরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত চাদর। নামায শুরু হতে না হতেই চারদিকে কান্নার আওয়াজ উত্থিত হল। সবাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। হাজার হাজার নিরূপায় অক্ষম মানুষ আল্লাহ্‌র সামনে তাদের নিবেদন পেশ করছে, ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে। আযাব থেকে মুক্তি চাচ্ছে। হযরত ওমর (রা.)ও নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। নামাযের শেষ পর্যন্ত তিনি কাঁদতেই থাকলেন।

নামাযের পর হযরত ওমর (রা.) দু'আ শুরু করলেন। কিন্তু কান্নার কারণে তার কোন কথাই বুঝা গেল না। অবুঝ শিশুর মত তিনি দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। তার দাড়ি মোবারক বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরল। হযরত আব্বাস (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে বসা ছিলেন। দু'আ চলাকালীন অবস্থায়ই তিনি আব্বাস (রা.)-এর বাহু ধরে কাছে টেনে আনলেন এবং তার দু'হাত দু'আ করার ন্যায় তুলে ধরলেন ও বললেন, হে আল্লাহ! আমরা আপনার রাসূলের চাচাকে আপনার নিকট সুপারিশ হিসাবে উপস্থিত করছি। হে আল্লাহ্! আপনি তাঁর দু'আ কবুল করে আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। আমাদের বাঁচান।

হযরত আব্বাস (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর চেয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, হে পরওয়ার দেগার! আপনার রাসূলের উছিলায় আমাদের উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ

করুন। প্রবল আবেগ ও কান্নার মাঝে হযরত আব্বাস (রা.)-এর কণ্ঠ হারিয়ে গেল।

মদীনা থেকে দূর দূরান্ত এলাকায় যেখানেই হযরত ওমর (রা.)-এর পয়গাম পৌঁছেছে সেখানেই মানুষ ইসতেসকার নামাযের আয়োজন করে নামায আদায় করেছে। সবাই রোরুদ্ধ কণ্ঠে কেঁদেছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চেয়ে প্রার্থনা করেছে।

সেদিনের সূর্যও প্রচণ্ড প্রতাপের সাথে অগ্নিবর্ষণ করতে করতে অস্তমিত হয়ে গেল। চারদিকে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। কিন্তু রাতের পর যে সকাল এল তা দেখে সবাই যেন তাদের চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সূর্য যেন আজ আর উদিত হচ্ছে না। মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে মেঘ ধেয়ে আসছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ পড়ছে। সে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। মানুষ এ দৃশ্য দেখে ঘরে মসজিদে সর্বত্র আল্লাহর দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়া। হু হু করে কান্না এল হৃদয় চিরে। এ কান্না বিষাদের নয়, হর্ষের। এ কান্না দুঃখের নয়, আনন্দের।

এরপর নেমে এল বৃষ্টি। মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে তো হয়েছে। থামতে যেন আর চায় না। দীর্ঘ নয় মাসের পিপাসার্ত জমিন আল্লাহর রহমতের বৃষ্টিতে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। মৃত গাছপালার জীবন সংগ্রাম শেষ হল। মরতে মরতে তারা বেঁচে গেল। উপত্যকা আর নিচু অঞ্চল পানিতে ভরে গেল। প্রকৃতি আবার শান্ত হয়ে গেল।

দুই তিন দিন লাগাতার বৃষ্টিপাতের পর এখন থেমে থেমে বৃষ্টি হতে লাগল। মদীনায় যে পঞ্চাশ ষাট হাজার শরণার্থী এসেছিল, প্রায় নয়মাস থেকে যারা উন্মুক্ত দস্তরখানার খাবার খেয়ে আসছে তাদের মাঝে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। হযরত ওমর (রা.) এসে তাদের যার যার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার তাকীদ দিলেন। একে একে সবাই আবার মদীনা ছেড়ে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেল। নিজ নিজ কাজে আত্মনিয়োগ করল।

* * *

একমাত্র কন্যা। হৃদয়ের সকল সুষমা দিয়ে যাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছে। যার মায়া আর মমতা হোরসীসকে উতালা করে রাখত সেই মেয়েকে হারিয়ে হোরসীস পাগল হয়ে গেল। তার চিন্তাশক্তি যেন হঠাৎ বিকল হয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল, এটা পাদ্রীদের কাণ্ড। তারাই ষড়যন্ত্র করে রোজীকে ছেড়ে দিয়েছে আর আমার মেয়েকে হত্যার নীল নক্সা তৈরী করেছে। পাদ্রী ও তার সহচরদের মাঝেই সকল প্যাঁচ। এরাই সকল অনিষ্টের মূল। সুতরাং এদের আর ক্ষমা করা যায় না। প্রতিশোধ এদের থেকে নিতেই হবে।

আদরের মেয়েকে হারিয়েছে, জীবনের সকল সঞ্চয় মহামূল্যবান অলঙ্কারগুলো হারিয়েছে। হোরসীস এখন প্রতিশোধ স্পৃহায় অধীর, অস্থির। ধর্মের অনুশাসনের কথা সে একেবারেই ভুলে গেল। পল্লী থেকে তিন চার মাইল দূরে রোমান সৈন্যদের একটি ক্যাম্প। সেখানে একজন সেনা অফিসার, একজন সহকারী ও বেশ কিছু সৈন্য অবস্থান করে। নীল নদের তীরে এ ধরনের বহু ক্যাম্প বিদ্যমান। এ ক্যাম্পের সৈন্যদের দায়িত্ব তারা চারদিকে টহল দিবে ও খবরাখবর রাখবে যে, নীল নদে কোন মেয়েকে বিসর্জন দেয়া হয় কি না। এ ধরনের কোন সংবাদ পেলেই তারা সেখানে ছুটে যায়। উদ্যোক্তাদের গ্রেফতার করে এনে আইনের হাতে সোপর্দ করে। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের রাজকীয় আইনে এ অপরাধ হত্যার মতই গুরুতর। কোন ক্রমেই এদের ক্ষমা করা হয় না।

হঠাৎ হোরসীসের অন্তরে সেই ক্যাম্পের কথা মনে হল। আর সাথে সাথে প্রতিশোধের আগুন যেন তার হৃদয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হোরসীস সেই ক্যাম্পের দিকে ছুটে গেল। ক্যাম্পের অফিসারকে বলল, তাদের পাদ্রী তার মেয়েকে জোর করে নিয়ে গিয়ে নীল নদে বিসর্জন দিয়েছে।

রোমান অফিসার একথা শুনে ক্ষেপে উঠল। কী! এতো বড় সাহস। আমরা জীবিত থাকতে ধর্মের নামে এ অনাচার! নির্মমভাবে মানব হত্যা! মানবতার এ কলঙ্ককে কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। সাথে সাথে সে বেরিয়ে পড়তে প্রস্তুত হল।

হোরসীসের এবার হুঁশ ফিরে এসেছে। ভাবল, সমাজে থাকতে হলে সামাজিক অনুশাসন মানা ছাড়া উপায় নেই। অন্যথায় সবাই তাকে বয়কট করবে। তাই সকলের উপর এই রোমান আপদ চাপিয়ে দিতে হবে। হোরসীস অফিসারকে বিনয়ের সাথে বলল, হুজুর! আপনি যদি এভাবে গিয়ে পল্লীতে তুলকামাল কাণ্ড ঘটান তাহলে পল্লীর খ্রিস্টানরা আর আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। হুজুর! আমাকে ওরা মেরে ফেলবে। হোরসীসের কণ্ঠে কান্নার গমক ফুটে উঠল। হোরসীস বলল, হুজুর! আমি এখন একাকী ফিরে যাই। বেশ কিছু সময় পর আপনি আসুন। আমার সাথে আপনি এমনভাবে কথা বলবেন যেন আমিও আমার মেয়ের হত্যার কাজে শামিল ছিলাম।

বুদ্ধিমানের জন্য ইংগিত যথেষ্ট। অফিসারটি সবকিছু বুঝে ফেলল এবং হোরসীসকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। হোরসীস আশা নিরাশায় দুলতে দুলতে বাড়িতে ফিরে এল এবং বিষয়টি গোপন রাখল। এমন কি তার স্ত্রীকেও বলল না।

* * *

দ্বিপ্রহরের পর লোকেরা দেখল, পল্লীর দিকে কয়েকটি ঘোড়া ছুটে আসছে। দূর থেকে তারা ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে পেল। বিশ পঁচিশটি বাড়ি নিয়ে ছোট্ট একটি পল্লী। যারা বাইরে ছিল তারা আড়ালে সরে দাঁড়াল। আর ঘরের লোকেরা উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল। দেখল, রোমান ক্যাম্পের সৈন্যরা আসছে। তারা প্রায়ই আসে। পল্লীর খবরাখবর নেয়। আবার চলে যায়। কিন্তু আজকে তাদের আসার ভাব দেখে সবার হৃদয় দুরুদুরু করে কেঁপে উঠল।

তারা দেখল, অফিসারের ঘোড়াটি আগে আগে আসছে আর তার পিছনে আসছে প্রায় বিশজন সৈন্য। সবাই সশস্ত্র। যেন অভিযানে বেরিয়েছে। সৈন্যরা পল্লীটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। অফিসার ঘোষণা করল, কোন পুরুষ ও মহিলা পলায়নের চেষ্টা করবে না। সবাই বাড়ি ছেড়ে উন্মুক্ত এই মাঠে চলে এস।

পল্লীর লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। তারা মিসরী খ্রিস্টান। রাজকীয় খ্রিস্টান ধর্মের তারা ঘোর বিরোধী। তাছাড়া গত রাতেই তাদের গ্রামের হোরসীসের মেয়েকে নীল নদে বিসর্জন দেয়া হয়েছে। সাম্রাজ্যের আইনে তা মারাত্মক অপরাধ। তবে কি সৈন্যরা হোরসীসের মেয়ের কথা জেনে ফেলেছে?

রোমান অফিসারটি বলল, হোরসীস কে? যেই হও সামনে চলে আস। হোরসীস সামনে এগিয়ে এল। অফিসার ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। অন্যান্য সৈন্যকে ঘোড়া থেকে নেমে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল।

অফিসার একটু রুক্ষ ভাষায় বলল, তুমি কি গতরাতে তোমার মেয়েকে নীল নদে উৎসর্গ করেছো?

হোরসীস সবাইকে বুঝাতে চাইল যে, সে এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। রোমানদের কাছে সে কিছুই বলেনি। তাই বলল, না তো এমন কিছু তো ঘটেনি।

অফিসার ক্ষিপ্ত হওয়ার ভান করে বলল, আচ্ছা, তাই নাকি। তাহলে তোমার মেয়েকে নিয়ে এস। শোন, আমি জানি তোমার এক মেয়ে ছিল। আমি সন্দেহ বশে আসিনি। বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জেনেই তবে এসেছি। যদি তুমি সত্য বলে থাক, তাহলে তোমার মেয়েকে এখানে হাজির করে সত্যতা প্রমাণ করো। আমি তোমাকে অবকাশ দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরে ষোল সতের বছরের এক সুন্দরী মেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে রোমান অফিসারের সামনে দাঁড়াল। বলল, আমি তার মেয়ে। আমি বাড়িতে ছিলাম না। কিছু মেয়ের সাথে দাঁড়িয়ে অন্য বাড়ির ছাদের উপর থেকে দেখছিলাম যে কি হচ্ছে? এক ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে আমাকে বলল, আপনারা

আমার পিতার উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি আমাকে নীল নদে উৎসর্গ করেছেন। তাই আমি ছুটে এলাম।

অফিসারটি মুচকি হাসল। যেন বুঝে ফেলেছে যে তার সাথে তিরস্কার করা হচ্ছে। তাকে বেকুব বানানো হচ্ছে। অফিসারটি এক ব্যক্তিকে ডেকে কাছে এনে জিজ্ঞেস করল, এই মেয়ের পিতা কে?

ভয়ভীতি ছাড়াই লোকটি বলল, হোরসীস।

অফিসারটি আরেকজন লোককে ডেকে ঐ একই কথা জিজ্ঞেস করল। লোকটি বিস্মিত কণ্ঠে বলল, আপনার কাণ্ড দেখে আমি বিস্মিত ও মর্মাহত। আপনিকি আমাদের এতোই নির্বোধ মনে করেন যে, আমরা কে কার সন্তান তাও জানি না। এ মেয়েটি হোরসীসের। ওর নাম আইনী।

তারপর অফিসার গ্রামের সকল লোককে জিজ্ঞেস করল। পল্লীর সবাই সমকণ্ঠে বলল, আমরা সবাই জানি যে এটা হোরসীসের মেয়ে।

রোমান অফিসার বুঝতে পারল না যে, এরা চোখের ইশারায় নিজেদের কর্তব্য ঠিক করে নিয়েছে। কারণ তারা যদি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয় তাহলে আর তাদের রক্ষা নেই, হয়তো শাস্তি স্বরূপ তাদের গোটা পল্লী আগুনে ভস্ম হতে পারে। ভয়াবহ অন্য কিছু ঘটতে পারে। তাদের অবস্থা দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তার মনে হল, হয়তো হোরসীস তার ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ পূরণের জন্য তাকে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। সে ক্রোধে অধির হয়ে খপ করে হোরসীসের বাহু ধরে টানতে টানতে একদিকে নিয়ে গেল। অগ্নিঝরা কণ্ঠে বলল, তোর অন্তরে যে বদমায়েশী আছে তা বল। যদি না বিলস তাহলে এখানেই সবার সামনে তোর শির উড়িয়ে দেয়া হবে।

হোরসীস কাঁপতে কাঁপতে মৃদু কণ্ঠে বলল, হুজুর যদি আমি সত্য কথা বলি তাহলে এরা আমাকে মেরে ফেলবে। আমি সত্য বলব, তবে এদের হাত থেকে আমাকে বাঁচানো আপনার দায়িত্ব।

অফিসারটি বলল, সত্য বল।

হোরসীস বলল, এ মেয়েটি তার নয়। এটা অমুকের মেয়ে। মেয়ের মায়ের নাম পর্যন্ত বলে দিল।

এ পল্লীটি নীল নদের তীরের এক জেলে পল্লী। স্থানটি বেশ উঁচু। এখানে এসেই নদীটি বাঁক নিয়েছে। তাই এখানে স্রোত খুব বেশী ও ভয়ঙ্কর। এখানে মেয়েদের নদী বক্ষে উৎসর্গ করা হয়। ফলে প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর স্রোতে কেউ আর বাঁচতে পারে না।

রোমান অফিসার মেয়ের পিতা মাতাকে ডেকে আনল। জিজ্ঞেস করল, এ কার মেয়ে? উভয়ে উত্তরে বলল, হোরসীসের মেয়ে। ধর্মের ব্যাপারে তারা এতো

অন্ধ যে, দু'চারটি কথা বলার পরই মেয়ের মা ক্ষিপ্ত হয়ে কিছু মন্দ কথা বলে ফেলল। একথাও বলল, আপনারা আমাদের অপমানিত আর অপদস্ত করার জন্যই বার বার আসেন।

অফিসারটি এবার রহস্য উন্মোচন করার জন্য নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করল। সে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে গিয়ে নীল নদের একেবারে উঁচু তীরে দাঁড় করিয়ে দিল। দু'জন সৈন্যকে নির্দেশ দিল, তারা যেন মেয়েটিকে তীর থেকে একটু দূরে দাঁড় করিয়ে তার ডান ও বাম পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সে পল্লীর লোকদের বলল, আমি এখনই এই মেয়েকে নীল নদে নিক্ষেপ করব। যদি তার মা তাকে বাঁচাতে চায় তাহলে যেন সে তাকে এসে নিয়ে যায়। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তার মাতাপিতার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে না। আমি তোমাদের চিন্তা করার কিছু অবকাশ দিচ্ছি। তাড়াহুড়োর কোন দরকার নেই। ভালভাবে বুঝে নাও।

মেয়েটি নীলনদের তীরে দাঁড়িয়ে আছে। তার দু'পার্শ্বে দু' সৈন্য। রোমান অফিসারটি পল্লীবাসীদের ও মেয়েটির মাঝে পায়চারী করছে। অফিসার তথ্য উদ্ধারে দারুণ ব্যবস্থা নিয়েছে। কারণ, কোন মাতাই সহ্য করতে পারবে না যে, তার সন্তানকে তার চোখের সামনে এ নদীর এই ভয়ঙ্কর স্রোতের মাঝে নিক্ষেপ করা হবে আর সে নির্বিচার চিত্তে তা দেখবে। আসল পিতামাতার মতো তো হোরসীস ও তার স্ত্রীর স্নেহ মায়া ও মমতা হতেই পারে না। তাই এটাই আশা করা হচ্ছিল, মেয়েটির মা ছুটে এসে তার মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় লুটিয়ে পড়বে। তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু যা ঘটল তা কেউ কল্পনায়ও কখনো ভাবেনি।

হঠাৎ সবাই বিস্মিত নয়নে দেখল, পল্লীর এক পার্শ্ব থেকে এক ঘোড়া ধূলা উড়িয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে এল। সবাই সেদিকে তাকিয়ে রইল। অশ্বারোহী রোমান বাহিনীর একজন উচ্চ পদস্থ সৈন্য। চোখের পলকে তার ঘোড়াটি মেয়েটির দিকে ছুটে গেল।

অশ্বারোহী চিৎকার করে আওয়াজ দিল, আইনী হুঁশিয়ার! মেয়েটি দেখল, ঘোড়াটি তার দিকে ছুটে এসেই অশ্বারোহী হাত প্রসারিত করে তাকে তার পশ্চাতে তুলে নিতে চাচ্ছে। মেয়েটি চোখের পলকে তার পশ্চাতে উঠে বসল। ঠিক তখন যে সৈন্য দু'জন দু'পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ঘোড়ার সামনে এসে দাঁড়াল। সে তাদের এমনভাবে আঘাত করল যে তাদের একজন নদীবক্ষে গিয়ে পড়ল। আরেকজন ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল।

তারপরই ঘোড়া উল্কার গতিতে ছুটে চলল। মেয়েটি দু'হাতে অশ্বারোহীর কোমর ধরে আছে আর ঘোড়া ছুটে চলছে। রোমান সৈন্যদের ঘোড়া অদূরেই

দাঁড়িয়ে ছিল। আফিসার তার পশ্চাদ্ধাবন করতে নির্দেশ দিলেন।

নির্দেশ পেয়ে কয়েকজন সৈন্য ছুটে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ল। ঘোড়া ছুটল পিছু পিছু। কিন্তু ইতিমধ্যে সে ঘোড়া বহু দূর চলে গেছে। দূর থেকে শুধু তার পদধ্বনি শোনা যায়। ধূলি বালু উড়িয়ে সে বহুদূর চলে গেছে। পশ্চাদ্ধাবন করে আর কোন লাভ নেই। কারণ সামনে পাহাড়ী পথ ও ঝোঁপ ঝাড়। রোমান সৈন্যরা আরো কিছু দূর গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে এল।

* * *

রোমান এ সৈন্যের নাম ইবনে সামির। যুবক, সুশ্রী, অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী। সে যখনই টহল দিতে বেরুত তখনই এ পল্লীতে এসে উপস্থিত হত। একদিন এক নির্জন পথে আইনী ও ইবনে সামির মুখোমুখী হল। ইবনে সামির পথ রোধ করে দাঁড়াল। আইনীর চোখে মুখে ভূবন মোহিনী মৃদু হাসির ঝলক ফুটে উঠল। তারপরই তার নিষ্পাপ নির্মল চেহারায় ভয়ভীতির ছাপ ফুটে উঠল।

আইনী মিষ্টি ভাষায় বলল, আপনি রোমান সৈন্য তাই-না? আপনারা যা খুশি তাই করতে পারেন। আমাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উথাপন করাই যথেষ্ট যে আমরা মিসরী খ্রিস্টান। রাজকীয় খ্রিস্টান ধর্মকে আমরা মানি না। আচ্ছা আপনি কি আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন?

এতক্ষণ পর্যন্ত ইবনে সামিরার অন্তরে একটি রোমান রোমান ভাব বিরাজমান ছিল। আত্ম অহংকারে বিভোর ছিল। কিন্তু আইনীর মার্জিত সুমিষ্ট কথা ও নমনীয় ভাব তার হৃদয়কে প্রভাবিত করল। সে পথ ছেড়ে দিল। কিন্তু আইনী পালিয়ে না গিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

ইবনে সামিরার কণ্ঠে এবার কথা ফুটে উঠল। বলল, আইনী! আমি তোমার নাম জানি। দূর দূর থেকে তোমাকে দেখি। পছন্দ করি। আমার বদ নিয়ত থাকলে তোমাকে তুলে নেয়া আমার জন্য কোন মুশকিল বিষয় নয়। আমি তোমার পিতা-মাতাকে যে কোন সময় ক্যাম্পে ডেকে নিতে পারি। তাহলে তুমিও স্বেচ্ছায় ক্যাম্পে ছুটে আসবে।

ইবনে সামিরের কথায় আইনী মুগ্ধ হল। কথার আবেশে আইনী যেন তার প্রেমের জালে পা দিল। এরপর কয়েকবার আইনী ইবনে সামিরের সাথে সাক্ষাৎ করেছে। ইবনে সামিরা আইনীকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, সে কিছুতেই তার ইজ্জত ও মর্যাদায় আঘাত করবে না। বরং সে তার ইজ্জত ও মর্যাদার এক বিশ্বস্ত প্রহরী।

একদিন আইনী ইবনে সামিরের সাথে সাক্ষাৎ করলে ইবনে সামির বলল, আজ আমি তোমাকে আমার জীবনের এক রহস্যময় কথা বলব। আমার বিশ্বাস,

এখন তুমি আর আমার ক্ষতির চিন্তা করতে পারবে না। আমি তোমাকে এতটুকু বিশ্বাস করি। আসলে আমি রাজকীয় খ্রিস্টান ধর্মের বিশ্বাসী নই। সম্রাট হিরাক্লিয়াস আর পাদ্রী কীরাসের ধর্মমতকে আমি মানি না। আমার অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন মহান পাদ্রী বিন ইয়ামীন। তিনি মেয়েদের নীল নদে বিসর্জনের পক্ষপাতী নন। তিনি এর ঘোর বিরোধী।

ইবনে সামিরা আর আইনী উভয়ে খ্রিস্টান। ইচ্ছে করলেই দু'জনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু ইবনে সামিরা মনে করে আইনীর পিতা মাতার অনুমতি নেয়াটা জরুরী বিষয়। একদিন সে আইনীর পিতামাতার সাথে এ বিষয়ে কথা বলেছে। তখন তারা একে অপরের দিকে রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিরব থেকেছে। কিছুক্ষণ পর আইনীর পিতা বলেছে, আমি ভেবে চিন্তে আইনীকে আমার মতামত বলে দিব। আইনীর থেকে তা জানতে পারবে।

পরদিন ইবনে সামিরা টহল দেয়ার নামে পল্লীতে এলে আইনী পল্লীর বাইরে নির্জনে গিয়ে তার সাথে মিলিত হল। বলল, না, ইবনে সামিরা! আমার পিতামাতার কেউ এতে রাজি নয়। তারা বলছেন, ফৌজের লোকদের বিশ্বাস করা যায় না। তাছাড়া ফৌজের লোকেরা রাজকীয় খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী হয়।

ইবনে সামিরা বলল, আমার ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারে তুমি তাদের কিছু বলছ?

আইনী বলল, হ্যাঁ, আমি তাদের বলেছি, ইবনে সামিরা রাজকীয় খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী নয়। সে মহা পাদ্রী বিন ইয়ামীনের অনুসারী। আমাদের মতই তার ধারণা বিশ্বাস। আমার কথা শুনে পিতা বলেছেন, তাহলে সে মিথ্যা বলেছে। ফৌজের কোন লোকই হিরাক্লিয়াসের মনোনীত পাদ্রী ছাড়া অন্য কোন পাদ্রীর অনুসরণ করতে পারে না। তারপর পিতা আমাকে বলেছে, তুমি ইবনে সামিরার সাথে আর দেখা সাক্ষাৎ করবে না।

ইবনে সামিরা বলল, সে যাই হোক। কিন্তু তোমার ফয়সালা কি?

উত্তরে আইনী বলল, আমার অন্য কোন ফয়সালা হতেই পারে না। আমি আন্তরিকভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে বিশ্বাসী নই। আমি আমার পিতামাতার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার চেষ্টা করব। তারা যদি না মানে তাহলে আমি তোমার নিকট চলে আসব।

* * *

আইনী তার পিতামাতার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। ঠিক তখন এ কাণ্ড ঘটল। ইবনে সামিরা দেখল, আইনীকে হোরসীসের মেয়ে

বানিয়ে অফিসারের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। ইবনে সামিরা তা দেখে নিরব রইল।

তারপর যখন অফিসার আইনীকে নিয়ে নীল নদের তীরে দাঁড় করিয়ে দিল এবং ঘোষণা করল, যারা এ মেয়ের পিতামাতা তারা যেন এগিয়ে আসে অন্যথায় তাকে নীল নদে নিক্ষেপ করা হবে। ইবনে সামিরা দেখল, আইনীর প্রকৃত পিতামাতা এখন আর সামনে আসবে না। আর হোরসীসও সত্য বলবে না। ফলে রোমান অফিসারটি বাধ্য হয়ে তাকে নীল নদে নিক্ষেপ করবে। তখন ইবনে সামিরা সবার অজান্তে পল্লীতে চলে গেছে। দৌড়ে গিয়ে তার ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠেছে। তারপরই ছুটে এসে আইনীকে নিয়ে ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেছে।

রোমান অফিসারটি রাগে ক্রোধে অধীর হয়ে গেল। সে দেখল, হোরসীসও তার স্ত্রীর চেহারায় বেদনা বা আক্ষেপের কোন আলামত নেই। নির্বিকার প্রশান্ত তাদের চেহারা। কিন্তু তাতেকি হবে। কারা যে মেয়েটির পিতামাতা তা তো জানা যাচ্ছে না। কিন্তু যারাই পিতামাতা হোক তাদের তো এখন স্থির থাকার কথা নয়। তারা কিভাবে মেনে নিতে পারে যে, তাদের মেয়েকে এক সৈন্য নিয়ে পালিয়ে গেছে। এতো কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

ইতিমধ্যে অফিসারটির দিকে আইনীর পিতা এগিয়ে এল। বলল, যে সৈন্যটি আমার মেয়ে আইনীকে নিয়ে পালিয়ে গেছে সে কে? কি তার পরিচয়? এতক্ষণ পর অফিসার সঠিক তথ্য উদ্ধার করতে পেরে ক্রোধে আগুন হয়ে গেল। সাথে সাথে নির্দেশ দিল এ পল্লীতে আগুন লাগিয়ে দাও।

অফিসারের নির্দেশ শুনে সবাই হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল। অনেকেই কাঁদতে কাঁদতে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। অফিসার সবাইকে নিরব হতে নির্দেশ দিল। বলল, সবার হয়ে তোমাদের মধ্য থেকে একজন কথা বল।

কিন্তু সবাই বলল, হুজুর! আমরা অশিক্ষিত মূর্খ মানুষ। কুলি মজুর জেলে। ধর্মের বিষয় সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। পাদ্রীরা আমাদের যা বলে আমরা তাই মেনে নেই। কোন পিতামাতাই তার যুবতী কন্যাকে নীল নদে নিক্ষেপ করতে চায় না। কিন্তু হুজুর আমাদের তো কিছুই করার নেই। পাদ্রীর নির্দেশ আমাদের বাধ্য হয়ে মানতে হয়। আমরা নিরূপায়। আমরা জুলুমের শিকার। ঐ পাদ্রীরা এসব ঘটায়।

রোমান অফিসার বলল, আমিও তোমাদের মতই খ্রিস্টান। কিন্তু আমি ঐ নীল নদে মানব সন্তান বিসর্জন দেয়াকে পাপ ও অমার্জনীয় অপরাধ মনে করি। আমরা যেখানে বিশ্বাস করি যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃতদের জীবিত করেছেন সেখানে আমরা কীভাবে ঈসা (আ.)-এর নামের দোহাই দিয়ে জীবিতকে মারতে পারি? ঈসা (আ.) তো জীবনেও কাউকে হত্যা করেন নি। বরং তিনি কুষ্ঠ

রোগীকে সুস্থ করেছেন। দুনিয়ার মানুষের মাঝে ক্ষমা, ভালবাসা, আর প্রেমের কথা বলে গেছেন। হিংসা, বিদ্বেষ, হত্যা ইত্যাকার অপরাধ বর্জনের আহবান জানিয়েছেন। তোরমা কি জান না আমাদের খোদা কে? আমাদের খোদা ঐ মহান সত্ত্বা যার পরিচয় হযরত ঈসা (আ.) আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নীল নদী আমাদের খোদা নয়। এটা কখনো হতে পারে না যে, খোদা একজন নিষ্পাপ নির্দোষ মানুষের হত্যা দেখে আনন্দিত ও বিমুগ্ধ হবেন!

তারপর অফিসারটি হোরসীসকে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমার সাথে মিথ্যা বললে কেন?

হোরসীস বলল, আমার মাত্র একটি সন্তান ছিল। আমি আমার সে মেয়েটিকে আদর সোহাগ দিয়ে লালিল পালিত করেছি। কিন্তু তারা বড় পাদ্রীর নির্দেশে তাকে নীল নদীবক্ষে বিসর্জন দিয়েছে। হুজুর আমি কখনো আপনাকে এ কথা বলতাম না। কিন্তু দেখছি, আমার একার অপরাধে আপনি আমাদের পল্লীটি জ্বালিয়ে দেবেন। তাই বলতে বাধ্য হলাম। যদি আমার এ অপরাধের কারণে পল্লীর লোকেরা আমাকে গাদ্দার হিসাবে চিহ্নিত করে ও শাস্তি দিতে চায়, তাহলে আমি তা মাথা পেতো বরণ করে নিব।

অফিসার গম্ভীর কণ্ঠে বলল, এ ভয় তুমি অন্তর থেকে দূর করে দাও। আমার উপস্থিতিতে কেউ তোমাকে কিছু বলতে পারবে না। আমি তোমাদের প্রশংসা করতে বাধ্য হচ্ছি। তোমাদের মাঝে ঐক্যের দুর্লভ এক গুণ রয়েছে। আমি তেমাদের এ ঐক্যকে অটুট রাখতে চাই। তোমাদের পল্লী কেউ জ্বালাতে পারবে না। তবে যদি এ পল্লীর কোন যুবতীকে আবার নদীবক্ষে উৎসর্গ করা হয় তাহলে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিধান মতে তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে।

জনৈক ব্যক্তি বলল, হুজুর! আমরা তো আমাদের বড় পাদ্রীর নির্দেশ মেনে চলি। অফিসার তখন বড় পাদ্রীর নাম ধাম ও ঠিকানা জেনে নিল। তার সাথে কারা কারা এ কাজের সাথে জড়িত তাদের নাম ঠিকানাও জেনে নিল। হোরসীস জেলে পল্লীর সর্দার বাবাজ্বীর কথাও বলে দিল ও তার ঠিকানাও দিয়ে দিল।

সাথে সাথে রোমান অফিসারটি সকল সৈন্যকে একত্রিত করে বড় পাদ্রীর পল্লীর দিকে ঘোড়া ছুটাল। পল্লীতে বড় পাদ্রীকে ও তার সাঙ্গপাঙ্গকে পেয়ে তাদের গ্রেফতার করল। তারপর সে রাতেই জেলে পল্লীর সর্দার বাবাজ্বীকেও গ্রেফতার করে আনল।

* * *

পরদিন সেই রোমান অফিসার ঘোড়ায় চরে আবার সেই পল্লীতে গিয়ে উপস্থিত। আজ তার সাথে উচ্চ পদস্থ আরেক জন সামরিক অফিসার রয়েছে। তাদের পশ্চাতে রয়েছে বড় পাদ্রী, পাদ্রীর তিন চারজন অনুসারী, জেলে পল্লীর

বাবাজ্বী। এদেরকে শিকলে বেঁধে আনা হয়েছে। তাদের পায়ে লোহার বেড়ী লাগান। পল্লীর সবাইকে বাইরে একত্রিত করা হল। শিকলাবদ্ধ সবাইকে নীল নদের ঐ উঁচু স্থানে নিয়ে দাঁড় করানো হল যেখান থেকে নীল নদে কুমারী মেয়েদের উৎসর্গ করা হয়।

উচ্চ পদস্থ সামরিক অফিসারটি বজ্র নিনাদ কণ্ঠে বলল, তোমরা এই লোকগুলোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখ। এবারই তো ঐ লোক যারা ঐ স্থান থেকে এক কুমারী মেয়েকে নীল নদে নিক্ষেপ করে বিসর্জন দিয়েছিল! তারপর হোরসীসের মেয়েকেও বিসর্জন দিয়েছে।

হোরসীসের কণ্ঠ শোনা গেল, বলল, হ্যাঁ তারাই।

আরো দু'তিন জন বলল, হ্যাঁ তারাই।

অফিসারটি ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, সবাই বল, এবার সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠল। বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ তারাই।

অফিসারটি ইংগিতে কি যেন বলল। অমনি একজন সৈন্য ছুটে গিয়ে তাদের পায়ের ভেড়ী ও হাতের শিকল খুলে তাদের নীল নদের তীরে দাঁড় করিয়ে দিল। অন্য কয়েকজন সৈন্যের হাতে তীর ও ধনুক ছিল। অফিসারের ইশারায় তারা ধনুকে তীর যোজনা করল। তারপর আবার ইশারা করা মাত্র ধনুকগুলো থেকে সাঁ সাঁ করে তীর উড়ে এসে তীরে দাঁড়ানো সকলের শরীরে বিদ্ধ হল। তাদের কয়েকজন আর্ত চিৎকার করে নীল নদে ধপাস করে পড়ে গেল। দু'একজন বেঁকে তীরে লুটিয়ে পড়ল। তাদেরকে সৈন্যরা পা দিয়ে লাথি মেরে পানিতে ফেলে দিল।

ঠিক তখন ইবনে সামির ও আইনী ঘোড়ায় চড়ে বহু দূরের এক বালুকাময় প্রান্তর অতিক্রম করছে। আইনী ইবনে সামিরের পিছনে ঘোড়ায় বসে আছে।

আইনী বলল, আমার শুধুমাত্র পিতামাতার কথা মনে পড়ে। আর তখন হৃদয় অস্থিরতায় ছটফট করতে থাকে। মনে হয় রোমান সৈন্যরা তাদের মেরে ফেলেছে।

ইবনে সামির বলল, আইনী! জীবনকে সফল করতে হলে কিছুতো কোরবানী দিতেই হয়। আমারো তো পিতামাতা আছে। তা সত্ত্বেও আমি আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলাম। ধরা পড়লেই আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হবে। আমি সেনা বাহিনীর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করেছি। দু'জন সৈন্য হত্যা করে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছি। এখন আর পিছনে ফিরে তাকানোর সুযোগ নেই। সামনের দিকে ছুটে চল। আমি তোমাকে মহা পাদ্রী বিন ইয়ামীনের নিকট নিয়ে যাচ্ছি। তিনি হয়তো বাঁচার কোন পথ দেখিয়ে দিবেন।

ইবনে সামির বিন ইয়ামীনের ঠিকানা জানত। কারণ সে বিন ইয়ামীনের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করত।

* * *

সম্রাট হিরাক্লিয়াস মহাপাদ্রী কীরাসকে যে কোন ধরনের নির্যাতন নিপীড়ন করে রাজকীয় খ্রিস্ট ধর্মকে গির্জায় প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিল। পাদ্রী কীরাসের আঙ্গুলী হেলনে কেঁপে উঠত রোমান সৈন্য আর সেনাপতিরা। সকলে অবলীলায় তার নির্দেশ মানত। ধর্মীয় বিষয়ে সৈনিকরা তার হুকুমে নিরপরাধ নিষ্পাপ ব্যক্তিদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাত। নির্যাতনে নিপীড়নে রাজকীয় খ্রিস্টান ধর্ম মানতে বাধ্য হত।

কীরাস যদি শুনতে পেত, অমুক গির্জার পাদ্রী তার নির্দেশ মানে না। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দেয়া ধর্মমতের বিরোধীতা করে। ব্যস্ এতটুকু সংবাদ-ই যথেষ্ট। তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে আসত তার বন্দীশালায়। তারপর হয়তো কাউকে বিবস্ত্র করে তার শরীরে জ্বলন্ত অঙ্গার ঠেসে ধরত। বা ফুটন্ত পানি শরীরে ঢেলে দিয়ে ঝলসে দিত। ফলে সে হিরাক্লিয়াসের প্রণীত ধর্ম মানতে বাধ্য হত।

গণমানুষের সামনে প্রকাশ্যে এমন কঠিন শাস্তি দিয়ে মানুষের মনে ভয়ভীতি আর আতঙ্ক সৃষ্টি করত। অপর দিকে হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে গোপন তৎপরতা চলছে পাদ্রী বিন ইয়ামীনের নেতৃত্বে। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত তার নির্দেশ নামা। সাম্রাজ্যের চরদের চোখ ফাঁকি দিয়ে মিসরের ঘরে ঘরে তা পৌঁছে যেত। সাম্রাজ্যের উঁচু-উঁচু পদে বিন ইয়ামীনের ভক্তরা নিরবে কাজ করত। জনমত সৃষ্টি করত। রোমান সৈন্যদের মাঝেও অনেকে বিন ইয়ামীনের ভক্ত। তাঁর ধর্মদর্শনে বিশ্বাসী। ইবনে সামির তাদেরই একজন। তার বিশ্বাস, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের হাত থেকে বাঁচতে হলে বিন ইয়ামীনের নিকট যেতে হবে। তিনিই তার এ সমস্যার সমাধান দিতে পারবেন।

* * *

আরো এক রাত ও একদিন ইবনে সামির ও আইনীকে পথেই কাটাতে হল। পরদিন তারা পাদ্রী বিন ইয়ামীনের নিকট গিয়ে পৌঁছল।

বিন ইয়ামীন দূরদর্শী। হাজার অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক। ইবনে সামিরকে দেখে হেসে হেসে বলতে লাগল, ইবনে সামির! কি করে এলে? আর এই মেয়েটি কে?

তাঁর কণ্ঠ থেকে মায়াময় মিষ্টতা ছড়িয়ে পড়ল। মনে হল যেন ইবনে সামিরের পথের সকল ক্লান্তি আর অবসাদ দূর হয়েছে গেছে।

ইবনে সামির মাথা নীচু করে বলল, হুজুর! আমিতো আমার আকীদা বিশ্বাসের জন্য উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করতে পারিনি। তবে এ মেয়েটির জীবন রক্ষার জন্য আর আমার হৃদয়ে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল। আপনার দোয়ার বদৌলতে বেঁচে আসতে পেরেছি।

বিন ইয়ামীনকে ঘটনা বিস্তারিত শুনাল।

ঘটনা বর্ণনা শেষ হলে বিন ইয়ামীন শির দুলিয়ে বলল, খারাপ কিছু তো করনি। তুমি তোমার মহব্বতকে জীবিত রাখতে আর তোমার প্রেমাস্পদকে উদ্ধার করতে যে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছো সত্যই তা প্রশংসনীয়। তুমি কিছুদিন আত্মগোপন করে থেকো।

ইবনে সামির বলল, আত্মগোপন করে তো থাকতেই হবে। কিন্তু নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে চাই না। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মনগড়া ঐ ধর্মমতকে উৎখাত করতে কিছু একটা করতেই হবে। আমি কি করব, আমাকে তার নির্দেশ দিন। আমি যে কোন কুরবানী দিতে প্রস্তুত।

বিন ইয়ামীন তখন কিছু পাদ্রীয়ানা তাত্ত্বিক কথাবার্তা শুরু করল।

ইবনে সামির বলল, সম্মানিত মহামান্য মহাপাদ্রী! আমি মূর্খ। ধর্মীয় জ্ঞান বলতে কিছুই নেই আমার। তাই আপনার জটিল ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বুঝার সামর্থ আমার নেই। আমি একজন সৈনিক। যুদ্ধ, হত্যা আর রক্তপাত আমার কাজ। সহীহ্ আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মমত প্রচার ও প্রসারের জন্য কাকে হত্যা করতে হবে, কাকে শাস্তি দিতে হবে, এ ধরনের নির্দেশ আমাকে দিন। আমি তা দক্ষতার সাথে পালন করতে পারব।

বিন ইয়ামীনের রহস্যময় কথা। বলল, সবকিছুর আগে এখন তোমাকে নিজের বাঁচার কথাই চিন্তা করতে হবে। তুমি সেনাবাহিনীর বিধান লঙ্ঘন করে যে অপরাধ করেছো তার যে কি শাস্তি তা তোমার জানা আছে। এখন আত্মগোপন করে থাক। কিছুদিন কেটে গেলে তোমাকে ছদ্মবেশে কাজে লাগান হবে।

ইবনে সামির বলল, আমি একটি কথা বলতে চাই। সম্রাট হিরাক্লিয়াস ধর্মকে অপমান করে যে শিক্ষা ইতিমধ্যে পেয়েছে তা থেকে কিন্তু সে একটুকুও গ্রহণ করেনি। গোটা শাম তার করতল মুক্ত হয়ে গেল। মুসলমানরা একটার পর একটা দুর্ভেদ্য শহর পদানত করে নিল। তার বাহিনীর অর্ধেকের চেয়ে বেশী সৈন্য রণাঙ্গনে কচুকাটা হয়ে শেষ হয়ে গেল। এখন যে সৈন্যগুলো তার অধীনে আছে তাদের মাঝে মুসলমানদের এমন ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে যে, যদি কেউ কৌতূহল বশতঃ একথা ছড়িয়ে দেয় যে, মুসলমানরা মিসর আক্রমণে এগিয়ে আসছে, ব্যস্

এ সংবাদ শুনেই মিসরের বাহিনীর কণ্ঠ শুকিয়ে যাবে। পালাই পালাই করে নিমিষে সেনা ক্যাম্প শূন্য হয়ে যাবে।

বিন ইয়ামীন বলল, ইতিহাস জ্বলন্ত সাক্ষ্য। কাল প্রবাহে যে কেউ ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চেয়েছে সে-ই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ইসলামের মত খ্রিস্টবাদ এমন এক ধর্ম যে ধর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াস সেই আসমানী কিতাবকে বিকৃত করেছেন। অহঙ্কারে মদমত্ত হয়ে ধর্মকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছেন। সে এখন দিশেহারা। আমি দিব্য চোখে দেখছি, মিসর তার হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে। ধর্মানুসারীদের এভাবে দলে-উপদলে বিভক্ত করলে অন্ধকার ভবিষ্যৎ ধেয়ে আসবে।

ইবনে সামির বিজ্ঞেস করল। মুসলমানরা কি মিসর আক্রমণ করতে যাচ্ছে।

বিন ইয়ামীন বলল, ইতিমধ্যে হয়তো তারা মিসরের উপকণ্ঠে পৌঁছে যেত। কিন্তু মুসলমানদের উপর এমন এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আযাব এসেছে যার কারণে গোটা আরবের লোকেরা অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে। আমি সর্বদা সেখানের সংবাদ পাচ্ছি। দুর্ভিক্ষ শেষ না হলে মুসলমানরা মিসর আক্রমণ করবে না।

ইবনে সামির বলল, মহামান্য পাদ্রী! আমার মনে হঠাৎ একটি চিন্তা উঁকি দিয়েছে। মুসলমানরা যদি মিসর আক্রমণ করে তাহলে তো আমাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু আমি চিন্তা করেছি, যেভাবে মুসলমানরা সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে তাদের দুশমন মনে করে ঠিক সেভাবে তারাও তো আমাদের দুশমন। তাহলে কি আমরা সে সময় সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অফাদারী করব?

বিন ইয়ামীনের কণ্ঠ অত্যন্ত গম্ভীর শোনা গেল। বলল, হ্যাঁ, এ বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। শামের তিনজন মুসলমান গুপ্তচর আমার নিকট এসেছিল। তারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বলে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আমি বুঝে ফেলেছিলাম যে, তারা গুপ্তচর। তারা আমার থেকে জানতে এসেছিল, যদি মুসলমানরা মিসর আক্রমণ করে তাহলে খ্রিস্টানরা যুদ্ধের আগেই সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায়? তাদের খলীফা বা সিপাহ সালারের উদ্দেশ্য, প্রথমে হিরাক্লিয়াসকে মিসর থেকে তাড়িয়ে দেয়া হোক, তারপর মুসলমান ও খ্রিস্টানরা পরস্পরে নিজেদের বিরোধ মীমাংসা করে নিবে।

তোমার প্রশ্নের উত্তর হল, যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে তখন মিসরের খ্রিস্টানরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবে। তবে এটা এখন আমার শেষ ফয়সালা নয়।

একথা সত্য যে, মিসরীয়দের কিছুতেই সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পাশে দাঁড়ানো উচিত নয়।

কেউ একজন যুবতী মেয়কে নিয়ে পালিয়ে এসেছে এটা খ্রিস্টান সমাজে কোন অপরাধের বিষয় নয়। তা নিয়ে ইবনে সামিরের কোন মাথা ব্যথাও নেই। কিন্তু দু'জন সৈন্যকে হত্যা করে পালিয়ে আসা এক গুরুতর অপরাধ। এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তাই ইবনে সামিরকে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকতেই হবে।

* * *

আরবের সেই দুর্ভিক্ষের কারণে সব পরিকল্পনা যেন ভণ্ডুল হয়ে গেল। আমর ইবনে আস (রা.)-এর মনে একবারও আর মিসর আক্রমণের কথা উদয় হয় না। দুর্ভিক্ষগ্রস্থ আরবদের খাবার সংগ্রহ করা ও কাফেলা বোঝাই করে তা পাঠানোই এখন তার প্রধান দায়িত্ব। ইরাক ও শামের গভর্নররা এখন একাজেই ব্যস্ত। এভাবে নয় মাস কেটে যাওয়ার পর তাঁরা সংবাদ পেল, আল্লাহ্ তা'আলা রহমেরত বারি বর্ষণ করেছেন। আরবদের মাঝে আবার স্বস্তি ফিরে এসেছে। রুক্ষ ও জ্বলে পুড়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া বাগানগুলোতে আবার সজীবতা ফিরে এসেছে। খেজুর গাছের কাণ্ডে কাণ্ডে আবার কাদি দেখা দিয়েছে। গাছের ডালে ডালে আবার পাখিরা গান ধরেছে।

এ সংবাদ শুনে ইরাক ও মিসরের গভর্নররা শান্ত হল। আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করল। আবার আত্মচিন্তা তাদের মাঝে ফিরে এল। রাবেয়াকে সে বারই আমর ইবনে আস (রা.) ওয়াইসের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। ওয়াইসের সাথে তার দু'জন সাথী যারা মিসর গিয়ে বিন ইয়ামীনের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল সে গুপ্তচর দু'জনও শামেই থাকত। দুর্ভিক্ষ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সিপাহ সালার আবু উবায়দা (রা.) আমর ইবনে আস (রা.)-এর নিকট বার্তা পাঠালেন যেন মিসরে প্রেরিত গুপ্তচর তিন মুজাহিদকে তারেদ স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ করা হয়। ওয়াইস আলেপ্পার অধিবাসী। আলেপ্পার মুজাহিদ বাহিনীর সে একজন সদস্য ছিল। তাই সে আলেপ্পায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ পেল। মিসর থেকে ফিরে আসার পরই রাবেয়া বার বার ওয়াইসের নিকট বিনীত আবেদন করত যেন তাকে তার পিতামাতার সাথে দেখা করা সুযোগ দেয়া হয়।

ওয়াইস তাকে বলত, সে যেন তার পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য এতো অস্থির ও উতলা না হয়। কারণ তারা তাকে দেখে আনন্দিত হবে না। তারা তার ইসলাম গ্রহণকে সহজে মেনে নিতে পারবে না। যেমন আমার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনরা তা সহজে মেনে নিতে পারেনি।

এ সবকিছু শোনার পরও রাবেয়ার নারী মন পিতামাতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। সে প্রায়ই ওয়াইসকে বলে, আমি অবশ্যই আমার পিতামাতার সাথে সাক্ষাৎ করব। এর এক কারণ হল তারা আমার পিতামাতা। দ্বিতীয়ত আমার ইচ্ছে হয়, আমি তাদের নিকট ইসলাম ধর্মের দাওয়াত পৌঁছাই। রাবেয়ার এ কথা শুনে ওয়াইস হাসত। সে হাসি ছিল রহস্যময়।

সিপাহ সালারের নির্দেশে ওয়াইস আলেপ্পায় ফিরে এলে রাবেয়াও তার সাথে আলেপ্পায় চলে এল। এবার যেন তার আনন্দ কেউ ধরে রাখতে পারবে না। রাবেয়ার প্রত্যয়, সে এবার অবশ্যই তার পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের সাথে সাক্ষাত করবে এবং ইসলামের সৌন্দর্য, কমনীয়তা তাদের সামনে তুলে ধরে তাদের ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করবে।

* * *

আলেপ্পায় পৌঁছে ওয়াইস রাবেয়াকে তার বাসায় নিয়ে গেল। আগে ওয়াইসের কোন বাসা ছিল না। ছাউনীতে মুজাহিদদের সাথে থাকত। কিন্তু রাবেয়াকে বিয়ে করে সাথে নিয়ে এলে তার জন্য একটি ছোট্ট বাসা বরাদ্দ করা হয়। সে বাসায় ওয়াইস রাবেয়াকে নিয়ে উঠে। আলেপ্পায় পৌঁছার পর রাবেয়া তার পিতামাতার সাথে দেখা করতে অস্থির ব্যাকুল হয়ে গেল। তাই একদিন ওয়াইস রাবেয়াকে নিয়ে রওয়ানা দিল। কিন্তু যাওয়ার প্রাক্কালে রাবেয়াকে বুঝিয়ে বলল যে, আমি তোমর সাথে যাব কিন্তু প্রথমেই তোমাদের বাড়িতে প্রবেশ করব না। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব। যদি তোমার পিতামাতা আমাকে সানন্দে গ্রহণ করতে পারেন তাহলেই আমি অন্দরমহলে প্রবেশ করব। তাই তুমি প্রথমে পরিস্থিতি অনুধাবন করে আমাকে সংবাদ দিবে।

বাড়িতে পৌঁছে ওয়াইস বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। রাবেয়ার বয়স কম। অভিজ্ঞতাও অল্প। কিশোর কিশোরীদের মত আনন্দের আতিশয্যে লাফাতে লাফাতে সে বাড়িতে প্রবেশ করল। বাড়ির লোকেরা তাকে দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে গেল। কারণ তারা জানে, রোজী পাগল হয়ে চলে গেছে। এক বৎসরের চেয়ে বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই সে মৃত্যুবরণ করেছে। রোজী কখনো ফিরে আসতে পারে না। এ হয়তো তার প্রেতাত্মা!

রাবেয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করে পিতামাতা ও অন্যান্যদের দেখে বলল, আপনারা কেমন আছেন? আমি এখনো জীবিত আছি। বরং আগের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থায় আছি।

মা মেয়েকে দেখে অস্থির কণ্ঠে দু'হাত প্রসারিত করে বলল, হায় আমার রোজী! তুই এখনো দুনিয়াতে আছিস!

রাবেয়া বলল, মা, আমি আর তোমাদের সেই রোজী নই। আমি রাবেয়া হয়ে গেছি। আমি মুসলমান। আমার স্বামী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে ভিতরে ডেকে আনছি।

মেয়ের কথা শুনে মায়ের প্রসারিত হাত নীচে নেমে এল। সে তার ইসলাম গ্রহণ করাকে মেনে নিতে পারল না। কিন্তু রাবেয়ার মনে তখন আনন্দের ফল্গুধারা। বাড়ির লোকেরা তার ইসলাম গ্রহণের কথা যে মেনে নিতে পারছে না, তা সে বুঝতে পারল না। সে তখনই ছুটে বাইরে চলে গেল এবং ওয়াইসকে হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ির ভিতর নিয়ে এল। ওয়াইস মনে করল, রাবেয়া তার পিতামাতার অনুমতেক্রমেই তাকে ভিতরে আনছে, সে প্রতিবাদ না করে ভিতরে চলে এল।

ভিতরে প্রবেশ করেই ওয়াইস দেখতে পেল রাবেয়ার পিতা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াইস মুসাফাহা করার জন্য দু'হাত প্রসারি করে দিল। কিন্তু রাবেয়ার পিতা হাত প্রসারিত করল না। রাবেয়ার মা তাচ্ছিল্যের সাথে ওয়াইসের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। রাবেয়ার এক বড় ভাই ও তার স্ত্রী বাড়িতে ছিল। তারাও ওয়াইসের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

ওয়াইস দারুণ মর্মাহত ও বেদনার্ত হয়ে বলল, রাবেয়া! দেখলে তো? আমি যা বলেছিলাম তাই তো হচ্ছে। তাদের শুনাও, আমি তোমাকে কোথায় পেয়েছি আর কিভাবে আমি তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছি। জামাতার সাথে কি আচরণ করতে হয় এ সৌজন্যবোধটুকুও তাদের নেই।

রাবেয়ার পিতার নিরস কণ্ঠ শোনা গেল। বলল, আমি তোমাকে জামাতা বানাইনি। তুমি ভ্রষ্ট। আমার মেয়েকেও তুমি ভষ্টতার শিকার করেছো। তাই আমরা তোমার সাথে ভাল আচরণ করতে পারছি না। তুমি পথহারা বিভ্রান্ত।

লজ্জা ও ক্রোধে রাবেয়ার চেহারা লাল হয়ে গেল। পিতামাতা, ভাই ও ভাবীর আচরণে সে একেবারে অধীর হয়ে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই সে তার মনকে শক্ত করে তুলল। তার চেহারায় কেমন যেন কাঠিন্য কাঠিন্য ভাব ছড়িয়ে পড়ল। পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে সে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু তবুও সে একেবারে প্রশান্ত হতে পারেনি। ক্রোধ মিশ্রিত কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল, আপনারা আগে আমার কথা শুনুন। আমার জীবনের উপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গিয়েছিল তা অনুধাবন করুন। আল্লাহ্ তাঁর তিন ফেরেস্তা দ্বারা কিভাবে আমাকে উদ্ধার করালেন তাও শুনুন।

সবাই বসে পড়ল। রাবেয়া ওয়াইসকে তার পাশে বসাল। তারপর তার উপর দিয়ে যে লোমহর্ষক ভয়াবহ ঝড় বয়ে গেছে তা একের পর এক বর্ণনা করল। রাবেয়া বলতে বলতে যতই অগ্রসর হতে লাগল তার পিতামাতা ও পরিজনের অবস্থা ততই স্বাভাবিক হতে লাগল। সবশেষে এসে রাবেয়া বলল, আমি এমন অসহায় ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম যে আমার মৃত্যু ছাড়া বাঁচার উপায় ছিল না। ঠিক তখন ওয়াইস ও তার সঙ্গীদ্বয় ফেরেস্তার মত সেখানে উপস্থিত হয়ে আমাকে উদ্ধার করল। তারা ইচ্ছে করলে আমার সাথে যা তা করতে পারত। কিন্তু তারা আমার সাথে ফেরেস্তার মত আচরণ করেছে।

তাই আমি তাদের চরিত্রগুণে বিমুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আম্মাজান! আপনার নিশ্চয় স্মরণ আছে, আমি এক সময় ওয়াইসকে হৃদয় থেকে কামনা করতাম, যখন সে রবিন ছিল। কিন্তু যখনই শুনতে পেলাম, রবিন ওয়াইস হয়ে গেছে। খ্রিস্ট ধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, ঠিক তখনই আমি তাকে ত্যাগ করেছিলাম। আমি বলতে চাচ্ছি, মুসলমানদের যে চরিত্র তা আর কোন জাতির মাঝে নেই। হতেও পারে না। মিসরে গিয়ে দেখুন। খ্রিস্টান বাদশাহ হিরাক্লিয়াস খ্রিস্টানদের রক্তে মিসরের মাটি রঞ্জিত করছে। সেখানের প্রধান সমস্যাই হলো প্রকৃত ও নির্ভেজাল খ্রিস্টধর্ম কোনটি তা নির্ণয় করা—সম্রাট হিরাক্লিয়াসের খ্রিস্টধর্ম না জনসাধারণ যে ধর্ম পালন করছে তা?

রাবেয়া তার মনের কথা একের পর এক বলে যাচ্ছে আর ওয়াইস নিরবে বসে আছে। ঘরের লোকেরা সবাই চুপচাপ শুনছে। সবশেষে রাবেয়া বলল, আমি তো অন্য এক ইচ্ছে নিয়ে আপনাদের নিকট এসেছি। আমি চাচ্ছি, আপনারা সবাই মুসলমান হয়ে যান।

রাবয়োর পিতার কণ্ঠে আগুনের হলকা। বলল, চুপ কর। কোন মুসলমানদের কথা তুমি বলছো? সে মুসলমান তো এখন আর নেই যাদের স্বভাব চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে অমুসলমানরা মুসলমান হত। ইসলাম মদ পানকে এমনভাবে হারাম করেছে যেমনিভাবে শূকরের গোশতকে হারাম করেছে। কিন্তু এখানে কিছু মুসলমান আছে যার মদ পান করা শুরু করে দিয়েছে। তারা মদ পানকে হালাল মনে করে।

প্রতিবাদী কণ্ঠে ওয়াইস বলল, আপনার একথা আমি মানি না। আপনি বরং এটা বলুন যে, আমার ও আপনার মেয়ের ইসলাম গ্রহণ করাকে আপনি ভাল মনে করছেন না। মুসলমানদের নিয়ে মিথ্যা কথা বলবেন না। মিথ্যা অপবাদ দিবেন না।

রাবেয়ার পিতার দৃঢ় কণ্ঠ। এটা অপবাদ নয়। আমি তোমাকে এমন বহু মুসলমান দেখিয়ে দিতে পারব। আমি তাদের তোমাকে অবশ্যই দেখাব।

ওয়াইস বলল, হতে পারে এটা তাদের ব্যক্তিগত পাপাচার। তাই বলে, ইসলাম ধর্ম বা খলীফা বা অন্যান্য মুসলমানরা মুসলমানকে তা পান করার অনুমতি প্রদান করে না। আর ইসলাম এসব বৈধ মনে করে না।

রাবেয়ার পিতা দৃঢ়তার সাথে বলল, কিছুদিন পর তুমি নিজেই তা শুনবে, দেখবে। এ ধরনের মদখোরদের কোন বিচার এখন আর হচ্ছে না। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য মুসলমানরাও মদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। তারাও মদ পান শুরু করেছে। মদ সকল পাপের উৎস। মদ পান করলে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। হাজার রকমের পাপ তখন তার থেকে প্রকাশ পেতে থাকে। যদি এ জাতি মদ পানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাদের ঐ সব স্বভাব চরিত্র নিঃশেষ হয়ে যাবে যার আকর্ষণে অমুসলমান বিমুগ্ধ চিত্তে মুসলমান হচ্ছে।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করার কারণে ওয়াইসের মত রাবেয়াও অতিষ্ঠ ও বিরক্ত হয়ে উঠল। শৈশব কাল থেকে রাবেয়া তার পিতাকে দেখে এসেছে ধর্মের ব্যাপার তার পিতা নিরাপোষ। খ্রিস্ট ধর্ম তার শিরায় শিরায় সর্বদা তোলপাড় সৃষ্টি করত। তাই সে চাইল, তার পিতার মিথ্যাচার এখানেই শেষ করে দেয়া দরকার। সে তার পিতাকে বলল, আব্বাজান! আমি আবারো ওয়াইসকে নিয়ে আপনার নিকট হাজির হব। আপনি কি আমাকে তার অনুমতি প্রদান করছেন?

পিতার কণ্ঠস্বর এবার অত্যন্ত উত্তাল মনে হল। বলল, শোন, আমার ঘরের দরজা তোমাদের জন্য চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। তোমরা যদি আবার খ্রিস্ট ধর্মে ফিরে আস তাহলে তোমাদের জন্য আমার হৃদয় ও গৃহের দরজা সর্বদা অবারিত পাবে।

ওয়াইস আর বসে থাকতে পারল না। দাঁড়িয়ে বলল, আমরা আর কখনো ভুলেও আপনার দরজায় আসব না। তারপর রাবেয়াকে তুলে নিয়ে বলল, চল রাবেয়া! আমি আমার লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে পারি কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র অপবাদ ও মিথ্যচার সহ্য করতে পারি না। আমি এখানের আরো কিছু খ্রিস্টানকে মুসলমান বানিয়ে নিব।

এতক্ষণ রাবেয়ার বড় ভাই নিরব ছিল। কোন কথা বলেনি। এবার সে একটু ক্ষীপ্ত কণ্ঠেই বলল, তুমি হয়তো কিছুতেই তা করতে পারবে না। রোজী! তাকে ইসলামের প্রচার থেকে থামিয়ে রাখবি। নইলে

ভাই! আমি রোজী নই। আমি রাবেয়া। তিনি তার ধর্মের জন্য যা ভাল মনে করেন করবেন। আমি তাতে বাধা দিতে পারি না।

ওয়াইস ও রাবেয়া সেখান থেকে আহত হৃদয়ে চলে এসেছে। ফিরে আসার সময় রাবেয়ার ভাই অগ্নিদৃষ্টিতে অপলক নেত্রে তাদের দিকে চেয়ে রইল। সে চোখে ছিল অপমান ও যন্ত্রণার আগুন।

* * *

ওয়াইস শুধুমাত্র বীর যোদ্ধাই নয়। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, চৌকস, দূরদর্শী। তাছাড়া চর বৃত্তিতে তার প্রচুর সুনাম। কিন্তু সেদিনের ঘটনায় সে রাবেয়ার ভাইয়ের মতিগতি বুঝতে পারেনি। সেদিন বিতর্কের শেষের দিকে অত্যন্ত রুক্ষ ভাষায় তার ভাই হুমকির স্বরে বলেছিল, তাকে ইসলাম প্রচার থেকে থামিয়ে রাখবি। নইলে.....একথার মর্ম কি? ইঙ্গিত কি? সে বিষয়টি ওয়াইস লক্ষ্য করেনি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলার পথে ওয়াইস রাবেয়াকে বলল, আর কখনো আমি তোমাকে এখানে নিয়ে আসব না।

রাবেয়ার কণ্ঠে একরাশ বেদনা। বলল, আমি ভাবতেও পারিনি আমার পিতামাতা আমার সঙ্গে এমন আচরণ করবে। তবে একটি কথা স্মরণ রাখবে, আমার পিতা যাই করুন তিনি ধর্মভীরু। কিন্তু আমার ভাই ভাল মানুষ নয়।

ওয়াইসের কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর। বলল, সে আমার কি করতে পারবে! আমাকে কোথায় পাবে!

রাবেয়া যদিও ওয়াইসকে বলেছে যে, তার ভাই ভাল মানুষ নয়। তবে কেমন ভয়ঙ্কর ও দুরন্ধর তা সে ধারণা করতে পারেনি। রাবেয়ার এ ভাই মুসলমানদের ঘোর দুশমন। রোমানদের সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে কয়েকবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু এতে তার বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, মুখোমুখি যুদ্ধে কখনো মুসলমানদের সাথে পেরে উঠা সম্ভব নয়। তাই সম্মুখ যুদ্ধ ত্যাগ করে সে এবার কূট কৌশলের পথ ধরেছে। গোপনে ধ্বংসাত্মক কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে। ইতিমধ্যে সে কয়েকজন সাঙ্গ-পাঙ্গও জোগার করে নিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম শুরু হয়নি। হবে হচ্ছে করতে করতে সময় চলে যাচ্ছিল। রাবেয়া ও ওয়াইসকে দেখে তার সে আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

অবশ্য ধর্মের আকর্ষণেই যে তার এ অবস্থা এমন নয়। এর পশ্চাতে একটি ব্যর্থতাও কাজ করছিল। তা অনেক আগের কথা। বিয়ের অনেক আগে এক অনিন্দ্য সুন্দরীর সাথে তার ভাব জমেছিল। প্রেমের সেই অঙ্কুরটি এক সময় মহিরুহের রূপ ধারণ করেছিল। পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য তারা ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু এর মাঝে এক তুফান এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। রাবেয়া ও শারীনার মত সেও এক মুজাহিদের কথাবার্তা আর আচার-আচরণে

বিমুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে পড়েছিল। এমন কি মুসলমানও হয়ে গিয়েছিল। এবং রাবেয়ার ভাইকে ত্যাগ করে সে মুজাহিদের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হয়েছিল।

এখন রাবেয়াকে এক নও মুসলিমের পাশে দেখে তার পূর্বের প্রেমের স্মৃতি কথা মনে পড়ে গেল। সাথে সাথে এক ভয়ঙ্কর জিঘাংসা ভাব তার হৃদয়ে লক্‌লকিয়ে উঠল। ওয়াইস ও রাবেয়া চলে যাওয়ার পর পরই সে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গেছে। সে তার দুই অনুসারীকে ডেকে ওয়াইস ও রাবেয়ার কথা শুনাল। সব শেষে বলল, ওয়াইস চায় এ গাঁয়ে ইসলাম প্রচার করবে।

এক অনুচর বলল, এতো বড় স্পর্ধা! এতো দুঃসাহস! হুকুম দাও দোস্ত কি করতে হবে? আমাদের গায়ে ইসলাম প্রচারের মজা তাকে দেখিয়ে দিব!

রাবেয়ার ভাই গলার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, কতল। আমরা আজ পর্যন্ত ইসলামের অগ্রযাত্রায় সামান্য বাঁধা সৃষ্টি করতে পারিনি। আমরা শুধুই পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা করে আসছি। এবার বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হতে হবে।

হত্যার ব্যাপারে তারা একমত। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু কিভাবে কোথায় তা করতে হবে, এ ব্যাপারে বেশ কিছুক্ষণ শলাপরামর্শ হল। অবশেষে তারা হত্যার এক পদ্ধতি বের করল। কে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ধোঁকায় ফেলে অকুস্থলে নিয়ে আসবে তাও নির্ধারিত হয়ে গেল।

এরপর চার পাঁচ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁরা ওয়াইসকে ষড়যন্ত্রের ফাঁদে ফেলতে পারেনি। কারণ ওয়াইস নিজের কর্তব্য কাজে দারুণ ব্যস্ত। কারো সাথে কথা বলারও তার ফুরসত নেই।

* * *

একদিন বিকালে পড়ন্ত বেলায় ক্লান্ত শ্রান্ত ওয়াইস বাড়িতে ফিরছে। হঠাৎ পথিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে সালাম দিয়ে সামনে দাঁড়াল। বলল, ভাই! আপনাকে আমি অনেক দিন ধরে চিনি। কিন্তু আপনার সাথে আমার পরিচয় হয়নি। একটি জরুরী কাজে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। শহরের বাইরে ঐ পথ দিয়ে একটু দূরে গেলেই আমাদের গ্রাম। সেখানে আমার প্রচেষ্টায় কয়েকজন খ্রিস্টান মুসলমান হতে ইচ্ছে করেছে। আপনাকে অবশ্যই আমার সাথে যেতে হবে। সন্ধ্যায় তারা পথের বাঁকে থাকবে। সন্ধ্যার পর আমরা সেখানে যাব। তাদের মুসলমান বানিয়ে কিছু মৌলিক শিক্ষা দিয়ে তবে আপনাকে ফিরতে হবে।

ইসলামের জন্য যে প্রাণ উৎসর্গিত সে প্রাণ কি এমন এক কাজ থেকে দূরে থাকতে পারে? এ ব্যাপারে গড়িমসি করতে পারে? তাই সাথে সাথে ওয়াইস প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। অগ্র পশ্চাৎ কিছুই সে ভাবল না।

আবীর ছড়াতে ছড়াতে সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে পশ্চিমাকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। মাগরিবের নামাযের পরই লোকটি এসে হাজির। ব্যস্ত তার কণ্ঠ। বলল, চলুন, চলুন। দেরি হয়ে গেছে। রাতে রাতে আবার আপনাকে ফিরতে হবে যে। ঝট্‌পট তৈরী হয়ে বের হয়ে এল ওয়াইস। কথা বলতে বলতে তারা চলতে লাগল।

* * *

কিছুক্ষণ চলার পর তারা শহরের বাইরে চলে এল। চারদিকে আবছা আবছা অন্ধকার। মেঠো পথ ধরে তারা কিছুদূর যাওয়ার পর পথের বাঁকে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু কেউ সেখানে নেই। চারদিক নিরব নিস্তব্ধ। লোকটি বলল, হয়তো তারা এখনো এখানে এসে পৌঁছে নি। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। এর মধ্যেই তারা চলে আসবে। কিছুক্ষণ তারা বসে রইল। না কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। লোকটি দারুণ অস্থির হয়ে পড়ল। বারবার এদিক সেদিক তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে কি যেন বলছে। কিন্তু জনমানবের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। ওয়াইস বলল, ভাই! আর তো অপেক্ষা করা যাচ্ছে না। যদি তারা সত্যই ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তাহলে কাল তাদের সাথে করে নিয়ে এসো। আমি তাদের আমার চেয়ে বড় কারো নিকট নিয়ে যাব।

ষড়যন্ত্রকারী এই ব্যক্তি একাকীকিছু করতে সাহস পেল না। তা ছাড়া তার সাথে তো কোন অস্ত্রও নেই। সে চালাকী করে কথার ছলে আরো কিছুক্ষণ ওয়াইসকে ধরে রাখল। কিন্তু না, কারো কোন সাড়াশব্দ নেই। তাই নিরাশ হয়ে ওয়াইস ফিলে এল।

বাড়িতে প্রবেশ করেই ওয়াইস দেখল রাবেয়া বিমর্ষ বদনে বসে আছে। চোখে তার বিন্দু বিন্দু অশ্রু। ওয়াইসকে দেখেই ছুটে এসে বলল, ওগো! চলনা একটু বাড়িতে যাই। আমার ভাইটি মৃত্যুশয্যায় ছটফট করছে। এইতো কিছুক্ষণ আগে আমাদের এক প্রতিবেশী এইদিক দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। আমাকে ভাইয়ের সংবাদ দিয়ে গেল। বলল, তোমার ভাই দু'দিন যাবৎ জরাক্রান্ত। কেউ বলতে পারছে না কি হয়েছে। মাথা আগুন। কলসির পর কলসি পানি ঢালছে কিন্তু কোনই উপকার হচ্ছে না। আজ সকাল থেকে প্রলাপ বলছে। দুপুর থেকে অজ্ঞান। হতে পারে আজ রাতই তার জীবনের শেষ রাত।

ওয়াইস নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, তুমি যেতে চাইলে আমি বাধা দিব না। আর যদি আমাকে সাথে নিয়ে যেতে চাও তাহলে আমিও যাব।

ওরা রাবেয়াকে যদিও অপমান করে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল, কিন্তু তার হৃদয় কেন যেন ভাইয়ের নাম শোনা মাত্র বিচলিত হয়ে উঠল। সাথে সাথে সে ওয়াইসকে নিয়ে তার বাড়ির পথে রওয়ানা হয়ে গেল। গিয়ে দেখে, উঠানে

লোকের ভিড়। ভিড় ঠেলে সে সামনে অগ্রসর হল। কেউ তাকে কিছু বলল না। ঘরে প্রবেশ করে দেখে, ভাইয়ের শয্যা পাশে তার পিতামাতা ও ভাবী কাঁদছে। ভাই রাবেয়াকে দেখার পূর্বে ওয়াইসকে দেখল। সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে ফেলল। তারপর চোখ খুলে কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থেকে হঠাৎ একটি হেঁচকি দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। মাথা এক পার্শ্বে হেলে পড়ল। মৃত্যুবরণ করল।

ওয়াইস জানত না, এ লোকিটই তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। আর সে তার ষড়যন্ত্রে আটকেও গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা বোঝা মুশকিল।

রাবেয়ার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এল। বেশ কিছুক্ষণ কাঁদল। কিন্তু তার পিতামাতা তার প্রতি বা ওয়াইসের প্রতি ফিরেও তাকাল না। রাবেয়া আবার বেদনাহত হৃদয় নিয়ে ফিরে আসল।

পরদিন শুনতে পেল, রাবেয়ার ভাইয়ের এক বন্ধুও অজানা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। দু'দিন পর সেও মারা গেল। তারপর ঐ ব্যক্তিও একই রোগে আক্রান্ত হল যে ওয়াইসকে হত্যার জন্য নির্ধারিত স্থানে নিয়ে গিয়েছিল। দু'দিন পর সেও মারা গেল। ওয়াইসকে যারা হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল একে একে তিনজনই মৃত্যুবরণ করল। অথচ ওয়াইস এ ব্যাপারে কিছুই জানল না।

* * *

কিন্তু এই ব্যাধি শুধুমাত্র এ তিনজনের মাঝে সীমিত রইলো না। বরং তা আলেপ্পার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ঘর ঘর থেকে জানাযা বের হতে লাগল। চিকিৎসকরা অপারগ হয়ে গেল। মহামারির ভয়ে মানুষ স্তব্ধ হয়ে গেল। যে ব্যক্তি এ রোগে আক্রান্ত হয় দুই বা তিন দিনের মধ্যেই সে মৃত্যুবরণ করে। চিকিৎসকদের অবিরাম চেষ্টা সত্ত্বেও এ রোগ দূর হল না, উত্তরোত্তর তা গোটা শামে ছড়িয়ে পড়ল। ফিলিস্তিনের আমওয়াস নামক গ্রামে সর্বপ্রথম এ মহামারী শুরু হয়। তাই আমওয়াস ব্যাধি নামেই তা পরিচিত।

দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে না পেতেই আবার ইসলামী জগতে দেখা দিল মহামারী। তখন ছিল ১৮ হিজরী মুতাবেক ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ। এ মহামারীর কারণে খিলাফতের ভিত কেঁপে উঠল। মুজাহিদদের ছাউনীতে ছাউনীতে এ মহমারী ছড়িয়ে পড়ল। অসংখ্য মুজাহিদ দেখতে দেখতে ইনতেকাল করল।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস এ সংবাদ পেল। এবার আর তার আনন্দ ধরে রাখে কে? সাথে সাথে সভাসদদের ডেকে পাঠাল। বলল, মুসলমানদের পরাজয়ের এই হল মোক্ষম সুযোগ। মোসাহেবের দল তার অভিমত সমর্থন করল। সম্রাট

হিরাক্লিয়াসের নিযুক্ত প্রধান পাদ্রী কীরাস সম্রাটের প্রতিজ্ঞার কথা শুনল। সম্রাটের নিকট এসে বলল, শাহানশাহে রোম! শুনতে পেলাম, আপনি শাম আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। আপনার পরিষদও নাকি তা সমর্থন করেছে।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস স্থির কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, মহাপাদ্রী। শুধু শামই নয়, গোটা আরব আমি পদানত করতে চাচ্ছি। কিছুদিন আগে তারা দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত হয়ে একেবারে দুর্বল নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। এখন আবার তাদের উপর আরেক আযাব আপতিত হয়েছে। মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার মানুষ মরছে। অনেক যোদ্ধা ও সালারও মারা গেছে। তাই ভাবছি, এটাই আক্রমণের মোক্ষম সুযোগ।

কীরাস কিছুক্ষ নিরব থেকে বলল, যদি আপনার ক্ষতির কোন আশঙ্কা না থাকতো তাহলে আমিও আপনার কথা সমর্থন করতাম। কিন্তু আপনি আমার বাদশাহ্। আমার উপর আপনার অনুগ্রহের সীমা নেই। তাছাড়া আপনার সাথে আমার এক প্রবল আন্তরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই যে পথে আমি আপনার ক্ষতির আশঙ্কা দেখব সে পথে চলতে আমি আপনাকে বারণ করব।

মহমান্য সম্রাট! আপনার একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে আমরা আমাদের অর্ধেক সৈন্য হারিয়েছি। অবশিষ্ট যারা প্রাণে বেঁচে মিসরে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদের অন্তর থেকে এখনো আরবদের ভয় দূর হয়ে যায়নি। সেনা শিবিরে এখনো অনেকে দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে ঘুম থেকে জেগে উঠে। তাই বলছিলাম, যদি এ অবশিষ্ট সৈন্যদের আপনি মহামারীর হাতে নিঃশেষ করতে চান তাহলে তাদের শামে পাঠান। আপনি কি একথা ভেবে দেখছেন না, মুজাহিদ শিবিরগুলোও যে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এ মহামারী আমাদের সৈন্যদের কি খাতির করবে? কাল পর্যন্ত আমি যে সংবাদ পেয়েছি তাতে জানতে পেরেছি, মুসলমানদের বেশ কিছু সালারও ইতিমধ্যে মহামারীতে মারা গেছে।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস কীরাসের কথায় একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। চেহারার আনন্দ আনন্দ ভাবটা কোথায় মিলিয়ে গেল। একটা বিমর্ষ ভাব চেহারায় ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর ধীরে ধীরে তার মাথাটি দুলে উঠল। বলল, আচ্ছা মহাপাদ্রী কীরাস! তোমার কথাই আমার যুক্তিসঙ্গতি মনে হচ্ছে। এবারের মত আমি শাম আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকছি।

* * *

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (রা.) মহামারীর এ দুঃসংবাদ পাওয়ার পূর্বেই শামে যাওয়ার ইচ্ছে করেছিলেন। মহামারীর সংবাদ পাওয়ার পর তিনি বেচাইন হয়ে গেলেন। শামে গিয়ে স্বচক্ষে মহামারীর অবস্থা দেখে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে অনেককে শামে যাওয়ার

হুকুম দিয়ে নিজে তৈরী হয়ে গেলেন। শামের পথে মদীনা থেকে একটি কাফেলা রওনা হয়ে গেল।

তাঁরা আরবের প্রান্ত সীমায় এক তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছলেন। হযরত ওমর (রা.) যাওয়ার আগেই শামের সর্বত্র সালারদের নিকট সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি শামের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে কার্যকারী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শামের পথে রওয়ানা হয়েছেন। শামে অবস্থানরত সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.), সালার ইয়াজিদ ইবনে আবী সুফিয়ান, সুবাহবিল ইবনে হাসানা আরো অনেকে এসে তাঁবুতে হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তারা এক যোগে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের অনুরোধ, আপনি আর সামনে অগ্রসর হবেন না। শামের আকাশে বাতাসে মরণ ব্যাধীর জীবাণু জড়িয়ে আছে। মৃত্যু ছাড়া তা থেকে বাঁচার আর কোন উপায় নেউ। তাঁরা তাঁকে মহামারীর ভয়াবহতার বিস্তারিত বিবরন তার নিকট তুলে ধরলেন।

হযরত ওমর (রা.) দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, এখানে এসে গতি ফিরিয়ে দেয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি যদি এখান থেকে ফিরে যাই তাহলে মহামারীতে যারা ইন্তেকাল করেছে তাদের রূহের সামনে আমি লজ্জায় দাঁড়াতে পারব না। আমি মুসলিম ভাইদের এ মহাবিপদে ফেলে ফিরে যেতে পারি না।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (রা.) স্বীয় মতে অটল অনড়। সালারগণ তাকে নানাভাবে বুঝালেন। বললেন, এখন এ সঙ্গীন মুহূর্তে যদি আমীরুল মু'মিনীনের কিছু একটা হয়ে যায় তাহলে ইসলামী জগতের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। যে ক্ষতিপূরণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। হযরত ওমর (রা.) তাদের কোন কথাই কানে তুললেন না। অবশেষে তিনি উপস্থিত সবার নিকট থেকে পরামর্শ চাইলেন। তখন সেখানে বেশ কিছু বর্ষীয়ান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রেও তারা দু'দল হয়ে গেলেন।

কেউ কেউ বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের কল্যাণ কামিতার জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য শামে যাচ্ছেন। তাই ভবিষ্যতে কি হবে বা হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করার কোন অর্থ হয় না। ভাগ্যে যা আছে তা ছাড়া অন্যকিছু হবে না। নির্ভয়ে আপনি শামে যান।

অন্য সকলে বললেন, না, হে আমীরুল মু'মিনীন! যে স্থানে ধ্বংস, বরবাদী ও মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই সে স্থানে আমীরুল মু'মিনীন এর যাওয়া কিছুতেই উচিত হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা আকল ও বুদ্ধি এজন্যই দিয়েছেন যে, যে কাজই আমরা করব তা ভেবে চিন্তে করব। হুট্ করে কিছু করা ঠিক নয়।

হযরত ওমর (রা.) দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। কি করবেন কিছুই স্থির করতে পারলেন না। অনেক চিন্তা ভাবনার পর কুরাইশ বংশের ঐসব সাহাবীকে

ডাকলেন যারা মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলের সাথে ছিলেন এবং তখন তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাসও (রা.) সেখানে ছিলেন। তাদের ডেকে তিনি পরামর্শ চাইলেন।

সিদ্ধান্ত হলো, আমীরুল মু'মিনীন এখন তার কাফেলার সবাইকে নিয়ে মদীনায় ফিরে যাবেন। এই ফয়সালার পর হযরত ওমর (রা.)-এর মন স্থির হল। তিনি নির্দেশ দিলেন, আগামীকাল সকালে কাফেলা মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে যাবে। সবাই যেন সফরের প্রস্তুতি নিয়ে নেয়।

এ ক্ষেত্রে ইতিহাস বিশারদগণ এক চমৎকার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আবু উবায়দা (রা.) শুরু থেকেই এমন পরামর্শ দিয়ে আসছিলেন, যেন হযরত ওমর (রা.) শামে না যান। মদীনায় ফিরে যান। কিন্তু কখন যে তার মত পাল্টে গেছে তা জানা নেই। মদীনার দিকে যাত্রা শুরুর আগে হযরত আবু উবায়দা (রা.) অকপটে হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! আল্লাহ্‌র ফয়সালা থেকে পালিয়ে যাচ্ছো?

এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আবু উবায়দা (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর বললেন, হে ইবনে জাররাহ! যদি একথাটি অন্য কেউ বলত,..... হ্যাঁ আমি আল্লাহ্‌র এক ফয়সালা থেকে অন্য ফয়সালার দিকে যাচ্ছি। আবু উবায়দা (রা.) নিরব হয়ে গেলেন। ঠিক তখনই আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বর্ষীয়ান সাহাবী, দূরদর্শী। উপস্থিত হয়েই বুঝে ফেললেন মুহূর্তকাল পূর্বে এখানে কি ঘটেছে। মৃদু হেসে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যদি তোমরা শুনতে পাও, অমুক স্থানে মহামারী দেখা দিয়েছে তাহলে সে স্থানে যেয়ো না। আর যদি তোমরা এমন স্থানে থাক যেখানে মহামারী দেখা দিয়েছে তাহলে তোমরা সে স্থান ছেড়ে পালিয়ে এসো না। কারণ হয়তো তুমি তোমার সাথে এ মহামারী নিয়ে আসবে আর তা অন্য স্থানেও ছড়িয়ে পড়বে।" রাসূলের বাণী শোনার পর হযরত ওমর (রা.)-এর মন একেবারে প্রশান্ত হয়ে গেল। দ্বিধা দ্বন্দ্বের আর কোন চিহ্ন বাকি রইল না। নিশ্চিন্ত মনে তিনি মদীনায় ফিরে এলেন।

মদীনায় পৌঁছার পর তার মনের আকাশে নানা চিন্তা ভিড় করতে লাগল। মুহূর্তকালের জন্য তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না। ঘুরে ঘুরে শামের কথা মনে পড়ে। শামের জনগণকে কিভাবে মহামারী থেকে বাঁচানো যায় শুধু তারই চিন্তা করেন। আবু উবায়দা (রা.)-এর কথাই বারবার তার হৃদয়পটে উদ্ভাসিত হয়। আবু উবায়দা (রা.) একজন সুদক্ষ সিপাহ সালার। তাকে রক্ষার কথাই বারবার মনে পড়ে। মদীনায় ফিরে আসার সময় তিনি আবু উবায়দা (র.া)-কে বলেছিলেন,

চলুন, আমাদের সাথে মদীনায়। কিছুদিন সেখানে থেকে আসুন। কিন্তু আবু উবায়দা (রা.) অত্যন্ত দৃঢ় ও স্থির কণ্ঠে বলেছিলেন, আমি আমার সাথীদের মৃত্যুর মুখে ছেড়ে চলে যেতে পারি না। তারপর বললেন, আমি আল্লাহর ফায়সালা থেকে পালিয়ে যেতে পারি না।

মদীনায় পৌঁছে ভেবেচিন্তে তিনি আবু উবায়দা (রা.)-এর নিকট পত্র লিখে একজন অশ্বারোহী বার্তাবাহককে পাঠিয়ে দিলেন। লিখে পাঠালেন, আমি এক জরুরী বিষয়ে তোমার সাথে সরাসরি আলোচনা করতে চাই। পত্র পওয়া মাত্র মদীনায় চলে আসবে।

আবু উবায়দা (রা.) পত্র পাঠ করে ভাবনার জগতে হারিয়ে গেলেন। দূর নিকট অনেক কিছু ভাবরেন। তারপর উত্তরে লিখলেন, "যে বিষয়ে আপনি আমার সাথে পরামর্শ করতে চাচ্চেন তা মুলতবী হতে পারে। কিন্তু আমি এখানে মুসলিম বাহিনীর সিপাহ সালার। আমি আমার বাহিনীকে এ মহাবিপদের মাঝে ফেলে কোথাও যেতে পারি না। আমি আমার সাথীদের ছেড়ে যেতে পারি না। আমি এখানেই আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষায় থাকব।

হযরত ওমর (রা.) পত্র পাঠ করার পর ভাবাবেগে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তার চোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু-প্রবাহিত হতে লাগল। উপস্থিত লোকদের একজন ত্রস্ত কণ্ঠে বলল, আমীরুল মু'মিনীন! আবু উবায়দার কোন কিছু ঘটেনি তো? হযরত ওমর (রা.)-এর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এল। কান্নামাখা কণ্ঠে বললেন, না.....তবে মনে হচ্ছে সে আমাদের রেখে চলে যাবে।

তারপর হযরত ওমর (রা.) আবু উবায়দা (রা.)-এর পত্রটি উপস্থিত লোকদের পাঠ করার জন্য দিলেন। তারপর বহু চিন্তা-ভাবনার পর তিনি আবু উবায়দা (রা.)-এর নিকট আরেকটি পত্র লিখে পাঠালেন। হে আবু উবায়দা! নিচু অঞ্চল ত্যাগ করে উঁচু স্থানে চলে যাও। মুজাহিদদেরও তোমার সাথে নিয়ে যাও। হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ মোতাবেক আমল করার কথা চিন্তা করছিলেন। ঠিক তখনই তিনি মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তৃতীয় দিনে তিনি ইন্তেকাল করলেন। যেদিন তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন সেদিনেই মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-কে তার স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। অবস্থা এতো ভয়াবহ ছিল যে, এ মহামারীতে মুয়ায (রা.)-এর দুই যুবক পুত্র ইন্তেকাল করেছিলেন। কিছুদিন পর তিনিও ইন্তেকাল করলেন। ইন্তেকালের আগে তিনি আমর ইবনে আস (রা.)-কে তার স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন।

আমর ইবনে আস (রা.) সিপাহ সালার হওয়ার সাথে সাথে মহামারী আক্রান্ত সকল এলাকার লোকদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন জনবসতি ত্যাগ করে পাহাড়ে চলে যায়। সাথে সাথে সবাই ঘরবাড়ি ফেলে পাহাড়ে চলে গেল।

তারপর থেকে মহামারীর প্রকোপ কমে এল। ধীরে ধীরে তা শেষ হয়ে গেল। কয়েক মাসের এ মহামারীতে পঁচিশ হাজার মুসলমান ইন্তেকাল করল। যে সব সালার এতে ইন্তেকাল করেছেন তারা হলেন, আবু উবায়দা, মুয়ায ইবনে জাবাল, ইয়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ান, হারেস ইবনে হিশাম, সুহাইল ইবনে আমর, উতবা ইবনে সুহাইল (রা.) সহ আরো অনেকে। হারেস ইবনে হিশাম (রা.)-এর বংশের সত্তর জন এবং খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-এর বংশের চল্লিশ জন মুসলমানও ইন্তেকাল করেছেন।

* * *

রাবেয়ার পিতা রাবেয়া ও ওয়াইসকে বলেছিল, শামে কিছু মুসলমান মদ হালাল মনে করে প্রকাশ্যে মদ পান শুরু করেছে। তখন ওয়াইস কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছিল। তারা বলেছিল, আপনি মুসলমানদের উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন। আর এটা ইসলামের প্রতি আপনার বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ। আসলে রাবেয়ার পিতা মিথ্যা কথা বলেনি। তার কথার পিছনে কিছু বাস্তবতাও ছিল।

ঐতিহাসিকরা বলেন, মুসলমানরা শাম পদানত করলে আরবের কিছু গোত্র শামের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। শামের খ্রিস্টানরা তখন মুসলমানদের বশ্যতা মেনে নেয়। কিন্তু দুষ্টমতি কিছু খ্রিস্টান মুসলমানদের ধ্বংস সাধনের অন্য পন্থা অবলম্বন করল। তারা তাদের সুন্দরী রূপসী কন্যাদের মাধ্যমে ভুলিয়ে ভালিয়ে মুসলমানদের মদ পানে অভ্যস্থ করে তুলে।

পরহেজগার মুসলমানরা তাদের মদ পান করতে দেখে নিষেধ করলে তারা বলত, কুরআন মদ পানকে হারাম করেনি। কুরআন বলেছে, "তোমরা কি এসব বস্তু পরিহার করবে না?" তার অর্থ হল, আল্লাহ্ মদের বিষয়টি বান্দাদের জিম্মায় ছেড়ে দিয়েছেন। বান্দা তা পরিহার করতেও পারে। আবার ইচ্ছে করলে গ্রহণও করতে পারে। দলীল হিসাবে তারা আরেকটি যুক্তি উপস্থাপন করে বলে, দেখ না প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগে মদ পান করার কারণে কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি!

মদের ব্যাপারটি নিয়ে শামের কয়েকজন লোকে বাড়াবাড়ি করছিল। সিপাহ সালার আবু উবায়দা (রা.) বিষয়টি অবহিত হলেন। তিনি এ ব্যাপারটি তদন্ত করে তার সত্যতা যাচাই করলেন। মদ পানকারীদের বিভ্রান্তিকর প্রমাণ পেশের কথাও শুনতে পেলেন। তিনি দারুণ বিস্মিত হলেন। কিন্তু নিজে কোন ফয়সালা করলেন না। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট বিষয়টি বিস্তারিত লিখে তার বিধান চেয়ে পাঠালেন।

হযরত ওমর (রা.) বিষয়টি অবহিত হয়ে নিয়মানুসারে সাহাবীদের পরামর্শ সভা আহ্বান করলেন। উপস্থিত হলেন মদীনায় অবস্থানরত বিজ্ঞ সাহাবীগণ। বিষয়টি শোনার পর প্রত্যেকে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করলেন। হযরত আলী (রা.) বললেন, মদ পান করলে মানুষ বুদ্ধিশক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে মুখে যা আসে তাই বলে। আল্লাহ্র রাসূল ও কুরআনের ব্যাপারেও তারা অকপটে মিথ্যা বলতে পারে।

হযরত আলী (রা.)-এর একথা শোনার পর হযরত ওমর (রা.)-এর মুখ দিয়ে হঠাৎ অবলীলাক্রমে বেরিয়ে এল, তাহলে মদ পানের শাস্তি হল তাকে আশিটি চাবুক মারা!

তখন হযরত ওমর (রা.) আবু উবায়দা (রা.)-এর নিকট লিখে পাঠালেন, যারা মদ পান করে তাদের ধরে আন। যদি তারা মদ পানকে হালাল মনে করে তবে তাদের হত্যা করে দাও। আর যদি তারা স্বীকার করে যে, মদ পান করা হারাম তবে তাদের প্রত্যেককে আশিটি চাবুক মার। এটাই মদ পানের শাস্তি।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশ পেয়ে আবু উবায়দা (রা.) তালাস করে করে সব মদ পানকারীকে ধরে আনালেন। হয়তো তারা বুঝে ফেলেছিল যে, যদি তারা বলে যে মদ পান করা হালাল তাহলে তাদের হত্যা করা হবে। তাই তাদের কেউ বলল না যে, মদ পান করা হালাল। সবাই এক বাক্যে বলল, মদ পান করা হারাম।

তারপর আবু উবায়দা (রা.) বললেন, হে মুসলিম ভাইয়েরা! তোমাদের উপর আল্লাহ্র কোন না কোন শাস্তি আসবে। আমি তোমাদের প্রত্যেককে আশিটি করে চাবুক মারার শাস্তি দিচ্ছি। তারপর তাদের প্রত্যেককে শাস্তি প্রদান করা হল। তারপর শামের কোন মুসলমান মদ পান তো দূরের কথা, মদের নামগন্ধ নেয়ারও সাহস পায়নি।

* * *

কয়েক মাস কেটে গেল। ইবনে সামির এখনো বিন ইয়ামিনের নিকট অবস্থান করছে। এর মধ্যে বিন ইয়ামিন ইবনে সামির ও আইনীর শুভ বিবাহও সম্পাদন করে দিয়েছে। ইবনে সামির একজন দৈনিক। বেকার বসে থাকা তার ধাতে সয় না। তাই কিছু একটা করার জন্য সে অস্থির হয়ে পড়ল।

এ ছাড়াও সে এক কট্টরপন্থী গোঁড়া কিবতী খৃস্টান। সে ছিল বিন ইয়ামিনের গুপ্তচর। নানা ধরনের সংবাদ সে বিন ইয়ামিনের নিকট পাঠাত। কিন্তু এখন সে বেকার নিষ্কর্ম হয়ে পড়ে আছে। বিন ইয়ামিন তাকে কোন কাজ দিচ্ছে না। তার কারণ, ইবনে সামির পলাতক সৈনিক। দু'জন সৈন্যকে হত্যা করে সে পালিয়ে

এসেছে। তদুপরি একজন অপহৃত যুবতীকে সাথে করে যদি সে ধরা পড়ে তাহলে হত্যা ছাড়া তার অন্য কোন শাস্তি হবে না। এ সব বিবেচনা করেই বিন ইয়ামিন এখন তাকে কোন কাজের দায়িত্ব দিচ্ছে না। এদিকে ইবনে সামির বেকার থাকতে থাকতে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে।

সম্রাট হিরাক্লিয়ার্সের প্রাসাদ পর্যন্ত বিন ইয়ামিনের গুপ্তচর বাহিনী ছড়িয়ে আছে। সে সময় মিশরে সম্রাট হিরাক্লিয়ার্স থাকত না, বাইজেন্টাইনে থাকত। তবে মিশরের শাসন কার্য পরিচালনা করত সম্রাটের নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নর মুকাওকিস। আর সামরিক বিষয়গুলো পরিচালনা করত সম্রাটের নিযুক্ত এক প্রসিদ্ধ জেনারেল আতরাবূন।

মুসলমানরা শাম পদানত করে নেয়ার পর সম্রাট তা পুনরায় দখল করার চিন্তায় বিভোর ছিল। তাই সৈন্য বাহিনী পুনর্গঠনের প্রতি তার দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল।

একদিন বিন ইয়ামিনের নিকট দু'ব্যক্তি এল। এরা তারই নিযুক্ত গুপ্তচর। মিশরের রাজ প্রাসাদে তারা নিয়োগপ্রাপ্ত। কিছুদিনের জন্য তারা বাইজেন্টাইনে এসেছে। বিন ইয়ামিন তাদের নিকট খবরাখবর জানতে চাইলে তারা বলল, সম্রাট হিরাক্লিয়ার্সের মাথায় এখন শামের চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে। অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে সে শামে সৈন্য পাঠানোর চিন্তা করছে।

আরবে যখন দুর্ভিক্ষ চলছিল তখন হিরাক্লিয়ার্স সেখানে সৈন্য পাঠাতে চেয়েছিল। কিন্তু সম্রাটের পরামর্শদাতারা তাকে বারণ করে বলল, এ দুর্ভিক্ষ শুধু আরবে। শামে কোন দুর্ভিক্ষ নেই। রোমান সৈন্যরা আরবে প্রবেশ করলে শাম থেকে মুসলিম বাহিনী দ্রুত আরবে ছুটে আসবে এবং পিছন দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলবে। ফলে রোমান বাহিনীর যে কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

তারপর তারা বলল, এর কিছুদিন পর শামে যখন মহামারী দেখা দিল, হাজার হাজার মানুষ যখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগল, তখন সম্রাট হিরাক্লিয়াস শাম আক্রমণ করার ইচ্ছে করল। সম্রাটের পরামর্শ দাতারাও এবার আক্রমণের পক্ষে মত দিল। সম্রাট এতে মহা খুশি। কিন্তু মহাপাদ্রী কীরস ভেবে চিন্তে বলল, সম্রাট মহাশয়! যদি রোমান সৈন্যরা শামে প্রবেশ করে তাহলে তাদের মাঝেও মহামারী ছড়িয়ে পড়বে। ফলে অবস্থা এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে যে, পশ্চাতে ফিরে আসা বা মুসলিম বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হওয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না।

এছাড়া যদি মিশর থেকে রোমান সৈন্যদের শামের যুদ্ধ ময়দানে নেয়া হয় তাহলে এই সুযোগে কট্টরপন্থী কিবতী খৃস্টান ও অন্যান্য খৃস্টান দলগুলো বিদ্রোহ করে বসবে। মিশরে অবশিষ্ট সামান্য সৈন্যরা তাদের দমন করতে ব্যর্থ হবে। ফলে মিশর হাত ছাড়া হয়ে যাবে আর শামও পুনর্দখল করা সম্ভব হবে না।

গুপ্তচরদ্বয় আরো বলল যে, মিশর শাসক মুকাওকিস ও সেনাপতি আতরাবুন হিরাক্লিয়াসকে এ পরামর্শ দিচ্ছে যেন তারা শামের খৃস্টানদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করে এবং ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। মুকাওকিসের এ পরামর্শ তারা উভয়ে পছন্দ করেছে। তবে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ এখনো নেয়া হয়নি।

শামের অধিবাসীদের অধিকাংশই খৃস্টান। এরা বিদ্রোহ করলে অবস্থা কোন দিকে মোড় নেয় তা বলা মুশকিল। কারণ এরা যোদ্ধা জাতি। তবে ইতিপূর্বে একবার বিদ্রোহ করে সফল হতে পারেনি। মুসলিম বাহিনী কঠোর হাতে তাদের দমন করেছে। তবুও শামে এ ধরনের বিদ্রোহের আশংকা এখনো রয়েছে।

ঐতিহাসিকরা বলেছে, যদি মহামারী চলাকালে সম্রাট হিরাক্লিয়াস শাম আক্রমণ করে বসত তাহলে মুসলিম বাহিনী এক ভীষণ সংকটে নিপতিত হত। কারণ ইতিমধ্যে বহু মুসলিম মুজাহিদ মহামারীতে ইন্তেকাল করেছেন। কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় সেনাপতিও ইন্তেকাল করেছেন। হিরাক্লিয়াস আক্রমণ করলে হয়তো ইতিহাসের ধারা অন্য পথে যাত্রা করত। কিন্তু মহাপাদ্রী কীরাসের পরামর্শে তা হয়নি। সম্রাট আক্রমণ করার পরিকল্পনা স্থগিত করে দিয়েছিলেন।

* * *

ইতিমধ্যে বিন ইয়ামিনের নিকট আরো কয়েকজন গোঁড়া খৃস্টান এসেছে। এরা সবাই তার গুপ্তচর। তাদের দু'একজন ইবনে সামেয়ের মত পালাতক সৈন্য। এদের দু'জনের সাথে ইবনে সামেবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। খৃস্টান ধর্মে গোঁড়া প্রকৃতির এই তিন বন্ধুর মাঝে অনেক গোপন আলোচনা হল। এরা তিনজনই মুসলমানদের ও রোমানদের ঘোর বিরোধী।

একদিন পড়ন্ত বিকেলের সোনালী আভায় যখন প্রকৃতি মোহময়, চারদিকে বইছে মৃদুমন্দ শীতল বায়ু তখন তিন বন্ধু এক গাছের নিচে গিয়ে বসল। জীবনের ফেলে আসা দিনগুলো নিয়ে আলোচনা করছিল। শামের কথা, মুসলমানদের উত্থানের কথা, নানা যুদ্ধের কথা, রোমান সৈন্যদের ভীরুতার কথা, সম্রাট পরিবারের কথা ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথা প্রসঙ্গে এক বন্ধু বলল, তোমাদের কি মনে হয়, শামের খৃস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে?

অপর বন্ধু বলল, না, বিন ইয়ামিন এ ধরনের বিদ্রোহের পক্ষে নয়, তার কথা হল, এ ধরনের বিদ্রোহ ইতিপূর্বে হয়েছে। কিন্তু নির্মমভাবে তা ব্যর্থ হয়েছে। আর সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মহাপাদ্রী কীরাসও তাই বলে। সেও এ ধরনের বিদ্রোহ অপছন্দ করে।

ইবনে সামির বলল, তাহলে কি সম্রাট হিরাক্লিয়াস শাম আক্রমণ করেছেন না!

অপর বন্ধু বলল, না, তা আর হচ্ছে না। সম্রাট হিরাক্লিয়াস দোটানা অবস্থায় আছেন। কি করবেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

ইবনে সামির বলল, আমার মনে হচ্ছে, এরা মুসলমানদের সুযোগ দিচ্ছে যা খৃষ্টধর্মের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটাই আক্রমণের সুবর্ণ সুযোগ, মোক্ষম সময়। এ সুযোগকে কাজে না লাগালে মুসলমানরা আবার শক্তি সঞ্জয় করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে। তারপরই মিশর আক্রমণ করবে।

এক বন্ধু বলল, বিন ইয়ামিনের চিন্তাধারা অত্যন্ত বিস্ময়কর। সে ভাবছে, শামে কোন প্রকার বিদ্রোহের প্রয়োজন নেই। মুসলমানরা মহামারী থেকে মুক্তি পেয়ে শক্তি সঞ্চয় করে মিশর আক্রমণ করে রোমানদের তাড়িয়ে দিক। তারপর সে মিশর দখলের ব্যবস্থা করবে।

আরেক বন্ধু অত্যন্ত উদ্বেলিত কণ্ঠে বলল, না না, তা হতে দিব না। তাহলে কি সে চায় যে শামের ন্যায় মিশরও মুসলমানরা পদানত করুক। এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। প্রয়োজনে আমরা শামে বিদ্রোহ করাব। কি বন্ধুরা! তোমরা কি এতে একমত?

তারা একটা পরিকল্পনা তৈরী করল। ভাবল, শামের খৃস্টানদের বিদ্রোহে উৎসাহিত ও উদ্বেলিত করার জন্য এখান থেকে কিছু লোক শামে পাঠানো দরকার। তারা শামে গিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এ কাজ সম্পাদন করবে। কিন্তু কাদেরকে তারা পাঠাবে? তাদের অনুগত তো কেউ নেই। বরং তারাই তো বিন ইয়ামিনের অনুগত গুপ্তচর।

একজন বলল, বন্ধুদ্বয়! আমরাই তো এ কাজ সম্পাদনে এগিয়ে যেতে পারি। এ গুরুতর কাজ অন্যের দ্বারা কতটুকু হতে পারে! আমরা তিন বন্ধু তো আছি আর আমাদের সাথে থাকবে আইনী। জীবনের সকল সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দিয়ে যদি সফল হতে পারি তাহলে খোদাবন্দ ইসা মসীহ এর অনুগ্রহে আমাদের জীবন হবে চির ধন্য। আমরা হব চির অমর। যুগ যুগ ধরে খৃস্টধর্মে বিশ্বাসীরা আমাদের নাম শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করবে।

অপর দুই বন্ধু বলল, বন্ধু! তুমি এক চমৎকার প্রস্তাব দিলে। আমরা প্রস্তুত।

কথা চলাকালে আইনী এসে তাদের পাশে বসেছিল। সবকিছুই সে শুনেছে। তার মনেও ছিল দুঃসাহসিক কিছু একটা করার অনন্ত জোয়ার। স্বামী ও তার বন্ধুদ্বয়ের কথাবার্তা শুনে সে তেজোদ্বীপ্ত কণ্ঠে বলল, আমিও থাকব আপনাদের পাশে। খৃস্টধর্মের জন্য জীবন কুরবান করতে আমিও প্রস্তুত।

বিন ইয়ামীনের আস্তাবলে বেশ কিছু ঘোড়া ছিল। এক রাতে তারা আস্তাবল থেকে চারটি ঘোড়া নিয়ে সবার অজ্ঞাতসারে বেড়িয়ে পড়ল। বিন ইয়ামিনের আস্তাবলে কোন প্রহরী ছিল না। তাই কেউ তাদের ব্যাপারে কিছুই জানতে পারল না।

* * *

সকালের সূর্য যখন নিটোল চেহারায় হাসতে হাসতে উদ্ভাসিত হল তখন তারা অনেক দূর চলে গেছে। দুর্গম পথ, বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি আর মরুভূমি অতিক্রম করে তারা এখন অনেক দূরে। বিন ইয়ামিনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বিন ইয়ামিন সকালে সংবাদ পেল যে তার আস্তাবলের চারটি ঘোড়া নেই আর সেই চারজন লোক উধাও। ইবনে সামির, আইনী আরো দু'জন। এ সংবাদে বিন ইয়ামিন ভারাক্রান্ত হল। বিষণ্নতার একটা মলিন সূক্ষ্ম পর্দা যেন তার উজ্জ্বল চেহারায় আবরণ ঢেলে দিল। বিন ইয়ামিন তাদের সম্পর্কে কিছুই বললেন না। কেন যেন নিরব রইলেন।

চলার পথে তারা জনবসতি ও সৈন্যদের চৌকি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলছে। ইবনে সামিরকে নিয়েই ভয়। কারণ সে পলাতক সৈন্য। যে কোন সময় রোমান সৈন্যদের হাতে গ্রেপ্তার হতে পারে। ইবনে সামির অবশ্য তার বেশভূষা ও আকার আকৃতি পাল্টে নিয়েছে। ঘন চাপ দাড়িতে তাকে এখন চেনাই মুশকিল। আর তার গায়ে এখন পাদ্রীদের লম্বা আলখেল্লা। দেখলে এখন কোনভাবেই বুঝা যায় না যে, সে সেই দুর্ধর্ষ রোমান সৈনিক।

ইবনে সামির সৈনিক জীবনে মিশরের অনেক জায়গায় ঘুরেছে। অনেক মানুষের সাথে মিশেছে। মিশরের সকল সেনানিবাসেই তার পরিচিত লোকজন আছে। তাদের থেকে দূরে থাকা এখন খুবই জরুরী। মিশরের বন্দরগুলো তার নখদর্পণে। সে জানে, মিশরের পূর্বপ্রান্তে লোহিত সাগরের তীরে এবং আরো একটু সামনে দু'টি বন্দর রয়েছে। কিন্তু এ বন্দর দু'টিতে যাওয়া যাবে না। কারণ সেখানে সর্বদা রোমান সৈন্যরা প্রহরা দেয়। এছাড়া লোহিত সাগরের তীরে এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে ছোট খাট জাহাজ নোঙ্গর করে। রোমান সৈন্যরা সেখানে প্রহরা দেয় না।

তিন দিন তিন রাত পর তারা এক বন্দরে পৌছল। এখানে ছোট পালতোলা জাহাজ পাওয়া যাবে। বন্দরটি নিরাপদ। রোমান সৈন্যদের প্রহরা সেখানে নেই। বন্দরে পৌছে তারা জানতে পারল, তিন চারদিন পর একটি জাহাজ বন্দর ছেড়ে যাবে। জাহাজটি বেশ বড়। তারা তাদের ঘোড়াও সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে। তারা বন্দরেই বিশ্রাম করল। চতুর্থদিন তারা জাহাজে আরোহণ করল। তাদের পরিকল্পনা, আরবের কোন উপকূলে পৌছতে পারলেই তারা সেখান থেকে সহজে শামে পৌছতে পারবে।

* * *

যদি জাহাজটি সোজাসুজি আরব উপকূলের দিকে যেত তাহলে তার দূরত্ব হত প্রায় একশত মাইল। কিন্তু জাহাজটি আরব উপকূলের এক দূরবর্তী বন্দরে যাচ্ছে তাই প্রায় সাড়ে তিনশত মাইল নদীপথ অতিক্রম করতে হবে। এতে কয়েকদিন লেগে যাবে।

জাহাজ নোঙ্গর তুলে পাল উড়িয়ে দিল। তর তর করে সামনে চলতে লাগল। পিছনে পড়ে রইল উপকূলের ছোট ছোট ঘর আর দোকানগুলো। বাতাসের ঝাপটায় কম্পমান গাছের ডালপালাগুলো যেন হাত নেড়ে নেড়ে তাদের চির বিদায় জানাচ্ছে। তরঙ্গ মালার বুক চিরে জাহাজটি বেশ দূর এগিয়ে গেলে ইবনে সামির তার দুই বন্ধুকে বলল, জাহাজের আরোহীদের সাথে কথাবার্তা আর আলাপ-আলোচনা করে যাদের খৃস্টান পাওয়া যায় তাদেরকে আমাদের এই মিশনের সঙ্গী বানানোর প্রচেষ্টা করতে হবে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হল। দু'দিনে তারা জেনে নিল জাহাজে কতজন খৃস্টান আছে আর কতজন মুসলমান আছে।

ইতিমধ্যে ইবনে সামির জেনে নিয়েছে যে, জাহাজটি তাদেরকে আরব উপকূলের কোন এক বন্দরে নামিয়ে দিবে। সেখান থেকে শাম অনেক অনেক দূর। এ দীর্ঘ পথে রয়েছে মরুভূমি আর মরুভূমি। খৃস্টধর্মের নামে এ দীর্ঘ সফরের কষ্টের জন্য সে নিজেও মানসিকভাবে প্রস্তুত হল। সাথীদেরও প্রস্তুত করে নিল। তা ছাড়া তাদের সাথে ঘোড়া রয়েছে। তাই তারা তেমন পেরেশান হল না।

এ কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় তারা জাহাজে তাদের সমমনা চার-পাঁচজন নেতৃস্থানীয় খৃস্টান পেল। তাদের একজন শামের এক গোত্রের সর্দার। তিন বন্ধু মিলে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্‌কাতে লাগল। আলোচনা পর্যালোচনাও হল বেশ। অবশেষে তারা তাদের মতামত মেনে নিতে বাধ্য হল। ইবনে সামির ও তার বন্ধুরা তাদের এ কথা জানাল, তারা এখন শামে যাচ্ছে। সেখানে খৃস্টান গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত ও উদ্বেলিত করবে। প্রয়োজনে তারা খৃস্টধর্মের প্রচার প্রসার ও রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করবে।

তারা আরেকজন মধ্যবয়সী খৃস্টানকে পেল। দারুন সতর্ক। তার কথা বলার ভঙ্গীই অন্য ধরনের। কারো সাথে কথা বললে শ্রোতা অবশ্যই তার কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং তার মতামত মেনে নিতে বাধ্য হয়।

ইবনে সামির ও তার সাথীরা এ মধ্যবয়সী খৃস্টানকে তাদের দলে ভীড়ানোর পরিকল্পনা করল। একদিন তিনজনই তার নিকট এল। কথাবার্তা শুরু করল। ইবনে সামির জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় থাকেন?

লোকটি বলল, আমি শামের অমুক শহরে থাকি। এবার তাদের টনক নড়ে উঠল। ভাবল, তাহলে তো ভালই হবে; সাথে তাকে নিতে পারলে বেশ জমবে। তারা তাদের পরিকল্পনা মোতাবেক আলোচনা করতে লাগল। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের আলোচনা, মুসলমানদের আলোচনা, মিশরের অবস্থা ইত্যাদি আলোচনার পর এবার আসল কথা শুরু হল। তাহল বর্তমান প্রেক্ষাপটে খৃস্টধর্মের অনুসারীদের কি করতে হবে। কিভাবে মুসলমানদের এই আগ্রাসন থেকে তারা স্বধর্ম নিয়ে স্বকীয়তা বজায় রেখে বেঁচে থাকতে পারবে?

কথার মাঝে ইবনে সামির বলল, কে কি করল বা না করল তা এখন আমরা ভাবতে পারি না। বরং খৃস্টধর্মের অনুসারীদের এখন একতাবদ্ধ হয়ে খৃস্টরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বত্র বিদ্রোহ করতে হবে।

ইবনে সামির আরো একটু অগ্রসর হয়ে বলল, এখন যদি শামের খৃস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে কমপক্ষে তাদের ঐ অঞ্চলে খৃস্টরাজ্য তো প্রতিষ্ঠিত হবে।

মধ্য বয়সী খৃস্টান লোকটি ইবনে সামিরের কথা জোড়ালভাবে সমর্থন করল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ নিরব থেকে বলল, আচ্ছা তা বাস্তবায়নের উপায় কি হতে পারে?

ইবনে সামির তখন হাসতে হাসতে বলল, আমরা এ বার্তা নিয়েই শামে যাচ্ছি। গোপনে আমরা এ কাজটাই করতে চাচ্ছি।

খৃস্টান লোকটি কথার ছলে তাদের থেকে সম্রাট হিরাক্লিয়ার্স, বিন ইয়ামিন ও মুকাওকিসের কি পরিকল্পনা তাও জেনে নিল। লোকটি তাদের থেকে এ কথাও জেনে নিল যে, বর্তমানে রোমান সৈন্যদের অবস্থা কেমন? রোমান জেনারেলরাই বা কি চিন্তা করছে? ইবনে সামির নিজেও সৈনিক, তাছাড়া বিন ইয়ামিনের নিকট গিয়ে সে আরো অনেক কিছু জানতে পেরেছে। সে এসব কিছুই লোকটিকে বলেছে।

এক রাতে ইবনে সামির জাহাজের উপরে একেবারে ছাদে গেল, ছিল জ্যোৎস্না বিধৌত রজনী। আকাশে হাল্কা মেঘের ফাঁক গলে যেন গলিত চাঁদির ধারা সমুদ্রের বুকে পড়ছে। তরঙ্গমালা যেন মাথায় ঝিকমিকি তাজের মুকুট নিয়ে ছুটে চলছে। ইবনে সামির বিমোহিত হৃদয়ে চারদিক অবলোকন করছে।

হঠাৎ তার দৃষ্টি এক ব্যক্তির উপর পড়ল। জাহাজের ছাদের এক প্রান্তে। মনে হল লোকটি সেই মধ্যবয়সী খৃস্টান। আবছা অন্ধকারে তার সন্দেহ হল। অন্য লোকও হতে পারে। ইবনে সামির আরো একটু এগিয়ে গেল। বিস্ময়ে তার চোখ একেবারে ছানাবড়া। আরে সে তো সেই মধ্যবয়সী লোকটি। তবে তার বিস্ময়ে

কারণ কিন্তু অন্য কিছু। সে দেখল, সেই লোকটি সেখানে নামায পড়ছে। আরো দু'জন লোকও তার অদূরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছে।

নামায শেষ হলে ইবনে সামির তার আরো নিকটে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, তুমি বলেছিলে, তুমি মুসলমান নও। কিন্তু এখন দেখছি তুমি নামায পড়ছো?

খৃস্টান লোকটি বলল, ভাই আমি দরবেশ মানুষ। আল্লাহ্র ইবাদত করা দরকার, তাই তার ইবাদত করি। আমি মুসলমানদের নামায পড়ছি না; বরং আমি এভাবে আল্লাহকে স্মরণ করছি।

এ উত্তর শুনে ইবনে সামির সন্তুষ্ট হতে পারল না। আরো বেশ কিছু প্রশ্ন তাকে করল আর সে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করল। এরপর ইবনে সামির চলে এল। তবে তার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না যে সে একজন খৃস্টান। তার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেছে যে সে মুসলমান। সে তার বন্ধুদ্বয়ের নিকট গিয়ে সবকিছু বলল। তারপর অভিমত প্রকাশ করে বলল, এ ধরনের লোকেরা গুপ্তচর হয়। আমার মনে হয়, সে মুসলমানদের গুপ্তচর।

পরদিন ইবনে সামির অন্যান্য মুসলমান যাত্রীদের সাথে আলোচনা করে জেনে নিল যে, সে মুসলমান। একজন আরব। তবে কেউ বলতে পারেনি, সে কি গুপ্তচর না সাধারণ নাগরিক।

একথা জানার পর ইবনে সামির দারুন ক্ষীপ্ত হয়ে উঠল। কারণ লোকটি খৃস্টানের বেশ ধরে তার থেকে অনেক গোপন কথা জেনে নিয়েছে যা সে কারো নিকট বলত না। এরপর ইবনে সামির তার বন্ধুদ্বয়ের নিকট বলল, এই খৃস্টানভেশী লোকটি আমার থেকে অনেক গোপন কথা জেনে নিয়েছে। তাকে কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। বন্ধুদ্বয়ের মাথায়ও ছিল উন্মাদনা। তারা সিদ্ধান্ত নিল, হাত পা বেধে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হবে।

ইবনে সামির বলল, দেরি করা ঠিক হবে না। আজ রাতেই তা করতে হবে। তার সাথে আমার বেশ আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়েছে। আমি তাকে বলল, চল বন্ধু জাহাজের ছাদে গিয়ে বসি। তারপর তাকে ছাদের এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে কেউ যায় না। সেখান থেকেই তাকে সমুদ্রে ফেলে দিব।

বিকালে ইবনে সামির সেই মুসলমান গুপ্তচরের নিকট গেল। গভীর আন্তরিকতার সাথে কথাবার্তা বলল। তারপর বিনীত কণ্ঠে বলল, বন্ধু! আজ আমি তোমার সাথে রাতে নির্জনে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি।

মুসলমান গুপ্তচর বলল, কোন বিশেষ কথা আছে, না এমনি গল্পগুজব করবে?

ইবনে সামির বলল, ভাই! আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করেছি। অবশেষে তোমার কথাই মানতে বাধ্য হয়েছি যে, তুমি সত্যই একজন দরবেশ মানুষ।

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তুমি কত ইবাদত করছ। তুমি অত্যন্ত জ্ঞানী। আমি তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাচ্ছি। আজ রাতে তুমি আমাকে সে পথের সন্ধান দিবে। আসলে আমি এক পেরেশান ও অস্থির চিত্তের মানুষ। কোথাও শান্তি পাই না। মনে হয় আল্লাহ্ আমার প্রতি নারাজ। আমি তোমাকে আমার জীবন কাহিনী শুনাতে চাই।

মুসলমান গুপ্তচর বলল, তুমি যখন বলবে তখনই আমি এসে উপস্থিত হব। তুমি চাইলে আমি সারারাত জেগে তোমার জীবন কাহিনী শুনব।

ইবনে সামির বলল, যখন জাহাজের যাত্রীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়বে তখন তুমি ছাদে চলে আসবে। মুসলমান গুপ্তচর তা মেনে নিল।

ইবনে সামিরের অন্তর এবার মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় আনন্দে দুলছে। ছুটে গেল বন্ধুদ্বয়ের নিকট। বলল, আজ রাতে শিকার নিজেই নিজের জালে আটকা পড়বে। একথা শুনে বন্ধুদ্বয় খুব আনন্দিত হল। মুসলমান গুপ্তচরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সব পরিকল্পনা পাকা করে নিল।

* * *

সে দিন জাহাজটি প্রায় অর্ধপথ অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। রাতে নির্ধারিত সময়ে মুসলমান গুপ্তচরটি জাহাজের ছাদে চলে গেল। এর কিছুক্ষণ পরই ইবনে সামির তার নিকট এল। জাহাজের যাত্রীরা সবাই শুয়ে আছে। ছাদে দু'তিন জন মানুষ বসে আছে। তারা রাতের জ্যোৎস্নার অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করছে। আকাশে তখন থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আকাশের দিগন্ত থেকে মেঘমালারা যেন বিক্ষোভ করতে করতে ছুটে আসছে। সমুদ্রের বুকে বাতাস একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। থমথমে অবস্থা। জাহাজের বিরাট পাল যা বাতাসের ঝাপটায় ফুলে ছিল তা চুপসে গেছে। ফলে জাহাজও তার গতি হারিয়ে ধীরে ধীরে চলছে।

ইবনে সামির মুসলমান গুপ্তচরটির হাত ধরে জাহাজের ছাদের উপর হাঁটছে। তারা জ্যোৎস্নার অপরূপ ধারা দেখছে। তারা জাহাজের একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে চাঁদ মেঘের আড়ালে মুখ লুকাল। ফলে চারদিক আবছা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ইবনে সামিরের উভয় বন্ধু ঠিক তখনই ছাদের উপর উঠে মুসলমান গুপ্তচরটির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

এ সময় জাহাজের ছাদে আর কেউ নেই। তাছাড়া মেঘমালাও তাদের সাহায্য করছে। জ্যোৎস্নালোকিত রাতকে হঠাৎ অন্ধকার করে দিয়ে তাদের সহায়তায় যেন এগিয়ে এসেছে। ঠিক তখন ঠাণ্ডা বায়ুর ঝাপটায় জাহাজটি দুলে উঠল। তিনজনই প্রস্তুত, এখনই মুসলমান গুপ্তচরকে অনন্ত পানির বুকে ফেলে দিবে। ঠিক তখন পশ্চাৎ দিক থেকে উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ এল, ভাইয়েরা! দ্রুত

নিচে নেমে আসুন। ঝড় ধেয়ে আসছে। কেউ জাহাজের ছাদে থাকবেন না। তারা পশ্চাতে ফিরে দেখল, জাহাজের দু'তিনজন মাল্লা তাদের দিকে ছুটে আসছে। তাদেরকে দ্রুত নিচে যাওয়ার জন্য তাড়া করছে। আর নিজেরা পালের দড়ি ঠিকঠাক করছে।

সাথে সাথে বাতাস তীব্র আকার ধারণ করল। দৈত্যের মত শিষ দিতে দিতে এগিয়ে আসতে লাগল বাতাস। তারপরই শুরু হল মুষল ধারায় বৃষ্টি। ঝর ঝর করে অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। সাথে বইছে ঝঞ্ঝা বায়ু। বিরাট জাহাজটি কাগজের নৌকার মত সমুদ্রের বুকে হেলে দুলে চলছে। আর পর্বতমালার ন্যায় উঁচু উঁচু তরঙ্গমালা সমুদ্রের বুকে আছড়ে পড়ছে।

জাহাজের যাত্রীদের ঘুম ভেঙে গেছে। একে অপরের গায়ে ছিটকে পড়ছে। শিশু আর মহিলারা চিৎকার করে কাঁদছে। ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত। সবার চেহারা ফ্যাকাসে রক্তশূন্য। ইবনে সামির আর তার বন্ধুরা নীল নক্সা ফেলে কোথায় গেল তার খবর নেই। সমুদ্রের বিশাল বিশাল তরঙ্গ ঝাপটায় জাহাজে পানি ঢুকছে।

জাহাজের পাল খুলে মাস্তুলের সাথে পেচিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তড়িঘড়ি করার কারণে ভালভাবে আটকানো হয়নি। তার কিছু অংশ খুলে বাতাসের ঝাপটায় বিকট আওয়াজ করতে লাগল। জাহাজটি এক প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ল। কেউ কারো দিকে খেয়াল রাখতে পারছে না। মায়েরা শিশু বাচ্চাদের বুকে চেপে ধরে রেখেছে। ঢেউয়ের তালে তালে যখন জাহাজটি উপরে উঠছে তারপর আছড়ে পড়ছে তখন শিশু বাচ্চাদের বুকের সাথে জড়িয়ে রাখাও কষ্টকর হচ্ছে। জাহাজের ভিতর প্রচুর পানি প্রবেশ করে সব ভিজে গেছে।

যাত্রীরা সবাই চিৎকার করছে। ডাকাডাকি করছে। কিন্তু ঝড়ের প্রচণ্ডতায় তা শোনা যাচ্ছে না। জাহাজটি এখন মাঝি মাল্লাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। জাহাজকে আর সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ঝড়ের ঝাপটায় জাহাজটি উপকূলের অনেক নিকটে চলে এসেছে। প্রচুর পানি উঠার কারণে তা ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ নিরাশ হয়ে পানিতে ঝাপ দিচ্ছে এবং উপকূলের দিকে সাঁতরে যাচ্ছে। এরপরই এক প্রবল ঝাপটায় জাহাজটি কাত হয়ে ডুবে গেল।

* * *

সকালের প্রশান্ত আকাশে ডানা মেলে উড়ে উড়ে যাচ্ছে খণ্ড খণ্ড মেঘ। এ শান্ত পরিবেশ দেখে বুঝা যাবে না, রাতে কী তাণ্ডব লীলা বয়ে গেছে সমুদ্রের বুক জুড়ে। অথচ এখন সমুদ্রের বুক একেবারে শান্ত সমাহিত।

উপকূলের দূরে দূরে এদিকে সেদিকে কিছু কিছু মানুষ দেখা যাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। কেউ কেউ পা টেনে টেনে

হাঁটছে। এরা ভাগ্যবান। সাঁতার কেটে কোনক্রমে উপকূলে এসে জীবন বাঁচিয়েছে। যারা সাঁতার জানে না তাদের এই সমুদ্রের বুকে সলিল সমাধি রচিত হয়েছে ।

জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার পরের দিনের ঘটনা। তিনজন লোক ধীরে ধীরে সমুদ্র উপকূলের বহুদূর থেকে হেঁটে যাচ্ছে। দেখলেই বুঝা যায় এরা আরব। তাদের জানা আছে, সন্ধ্যার আগেই তারা এক জনবসতিতে পৌঁছে যাবে। এ এলাকা তাদের নখদর্পণে। তারা জিদ্দা ও মদীনার মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছে। তাদের দেখলেই বুঝা যায়, তারা বিধ্বস্ত, তারা সমুদ্রের ঝড়ের কবলে পড়েছিল। কোন রকম সাঁতরে উপকূলে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

প্রায় আড়াই তিন মাইল অতিক্রম করার পর তারা দেখল, এক ব্যক্তি বসে আছে। মনে হয়, বসে বসে ঝিমাচ্ছে। এরা তিনজন সেই লোকটির নিকট গেল। লোকটি এবার মুখ তুলে তাকাল। ডাগর দৃষ্টি মেলে তাদের দেখতে লাগল। একজনকে চিনে ফেলল। সে ঐ মুসলমান গুপ্তচর যাকে ইবনে সামির ও তার বন্ধুরা জাহাজের ছাদ থেকে সমুদ্রে ফেলে হত্যা করতে চেয়েছিল।

মুসলমান গুপ্তচরও তাকে চিনে ফেলল যে, সে ইবনে সামির। বলল, ইবনে সামির! তুমি খুব ভাগ্যবান। এ প্রচণ্ড ঝড়ের মাঝে সমুদ্রের বুক চিরে উপকূলে পৌঁছতে পারা বড়ই ভাগ্যের ব্যাপার। আচ্ছা, তোমাদের সাথে যে সুন্দরী যুবতীটি ছিল তাকে তো দেখছি না। তাহলে কি সে ডুবে গেছে?

ইবনে সামিরের কণ্ঠ বিষণ্ন। বলল, না বন্ধু; সে আমার স্ত্রী। সে সমুদ্রে ডুবে যায়নি। এ মরুভূমিতে ডুবে গেছে।

মুসলমান গুপ্তচর বলল, ইবনে সামির! তোমার দুঃখের কথা আমি বুঝতে পেরেছি। সে সমুদ্র থেকে তো মুক্তি পেয়েছে কিন্তু বেঁচে থাকতে পারেনি। মৃত্যুবরণ করেছে। আর তুমি তাকে মরুর বুকে দাফন করে দিয়েছো!

ইবনে সামিরের কণ্ঠ আরো বেশী ভারাক্রান্ত ও বিষণ্ন শোনা গেল। বলল, বন্ধু! তুমি আমার কথা কিছুই বোঝ নি। আমার জীবনের উপর দিয়ে যে কি নির্মম ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে তাকি আমি তোমাকে বলব?

মুসলমান গুপ্তচর বলল, ইবনে সামির! আমি এখন তোমাকে আমার ব্যাপারে সঠিক তথ্য দিচ্ছি। আমি খৃস্টান নই। আমি মুসলমান। আমার নাম মাসউদ ইবনে সুহাইল মক্কী। তুমি এখন আমার দেশে এসে গেছো। আমি আর আমার এই বন্ধুরা তোমাকে এখানে একাকী রেখে যেতে পারি না। মাসউদ ইবনে সুহাইল ও তার দুই বন্ধু ইবনে সামিরের পাশে বসে পড়ল। মাসউদ বলল, এখন তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পার যা তুমি বলতে চাচ্ছো।

ইবনে সামিরের স্মৃতিতে বারবার এ কথা ভেসে উঠছে, সে তো তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। ভাগ্যের জোরে বেঁচে আছে। ঘোর বিপদের সময় সে যখন বন্ধু হিসাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে তখন দেখা যাক সে কি উপকার করে। এ কথা ভেবে সে তার নির্মম কাহিনীটি বলতে আরম্ভ করল।

কী আর বলব বন্ধু! জাহাজটি যখন ডুবতে ছিল তখন আমি আর আমার দু' সঙ্গী সমুদ্রের বুকে ঝাঁপ দিলাম। আইনীর প্রতি আমার খেয়াল ছিল সবচেয়ে বেশী। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যদি আমার আইনী নিমজ্জিত হয় তাহলে আমিও তার সাথে নিমজ্জিত হয়ে পরপারে চলে যাব। আইনী ছাড়া এ জীবন আমার বৃথা, অর্থহীন।

আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আইনী আইনী বলে চিৎকার করতে লাগলাম। আইনীও সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল। কিন্তু আমি তাকে খুঁজে পেলাম না। আইনীর সন্ধানে আমি পাগলের মত এদিক সেদিক সাঁতার কাটছি। হঠাৎ আমি দেখলাম, আমার এক সাথী আইনীকে তার পিঠে তুলে নিয়ে সাঁতরে উপকূলের দিকে যাচ্ছে। আর আমাকে বলছে, আইনীর ব্যাপারে চিন্তা করো না, চলে এস। তখন ছিল এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। যেন কিয়ামত। ঝড়ের তীব্র বেগ। মানুষের আর্তচিৎকার,নারীদের আহাজারি আর শিশুদের আর্তনাদে কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। তবুও আমি আমার বন্ধুর কথা শুনে নিশ্চিত হলাম। উপকূলের দিকে সাঁতার দিলাম। আমরা তিনজন যখন বহু কষ্টে সাঁতরে উপকূলের নিকট পৌঁছলাম তখন এক বিশাল ঢেউ এসে আমাদের একেবারে উপকূলে ফেলে নীচে নেমে গেল।

আমরা প্রাণে বেঁচে গেলেও শরীরের অবস্থা একেবারে কাহিল। ক্লান্তিতে দাঁড়াতে পারছিলাম না। বেশ কিছুক্ষণ মাটিতে পড়ে রইলাম। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু কোথায় যাব। কোন দিকে যাব কিছুই চিনি না। জাহাজের দু'একজন বেঁচে যাওয়া যাত্রী বলল, এটা আরব উপকূল। শাম এখান থেকে অনেক অনেক দূর।

আমরা অজানা উদ্দেশে রওনা দিলাম। বহু পথ অতিক্রম করার পরেও কোন জনমানবের চিহ্ন পেলাম না। ইতিমধ্যে রাত ঘনিয়ে এল। রাত কাটানো ও বিশ্রামের জন্য এক জায়গায় শোয়ার ইচ্ছে করলাম। আইনী আমার স্ত্রী। তাই আইনী ও আমি একটু দূরে একত্রে শুইলাম। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর। শোয়ার সাথে সাথে গভীর ঘুমে হারিয়ে গেলাম।

রাত প্রায় অর্ধ। হঠাৎ চিৎকার আর কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। জ্যোৎস্না বিধৌত রজনী। বেশ দূর পর্যন্ত সবকিছু দেখা যায়। আমি দেখলাম, আইনী আমার পাশে নেই। দূরে, বেশ কিছুটা দূরে তাকিয়ে দেখলাম, আমার সাথী দুইজন আইনীর সাথে ধস্তাধস্তি করছে। যে সাথী আইনীকে সমুদ্র থেকে

উদ্ধার করেছিল সে আইনীর উপরে চেপে বসতে চাচ্ছে আর অপর সাথী আইনীর হাত ধরে তাকে সহায়তা করছে।

আমি দৌড়ে সেখানে গেলাম। মাথায় যেন আগুন ধরে গেছে। প্রথমে এক বন্ধুকে ঘুসি মেরে মাটিতে ফেলে দিলাম। তারপর অন্য জনকে লাথি মেরে ফেলে দিলাম এবং আইনীকে হাত ধরে তুলে নিলাম। আমি ভাবতেই পারিনি, বন্ধু হয়ে কিভাবে বন্ধুর স্ত্রীর ইজ্জত নষ্ট করতে পারে! অথচ আমরা কতো পবিত্র মিশন নিয়ে এদেশে এসেছি।

রাতের নিরবতা ভেঙে এক বন্ধুর কণ্ঠ শোনা গেল, দূরে থাক হে ইবনে সামির! আমি তাকে সমুদ্র থেকে তুলে এনেছি। আর আমার এই বন্ধু আমাকে সহায়তা করেছে। তাই তার উপর আমাদের অধিকার আছে।

আরেকজনের কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল, বলল, তুমি তো তাকে ডুবে মরার জন্য সমুদ্রে ফেলে এসেছিলে। এখন তার উপর তোমার কি অধিকার আছে?

আমি আইনীকে পিছনে দাঁড় করালাম। ভাবলাম, এদের মাথায় শয়তান আশ্রয় নিয়েছে। এরা তাদের পবিত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশের কথা ভুলে গেছে। তাই আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশের কথা বলে, খৃস্টধর্মের দোহাই দিয়ে এ পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে তাদের অনুরোধ করলাম। কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই ফলপ্রসূ হল না। তারপর তাদের ধমক দিলাম। শাসালাম। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হল না। তারা তাদের দাবীতে অটল।

সবশেষে এক বন্ধু প্রস্তাব দিল, বলল, অন্তত আজ রাতের জন্য তুমি আইনীকে আমাদের হাতে সোপর্দ করো। আমি তাতেও রাজী হলাম না। কারণ আইনী আমার স্ত্রী। জীবন থাকতে আমি তার ইজ্জতহানী সহ্য করতে পারি!

আমি তাদের কথাবার্তায় অত্যন্ত ক্ষীপ্ত হয়ে উঠলাম। বললাম, তোমাদের উপর শয়তান ভর করেছে। আর শয়তানকে কিভাবে তাড়াতে হয় তার পন্থা আমার বেশ ভাল করে জানা আছে।

এ কথা বলে তাদের দিকে অগ্রসর হলাম। তারাও আর দেরি করল না। আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমাদের কারো নিকট কোন অস্ত্র ছিল না। থাকলে তখনই কেউ না কেউ নিহত হয়ে যেত। উভয়জন আমাকে মুষ্ঠাঘাত, পদাঘাত করতে লাগল। আমিও সাহসিকতার সাথে প্রতিহত করতে থাকলাম। কিন্তু তারা ছিল শক্তিশালী যুবক। তারা আমাকে ক্রমেই মেরে যাচ্ছে। আইনী অবলা নারী। অল্প তার বয়স, সে আমাকে কিভাবে উপকার করবে। অদূরে দাঁড়িয়ে সে শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ জানাচ্ছে।

তারা আমাকে মারতে মারতে বেহুশ করে মাটিতে ফেলে দিল। তারপরও তারা আমাকে মারল, যেন আমি আর উঠে দাঁড়াতে না পারি।

আমার যখন হুশ ফিরে আসল, মনে হল যেন আমার শরীরের অনেকগুলো হাড় ভেঙে গেছে। মাথা কেবল ঘুরছে। আমি উঠে দাঁড়াতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। তখন সূর্য উদিত হয়ে গেছে। চারদিকে ঘুরে ফিরে তাকালাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। চারদিকে শুধু বালি আর বালি। আমি বুঝে ফেললাম, তারা আইনীকে নিয়ে চলে গেছে। আমার জীবনের চারদিক এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। জীবন যুদ্ধের ব্যর্থতার কথা বসে বসে চিন্তা করছিলাম আর ক্রমেই যেন অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছিলাম। ঠিক এরই মাঝে তোমরা এসে আমাকে জাগালে।

ইবনে সামির বিষণ্ন ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল, ভাই মাসউদ! আমি এ আশা রাখি না যে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। তবে তোমাদের একটি কথা আমার অন্তরে আশার সঞ্চার করেছে। তোমরা বলেছো, আমি তোমাদের দেশে পৌঁছেছি। তাই তোমরা আমাকে একা ফেলে যেতে পার না। তাহলে কি আমি আশা করতে পারি যে, তোমরা আমাকে সাহায্য করবে?

মাসউদ ইবনে সুহাইল বলল, শোন ইবনে সামির! আমি একজন মুসলমান। আমি ইসলামের বিধি বিধান মেনে চলি। তোমার ধর্ম যাই হোক, কিন্তু তুমি একজন মানুষ। বিপদে আক্রান্ত। এ অবস্থায় আমার ধর্মের নির্দেশ, তোমাকে সহায়তা করা। আমরা অবশ্যই তোমার সহায়তা করব।

* * *

ইবনে সামির উঠে দাঁড়াল। মাসউদ ও তার বন্ধুরাও উঠে দাঁড়াল। তারা প্রথমে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে বালুকাময় ভূমির দিকে তাকাল। হ্যাঁ স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এখানে মারামারি হয়েছে। ইবনে মাসউদ দেখল, বালুকাময় প্রান্তরে পায়ের ছাপ এক দিকে চলে গেছে। মাসউদ সে দিকে অগ্রসর হল। তার পিছু পিছু অন্যরাও অগ্রসর হল। মাসউদ অত্যন্ত বিচক্ষণ গুপ্তচর। মাঝে মাঝে পদচিহ্ন দেখে বুঝে ফেলল, আইনীকে তারা জোর করে নিয়ে গেছে। টেনে টেনে নিয়ে গেছে।

মাসউদ তার এক সঙ্গীকে বলল, মনে হচ্ছে তারা বেশী দূর যেতে পারেনি। আচ্ছা ইবনে সামির! তুমি কি বলতে পারবে, তাদের সাথে কি পান করার মত পানি আছে?

ইবনে সামির বলল, না, তাদের নিটক পানি থাকার কথা নয়। কারণ আমরা তো সমুদ্র থেকে মাত্র উঠে এসেছিলাম। ইবনে সামির হাঁটতে পারছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। মাসউদ ও তার এক সাথী ইবনে সামিরের হাত কাঁধে নিয়ে তাকে বয়ে চলছে।

ইবনে সামিরকে মাসউদ বলল, আমাদের গন্তব্য অন্যত্র হলেও আমরা প্রথমে তোমার স্ত্রী আইনীকে উদ্ধারের চেষ্টা করব।

সূর্যের আলো আরো একটু তীব্র হলে তার উত্তাপে ইবনে সামির কিছুটা সুস্থতা বোধ করতে লাগল। সে একজন সৈনিক। দেহ তার কষ্টসহিষ্ণু। জীবনে আরো কয়েকবার সে আহত অবস্থায় সফর করেছে, তাই সহজেই সে হাঁটতে পারছে।

পদচিহ্ন অনুসরণ করে তারা যথাসম্ভব দ্রুত চলতে লাগল। বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখল, সেখানে যমীন কিছুটা শক্ত। আরো কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর নিম্নভূমি পেরিয়ে উঁচু ভূমিতে উঠল। পথের কোন চিহ্ন নেই। তবে পদচিহ্ন লক্ষ্য করে করে তারা এগিয়ে চলল। আরো কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর এক নিম্নভূমির দিকে তারা এগিয়ে গেল। বেশ দূর পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্ন ভূমি অতিক্রম করে যখন তারা উচ্চ ভূমিতে উঠতে লাগল তখন মাসউদ আনন্দে চিৎকার করে উঠল। আল্লাহ্র দয়া দেখ। এখানে জান্নাত নেমে এসেছে যেন!

পিপাসায় তাদের হৃদয় শুকিয়ে গিয়েছিল। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। তাই খেজুর বাগান দেখে আনন্দে তারা উদ্বেলিত হয়ে উঠল। খেজুর বাগান প্রায় দু'মাইল দূরে অবস্থিত। তাদের বিশ্বাস, সেখানে পৌঁছতে পারলে পানিও পাওয়া যাবে। খাবারও মিলবে। এ আশায় তাদের শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। তারা দ্রুত হেঁটে চলল।

খেজুর বাগানের নিকট গিয়ে দেখে, বাগানের চারপাশ মাটি দেয়ালের ন্যায় উঁচু। এ প্রাকৃতিক দেয়াল টপকে ওপারে পৌঁছলেই তারা পাবে পানি আর টাটকা খেজুর। তারা খেজুর বাগানের নিকটে পৌঁছেই বাতাসের কোলে একটি মেয়েলী কণ্ঠের আর্তচিৎকার শুনতে পেল। সাথে সাথে তারা উৎকর্ণ হয়ে উঠল। আর্তচিৎকার লক্ষ্য করে তারা ছুটে গেল এবং সেই উঁচু ভূমিতে উঠতে লাগল। এবার সেই আর্তচিৎকার স্পষ্ট শুনতে পেল। তারা এবার তাদের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ করতেই দেখতে পেল, দু'জন পুরুষ একজন নারীকে টেনে উঁচুতে তুলতে চেষ্টা করছে।

ইবনে সামির এ দৃশ্য দেখে বিহ্বল কণ্ঠে বলল, এই তো আমার আইনী!

মাসউদ ইবনে সুহাইল ও তার সাথীদ্বয় দৌড়ে গিয়ে সেখানে পৌঁছল এবং আইনীকে ধরে নিজেদের দখলে নিয়ে এল। ইবনে সামিরের বন্ধু দু'জন ক্ষীপ্ত হয়ে বলল, এই মেয়ে তাদের। একে কেউ তাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ইবনে সামির ছুটে গিয়ে বলল, এ আমার স্ত্রী।

মাসউদ ও তার সাথীরা খঞ্জর বের করল। ইবনে সামিরে বন্ধুদ্বয়ের কাছে কোন অস্ত্র ছিল না। তারা অসহায়ের ন্যায় ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

মাসউদ বলল, চুপ করে বসে থাক। একটু নড়বে তো সেখানেই শেষ হয়ে যাবে। তারা বসে থাকল। মাসউদ আইনীকে এনে সামনে দাঁড় করাল। বলল, হে মেয়ে! নির্ভয়ে বল, এরা তোমার সাথে কী আচরণ করেছে?

আইনী সবকিছু বলল, সবশেষে বলল যে, তারা তাকে এখানে এনে তার ইজ্জত হনন করেছে।

একথা শোনার সাথে সাথে ইবনে সামিরের চোখ ক্রোধে জ্বলন্ত কয়লার মত হয়ে গেল। অগ্নিঝরা কণ্ঠে বলল, এ পাপের শাস্তি হত্যা ছাড়া আর কি হতে পারে? এ কথা শুনার সাথে সাথে ইবনে সামিরের বন্ধুদ্বয় বিনয় বিগলিত কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল।

তিনজনে ধরে তাদের একজনকে মাটিতে চিৎ করে শুইয়ে দিল ও তার হাত পা বেধে দিল। মাসউদ তার খঞ্জরটি আইনীর হাতে দিয়ে বলল, এই খঞ্জরটি তার হৃদপিণ্ড বরাবর বসিয়ে দাও। তারপর তার পেট চিরে ফেল।

আইনী এমন ক্ষীপ্ত ছিল যা চিন্তা করা যায় না। সে খঞ্জরটি হাতে নিয়ে প্রথমে তার হৃদপিণ্ডে আঘাত করল। বিরামহীনভাবে আঘাত করতেই থাকল। যেন তার প্রতিশোধ স্পৃহা মিটছে না।

এভাবে দ্বিতীয় জনকেও আইনীর হাতেই হত্যা করাল। দু' দু'জনকে হত্যা করার পর আইনী ইবনে সামিরকে ঝাপটে ধরে দীর্ঘক্ষণ কাঁদল।

এরপর তারা উঁচু ভূমি টপকে খেজুর বাগানে নেমে দেখে, সেখানে স্বচ্ছ পানির ফোঁয়ারা বয়ে যাচ্ছে। তারা সেখান থেকে অঞ্জলি ভরে ভরে পানি পান করল। মাসউদের দুই সাথী গিয়ে খেজুর নিয়ে এলে তারা খেজুর খেয়ে জঠর জ্বালা নিবারণ করল।

* * *

ক্লান্ত সূর্য বিষণ্ন বদনে অস্তমিত হওয়ার সকল আয়োজন শেষ করেছে। যাই যাই করে অস্তমিত হয়ে গেলেও তার আভা এখনো পশ্চিমাকাশ জুড়ে বিরাজ করছে। ক্ষুধা পিপাসায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ক্লান্ত শ্রান্ত বদনে শীতল পানি পান ও খেজুর খাওয়ার পর সত্যই তাদের শরীর নেতিয়ে পড়ল। মাসউদ ইবনে সুহাইলের এক বন্ধু মাগরিবের আযান দিল। জামাতের সাথে তারা মাগরিবের নামায আদায় করল। ইবনে সামির ও আইনী নিষ্পলক নয়নে তাদের ইবাদতের বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে লাগল। এশার নামাযও তারা জামাতের সাথে আদায় করার পর একসাথে শুয়ে পড়ল।

ইবনে সামির ও আইনী তাদের নিকটে শুইতে চাইলে মাসউদ বলল, ভাই! তোমরা স্বামী স্ত্রী। তোমরা একটু দূরে গিয়ে শয়ন করো।

তারা একটু দূরে গিয়ে শোয়ার আয়োজন করল।

আইনী এমন ভয় পেয়েছে যে তার চোখে আর ঘুম আসছে না। ইবনে সামিরের অবস্থাও তাই। দীর্ঘক্ষণ তারা শুয়ে এপাশ ওপাশ করল। কিন্তু ঘুম এল না।

চারদিকে নিরব নিস্তব্ধ সুনসান। গোটা পৃথিবী যেন বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। শুধু চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ইবনে সামির ও আইনী। আইনী ফিস্‌ফিসিয়ে ইবনে সামিরকে বলল, আপনি কি এ তিনজনকে বিশ্বাস করতে পারছেন?

ইবনে সামির বলল, এখনো আমি কিছু বলতে পারছি না। আমার বড়ই আক্ষেপ হয় যে, আমার নিকট কোন অস্ত্র ছিল না। একেবারে খালি হাতে সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিলাম। যদি আবার তেমন কঠিন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে আমি তাদের থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করব।

আইনীর কণ্ঠ অত্যন্ত ভয়াতুর। বলল, আপনি কিন্তু ঘুমাবেন না।

কিন্তু ধীরে ধীরে ঘুম ইবনে সামিরকে পরাজিত করতে যাচ্ছে। আর ইবনে সামির চাচ্ছে, কিছুতেই যেন ঘুম তাকে পরাজিত করতে না পারে। কারণ আইনীর বয়স অল্প, অনিন্দ্য সুন্দরী। যদি তার স্বধর্মের লোকেরা আইনীকে নিয়ে এমন অপকর্ম করতে পারে তাহলে এদের ব্যাপারে ভরসা কি? এরা তো অন্য ধর্মের অনুসারী। এদের উপর কিভাবে ভরসা করতে পারি!

তারা উভয়ে বহু কষ্টে নিজেদের জাগ্রত রাখছে। অথচ মুসলমান তিনজন গভীর ঘুরে নিমজ্জিত। অর্ধরাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইবনে সামির ও আইনী নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল এবং গভীর ঘুমে লুটিয়ে পড়ল।

হঠাৎ হাদের কানে এমন আওয়াজ পৌঁছল যেন কয়েকজন মানুষ লড়াই করছে। ডাক চিৎকার করছে। ইবনে সামির ও আইনী ভয়ে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠল। ভয়াতুর দৃষ্টিতে এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। দেখল, মাসউদ ইবনে সুহাইল ও তার বন্ধুদ্বয় এখনো ঘুমে নিমজ্জিত। ইবনে সামিরের দৃষ্টি অন্য দিকে নিপতিত হলে দেখল, দূরে তার নিহত সাথীদের লাশ নিয়ে একদল মরু শৃগাল টানাটানি করছে আর মনের আনন্দে চিৎকার করে খাচ্ছে। তারা আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

আযানের আওয়াজ শুনে তাদের ঘুম ভেঙে গেল। দেখল, মাসউদের এক সাথী দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে আযান দিচ্ছে। আর মাসউদ ও অন্যজন ঝরণার পাশে বসে ওযু করছে।

ইবনে সামির আইনীকে বলল, আইনী ঘুমাও। এরা এখন নামায পড়বে। এরপর তারা আরো ঘুমাল। কিছুক্ষণ পর মাসউদ ইবনে সামিরকে জাগিয়ে বলল, যাত্রার সময় হয়ে গেছে। যদি আমাদের সাথে যেতে চাও তাহলে উঠ।

ইবনে সামিরের কণ্ঠে অভিমানের আভাস। বলল, আমি একা তো কোথাও যাব না। তোমাদের গন্তব্যস্থল পর্যন্ত তোমাদের সাথে যাব। তারপর সামনে অগ্রসর হব।

মাসউদ জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় যাবে?

ইবনে সামির থেমে গেল। কোন উত্তর দিল না। আইনীর দিকে আড় চোখে তাকাল। তারপর মাথা নত করল। আবার মাসউদের দিকে তাকাল। তার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ,সে কোথায় যাবে তার সঠিক উত্তর সে জানে না। মাসউদ তাকে পুনরায় একই প্রশ্ন করলে সে মাথা নত করে নিল।

মাসউদের এক সঙ্গী বলল, তাহলে কি তুমি কোথায় যাবে তা ভুলে গেছ?

ইবনে সামির উত্তরে বলল, না....আমার কোন গন্তব্য নেই। তবে আমার একটি উদ্দেশ্য আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মাসউদের কণ্ঠ স্থির। বলল, আমরা তোমাকে বাধ্য করব না। যদি মনে কর আমাদের সাথে তোমার থাকার প্রয়োজন আছে তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের সাথে থাকতে দিব। আর যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে এখানেই আমরা তোমাদের বিদায় জানাব।

ইবনে সামিরের কণ্ঠ এবার আবেগাপ্লুত হয়ে উঠল। বলল, তোমাদের আচার-আচরণে আমি এতো অভিভূত হয়েছি যে, আমার মনে চাচ্ছে, আমি আমার উদ্দেশের কথা তোমাদের নিকট বলে দেই। আমি একজন অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির খৃস্টান। খৃস্টধর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা আমি সহ্য করতে পারি না। কিন্তু আমার ঐ নিহত দুই বন্ধু আমার বিশ্বাসে চির ধরিয়েছে। ওরা গোঁড়া খৃস্টান ছিল। আমাদের অন্তর দুই জাতির ঘৃণায় ছিল টইটুম্বর। রোমান জাতির ঘৃণা আর মুসলিম জাতির প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা। আমি একজন কিবতী খৃস্টান। আমাদের নেতা বিন ইয়ামিন।

মাসউদ বলল, তুমি মনে হয় ভুলে গেছো; জাহাজে তুমি আমাকে খৃস্টান মনে করে তোমার উদ্দেশ্যের কথা আমার নিকট ব্যক্ত করেছিলে। বলেছিলে, তুমি শামে যাচ্ছো। কিন্তু ঝড় তোমার উদ্দেশ্যকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। তুমি শামের খৃস্টানদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করতে যাচ্ছিলে।

ইবনে সামির বলল, হ্যাঁ আমি সে উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন আর যাব না।

মাসউদ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন? কেন তুমি যাবে না? যদি তুমি মনে কর আসল কথা বললে আমরা তোমাকে হত্যা করব তাহলে তুমি ও তোমার স্ত্রীর এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাওয়া ভাল। আমরা মদীনায়

যাচ্ছি। ঝড়ের কারণে আমরা উদ্দিষ্ট বন্দরে পৌঁছতে পারি নি। আর যদি চাও তাহলে আমাদের সাথে মদীনায় যেতে পার। সেখান থেকে আমরা তোমাকে শামের পথ দেখিয়ে দিব। আগে স্থির সিদ্ধান্ত নাও, আমাদের সাথে যবে কি-না?

আসলে ইবনে সামিরের মানসজগতে এক প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়েছে। তার চিন্তা চেতনা ও বিশ্বাসের দুনিয়া লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। সেখানে দেখা দিয়েছে বিধৌত বিমল আকীদা বিশ্বাসের আলোকময় সূর্য। যার আলোয় সে উদ্ভাসিত। আর বিষয়টি বুঝতে পেরেছে মাসউদ ও তার সাথীদ্বয়। তাই তারা ইবনে সামির ও আইনীকে সাথে নিয়ে মদীনার পথে অগ্রসর হয়।

এভাবে তিন দিন তিন রাত চলার পর তারা মদীনায় গিয়ে পৌঁছল। ইতিমধ্যে ইবনে সামিরের সাথে মাসউদ অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে নিয়েছে। মিশরে রোমান সৈন্যদের অবস্থা সম্পর্কেও বহু দুর্লভ তথ্য জেনে নিয়েছে।

মাসউদ মদীনায় পৌঁছার পর ইবনে সামিরকে জিজ্ঞেস করল, বন্ধু! এখন কোথায় যাবে?

ইবনে সামির দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলল, আমি আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেছি। আমি এ উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি যে, আমি ও আইনী মুসলমান হয়ে যাব।

মাসউদ কিছুক্ষণ নিরব থেকে বলল, আরো একটু ভেবে দেখ। আমরা তোমাদের উপর কোন চাপ প্রয়োগ করব না। যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ না কর তবুও আমরা তোমাদেরকে তোমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছার ব্যবস্থা করব।

ইবনে সামিরের কণ্ঠ আবেগ বিজড়িত। বলল, ভাই মাসউদ! তোমাদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা আর ইবাদত বন্দেগী দেখে আমার ভাবনা পাল্টে গেছে। আমি শুনেছি, ইসলাম আরবের অশিক্ষিত বর্বর লোকদের লাঞ্ছনা আর অপদস্ততার তলদেশ থেকে ইজ্জত ও মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। আমি তা যথার্থভাবে বুঝতে পারছি। আমার বিশ্বাস, যদি আইনী একা তোমাদের সাথে থাকে তাহলেও তোমরা তার সাথে এমন আচরন করবে না যা আমার স্বধর্মের ভাইয়েরা করেছে। সুতরাং আমি ও আইনী প্রতিজ্ঞা করেছি, আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিজেদের ধন্য করব।

মাসউদ ও তার সাথীদ্বয় ইবনে সামির ও আইনীকে তাদের সালারের নিকট নিয়ে গেল। ইবনে সামির তার জীবন বৃত্তান্ত সালারকে শুনাল এবং তারা মুসলমান হয়ে গেল।

ইবনে সামিরের দেয়া তথ্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো এ তথ্যগুলো আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর নিকটও উপস্থাপিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম নবুওত লাভের পর মাত্র এক দশক ঘুরতে না ঘুরতেই মদীনায় ইসলামীরাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হল। সুখ শান্তি আর সমৃদ্ধির হাওয়া বইতে লাগল।

মারামারি, কাটাকাটি, মদ, জুয়া, নারীভোগ আর আত্মম্ভরিতার অবসান হল। দু'দশকের মাথায় গোটা আরব পদানত হল।

ইসলাম এবার একটি বিশ্বশক্তির রূপ ধারণ করল । আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে এবার পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে লাগল। শুরু হল সুপারপাওয়ারদের পরাস্ত করার যুদ্ধ। খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। অগ্নিপূজারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। একই সাথে উভয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন রাসূলের উত্তরসূরী সাহাবায়ে কেরাম। শ্বাসরুদ্ধকর সে ইতিহাস। লোমহর্ষক সে কাহিনী। যুদ্ধে যুদ্ধে ধ্বংস্তুপে পরিণত হল পারস্য সম্রাজ্য। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ধুলিস্যাত হয়ে গেল। রোমক বাহিনী পিছু হটতে হটতে একেবারে রোম সাগরের তীরে গিয়ে পৌঁছল।

ঐতিহাসিকরা ইসলামের বিজয় ইতিহাস এখানে এসে ইতিটানে। মিসর বিজয়ের অগ্নিঝড়া রক্তে আঁকা দিন গুলোর কথা বাদ পড়ে যায়। যে মিসরের রণপ্রান্তর সমূহে হিরাক্লিয়াসের যুদ্ধ কৌশল ও বীরত্ব কিভাবে ব্যর্থ ও পরাভূত হয়েছিল, কিভাবে বীর মুজাহিদের শাণিত তরবারীর ঝনঝনানি ও তাকবীর ধ্বনিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল আকাশ-বাতাস। বীর সেনাপতি আমর ইবনুল আস (রাঃ) মাত্র আট-দশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে কিভাবে লাখ লাখ রোমান সৈন্যদের তাড়িয়ে ফিরেছেন প্রান্তর থেকে প্রান্তরে।

কিভাবে, কোন সাহসে, কোন শক্তির স্পর্শে তারা বীরদর্পে সামনে এগিয়ে গেলেন! সেই বিস্ময়কর কাহিনী ও শ্বাসরুদ্ধকর ইতিহাস এ গ্রন্থের পাতায় পাতায় উপন্যাসের বর্ণিল আবরণে পেশ করা হয়েছে।

এবার চলুন আমরা ইতিহাসের সেই উত্তাল দিনগুলোতে হারিয়ে যাই। জেনে নেই ইসলামের বিজয় এবং পরাজিতদের ইতিহাস। তাই পড়ুন এবারের উপস্থাপনা **পরাজিত অহংকার**

আবেহায়াত পাবলিকেশন্স